র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

অনুবাদকের কথা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ কোন স্থান ছিল না, যদিও কাগজ-পত্রে 'ছায়া-অবলম্বনে'র ছড়াছড়ি ছিল। প্রকাশকেরা অনুবাদ গ্রন্থ ছাপতে চাইতেন না, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থে অপরিচিত বিদেশী নামের নায়ক-নায়িকা দেখলেই সে বই সরিয়ে রাখতেন, সাহিত্যিকরাও অনুবাদককে স্কুল-মাষ্টারের মতন সাহিত্য-সমাজের পংক্তি-ভোজনে বিশেষ কোন সম্মানের আসন দিতেন না। সাহিত্যিক হলো স্রষ্টা···সেইজন্য অনুবাদকরা সাহিত্যিক নন, এইরকম একটা ধারণা এখনও পর্যন্ত আছে।

অবশ্য এর জন্যে গত-যুগের অনুবাদকেরাই অনেকটা দায়ী ছিলেন। অনুবাদ-কার্যের মধ্যে কোন গুরুত্ব বা দায়িত্ব বোধ দেখা যেতো না। স্রষ্টা হবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদ করতে গিয়ে মাত্র তার ছায়াটুকু নিতেন এবং রাস্‌কল্‌নিকফের জায়গায় রমেশের নাম বসিয়ে দিয়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মন ধরবার চেষ্টা করতেন। অনেক-ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা মত, যেখানটা অসুবিধাজনক বোধ হতো, সেখানটা বাদ দিতেন, মূলের কাঁধ থেকে মাথাটা কেটে ফেলে সেখানে নিজের স্কন্ধটী হয়ত বসিয়ে দিতেন। এই ভাবে যে জিনিসটী চলে আসছে, তাকে আর যাই বলা যাক্‌, অনুবাদ বলা চলে না।

অবশ্য, সেই এলোমেলো অনুবাদ-কার্যের-যুগে, এমন দু'একজন ছিলেন যাঁরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুবাদ-কার্য করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সেই স্বতন্ত্র চেষ্টা সাধারণ ভাবে সাহিত্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এখানে অবশ্য আমি বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদ-কার্যের ইতিহাস লিখতে চাই না, তবে এ-কথা ভাবতে আজ আনন্দ লাগে যে, আজ বাংলা-সাহিত্যে

অনুবাদ তার স্থান খুঁজে পেয়েছে। প্রকাশক এবং সাধারণ পাঠক, উভয় শ্রেণীরই কৃপা-দৃষ্টি অনুবাদের ওপর পড়েছে এবং বিদেশী নাম আজ আর অন্তঃপুরচারিণীদের কাছে তত বিদেশী বলে মনে হয় না।

এই কথা স্মরণ রেখে, মুল্‌ক রাজ আনন্দের 'কুলি' অনুবাদ করেছি। আশা করি পাঠকেরা এর মধ্যে মুল্‌ক রাজ আনন্দ্‌কেই দেখতে পাবেন। যদি তা দেখতে পান, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে ক'রবো।

ইদানীং ইংরেজী-সাহিত্যে ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয় সমাজকে নিয়ে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নভেল লেখা হয়েছে। কিন্তু মুল্‌ক রাজ আনন্দের নভেলগুলি (প্রত্যেকটী ইংলণ্ডের লোকদের জন্যেই বিশেষ ভাবে লেখা) একটা স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে। 'কুলি' যখন ইংলণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইংলণ্ডের শাসক সমাজ এই দুর্বিনীত লেখকের ওপর রীতিমত খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে এবং এই বইটির প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু রুশ ভাষায় যখন এই বইখানা অনূদিত হলো, তখন রাশিয়ার পাঠক-সমাজ মহানন্দে তাকে গ্রহণ করলো এবং আজ পর্যন্ত সেখানে মুল্‌করাজের বই ত্রিশ লক্ষের ওপর বিক্রি হয়েছে। ইংরেজী সংস্করণ আজ পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বহুলক্ষ বই বিক্রী হয়েছে।

বৃটিশ-শাসনের ফলে আজ ভারতীয় সমাজ কি ভাবে ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে, আর সেই ভাঙ্গা সমাজের বুকের ওপর বসে, য়ুরোপীয় সমাজ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ, দেশী ও বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং শাসক-সম্প্রদায় কিভাবে তার অন্তিম সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্নহীন, বস্ত্রহীন কোটী কোটী মানুষ কি ভাবে কলের পুতুলের মত অদৃশ্য ভাগ্য-বিধাতাদের পরিকল্পনা-কৌশলে নিজেদের চিতা নিজেরাই সাজিয়ে তুলছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক কিশোরের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে মুল্‌ক-রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[এক]

পার্বত্য উপত্যকায় ছোট্ট একটী গ্রাম।

সেই গ্রাম থেকে অনুমান একশো গজ দূরে, পাহারের গা ঘেঁষে একটী মাটীর ঘর···খড়ের ছাউনী···হুমড়ি খেয়ে যেন মাটির দিকে পড়ছে।

তার রোয়াকে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে গুজরী ডেকে ওঠে,

—মুন্নু···ও মুন্নুয়া···মুন্‌ড়ু·· রে···

ক্যাংড়ার নির্মেঘ আকাশে তখন মধ্যদিনের নিষ্করুণ সূর্য বুনে চলেছে আলোর ঝালর···

সাড়া না পেয়ে গুজরী চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে চায়···পাহাড়ী গাঁয়ের ছোট্ট বাড়ীর চৌকস ছাদের উপর দিয়ে, বুনো ঝোপের কোল ঘেঁষে, আঁকা-বাঁকা সরু পথ পেরিয়ে, তার শ্যেন-দৃষ্টি চলে যায়, যেখানে দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে সোনালী ধূলো···

কিন্তু কোথায় মুন্নু ?

চিলের মতন ঝাঁঝালো গলায় সে আবার চীৎকার ক'রে ওঠে,

—মুন্নু, ওরে মুন্নুরে···কোথায় মরতে গিয়েছিস্ রে ? ওরে পোড়া কপালে হাড়-হাবাতে, চাচা যে তোর এখনি চলে যাবে রে···শহরে যেতে হবে না তোকে ? ওরে···

রোয়াক থেকে একটু এগিয়ে এসে সে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখে···আম বাগান পেরিয়ে দূরে চলে যায় তার দৃষ্টি যেখানে মধ্যদিনের

সূর্যের আলোকে রূপালী পাঁতের মত ঝিকমিক্ করিতে থাকে বিয়াস্ নদ ...ঘুরে বেড়ায় তার তীরে তীরে, সবুজ সব বুনো ঝোপের আশে পাশে...

কিন্তু কোথায় মুন্নু ?

এবার রাগে অতিষ্ঠ হ'য়ে, যত উঁচু পর্দায় গলা তোলা সম্ভব, সে চীৎকার ক'রে ওঠে আকাশ-ফাটা গলায়, কোথায় পড়ে আছিস্, ওরে মড়া... হাড়-হাবাতে মা-বাপ-খেকো...বিদেয় হবি আয় রে...

এবার সেই শব্দ-বাণ সারা উপত্যকায় ঝংকার তুলে বিষের জ্বালায় মুন্নুর কানে গিয়ে বিঁধলো।

শুনলো কিন্তু সাড়া দিল না মুন্নু। যে-গাছের তলায় গা ঢাকা দিয়ে চুপটী ক'রে বসেছিল, সেখান থেকে নড়ে আর এক জায়গায় গিয়ে বসলো... গাছের ফাঁক দিয়ে একবার শুধু দেখতে পেলো, গুজরীর লাল আঁচলের খানিকটা হাওয়ায় উড়ে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই সকালে সে গরুর পাল নিয়ে বেরিয়েছিল! বিয়াস নদীর ধারে গরুগুলো তখন আপনার মনে হাঁটু জলে নেমে মনের আনন্দে জাবর কাটছিল...সেই অবসরে সে নিজের খেলা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মেতে ওঠে।

হঠাৎ তাকে নিস্পৃহ দেখে, তার খেলার সঙ্গী জয় সিং তাকে কনুই-এর ধাক্কায় একবার সজাগ ক'রে দিল। জয় সিং-এর পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সে মুন্নুর খেলার সাথী হলেও, সে তার সম-শ্রেণীর নয়। গাঁয়ের তালুকদারের ছেলে সে।

মুন্নুর ব্যবহার দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, কেমন ছেলে রে তুই ভারি তো অসভ্য! তোর চাচী চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেল্লো, আর তুই হতভাগা একটা সাড়াও দিলি না ?

জয় সিং-এর এই আক্রমণের একটা বিশেষ হেতু ছিল। গাঁয়ের তালুকদারের ছেলে সে, কিন্তু বিষাণ, বিশ্বম্ভর...গাঁয়ের সব ছেলের মুন্নুকেই তাদের দলের সর্দার বলে মানে। মুন্নু থাকতে সে-সম্মান সে কিছুতেই পেতে পারে না। তাই আজ সকালে সে যখন শুনলো যে মু

গাঁ ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে, তখন থেকে তার একমাত্র চিন্তা, কতক্ষণে মুন্নু গাঁ থেকে চলে যাবে…

মুন্নুর হয়ে উত্তর দিল বিষাণ,

—তুই যাস্ নে রে মুন্নু…তোর চাচী নিশ্চয়ই তোকে কোন কাজে পাঠাবার জন্য ডাকছে।…তারপর জয় সিং-এর দিকে ফিরে বলে,

—চাচীর ডাকে সাড়া না দেওয়ার জন্যে তুই তো ওকে খুব নিলি একহাত! কিন্তু তোর নিজের বেলায় কি? তোর মা যখন তোকে দুপুরের রোদে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ করে, তুই তো মার মুখের ওপর গালাগাল দিস্…তোর বাবা জলখাবারের জন্যে তোর পকেটে রোজ দু-আনা ক'রে দেন, তবুও তুই স্কুলে যাস না…স্কুল পালিয়ে বেড়াস… আমরা তো রোজ স্কুলে যাই, ছুটির দিন গরু চরাই—আড্ডা মারা ছাড়া তুই করিস কি? দুটো আম চুরি করবি, সে সাহস পর্যন্ত তোর নেই, ভাগ্যিস্ মুন্নু জোগাড় করেছে তাই…তা ও-যে জোগাড় করলো, তাকে দুটো খেয়ে যেতে দে…

জয় সিং গম্ভীর হয়ে বলে, আম খাবার দরকার হলে, আমি তোদের মত চুরি করি না, পয়সা দিয়ে কিনি! আর ওকে যে সাড়া দিতে বলেছিলাম, তা ওর জন্যে নয়…ওর চাচীর যা মুখ, ও না গেলে, অযথা আমাদের গালাগাল দেবে… যেন আমরাই ওকে আটকে রেখেছি…আর তা ছাড়া, ওর চাচার সঙ্গে আজ ওকে শহরে যেতে হবে—

বিশ্বম্ভর সে-কথায় সোজা দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করে, হাঁরে মুন্নু, সত্যি তুই শহরে যাচ্ছিস্?

মুন্নু বিষণ্ণ মুখে বলে, হাঁ ভাই!

—তোর তো মাত্র মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস…মাত্র ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ছিস্ …এর মধ্যে শহরে গিয়ে কি করবি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুন্নু বলে, আমার চাচী চায় না যে আমি আর স্কুলে পড়ি। চাচাকে বলে তিনি ঠিক করেছেন যে, শহরে গিয়ে আমাকে রোজগার করতে হবে এখন থেকে…তাই শ্যামনগরে চাচা যেখানে কাজ

করে সেখানে কে এক বাবু আছে…ব্যাঙ্কে কাজ করে…তারি বাড়ীতে নাকি আমার কাজ ঠিক ক'রে দেবে…

জয় সিং বলে ওঠে, শহরে থাকবি… কি মজা!

মুন্নু বোঝে জয় সিং-এর এত আনন্দ কেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা সে বলে না। শুধু একটু হাসে। সে-হাসির অর্থ, আজ যদি আমাকে না চলে যেতে হতো, তাহলে একটা ঘুষিতে তোমাকে জানিয়ে দিতাম, সদারী করার লোভের কি ফল!

জয় সিং-এর প্রতি তার এই আক্রোশের পেছনে, মুন্নুর মনের কোণে কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, আজ তার এই গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে জয় সিং-এর বাবার চক্রান্ত আছে…

সে শুনেছিল, একদিন কিভাবে জয় সিং-এর বাবা তাদের সব জমি-জমা ঋণের দায়ে দখল ক'রে নিয়েছিল…অজন্মার দিন তার বাবা এই তালুকদার-মহাজনের সুদ ঠিকমত দিতে পারেন নি, তার ফলে তালুকদার সমস্ত জমি ডিক্রী ক'রে দখল ক'রে নেয়…সে দেখেছিল, তারপর থেকে তার বাবা কি ভাবে দিন দিন একটু একটু করে শুকিয়ে মরে গিয়েছিলেন…তখন সে সবে মাত্র জন্মেছে আর তার চাচা নাবালক…বিধবা মা এক হাতে চোখের জল মুছেছেন আর এক হাতে জাঁতা চালিয়েছেন…সারাদিন, সারারাত…আজও যেন চোখ বুঁজলে সে দেখতে পায়, তার মার সেই শীর্ণ হাত জাঁতার ডাণ্ডা ধরে অনবরত ঘুরিয়ে চলেছে…দেখতে পায়, যেদিন তার মা মারা গেল…মাটীতে শুয়ে…সে কি ভয়ঙ্কর ম্লান বিবর্ণ মুখ…তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে, অবচেতনার গভীর গহ্বরে মার সেই ম্লান মুখ অসহায় বেদনার সকরুণ ম্লানিমায় চিরকালের মত মুদ্রিত হয়ে আছে।

নিজের অন্তরকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই যেন জয় সিং আবেগ ভরে জিজ্ঞাসা করে, তা'হলে আর ফিরে আসচিস্ না বল্?

মুন্নু দূরের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে বলে, না…আর কখনো না… কখনো না…

কিন্তু নিজের অন্তরে সে জানতো, সে যা বল্লো, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু জয় সিং-এর কথার উত্তর দিতে গিয়ে, ইচ্ছা করেই সে মিথ্যা বল্লো। যদিও তখন মনের আর এক দিকে তার নিদারুণ বাসনা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলে জয় সিংকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। যতই কেন তার চাচী তাকে গালাগাল দিক, যতই কেন সে-দজ্জাল মাগী তাকে কাজে-অকাজে খাটিয়ে মারুক, লোকে গরু-ছাগলকে যে ভাবে মারে, যতই কেন তার চাচী সে ভাবে দু'বেলা তাকে করুক প্রহার···তবু তার মন কোন দিন চায় নি সেই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে···

অন্তত এখন তো চায় নি, পরে কোন দিন চাইবে কি না কে জানে?

শহর ঘুরে এসে গাঁয়ের লোকেরা যখন শহরের সব গল্প বলতো··· সেখানকার আশ্চর্য সব ব্যাপার···বড় বড় সব সাহেব, বড় বড় সব বাবু··· আগা-গোড়া সিল্ক আর পশমে মোড়া, লালাদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড, কত তাদের আসবাব···আর কি তাদের খাওয়া-দাওয়া···অবাক হয়ে সে শুনতো··· মনে মনে কত না স্বপ্ন গড়ে উঠতো। বিশেষ করে তার মনকে দোলা দিত, শহরের সব কলকব্জা যন্ত্রপাতির কথা···তার বিজ্ঞান-প্রাইমারে কিছু কিছু সে-সব যন্ত্রের কথা সে পড়েছে। তাই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, এখানকার স্কুলের সব পড়া শেষ করে, একদিন সে শহরে যাবে··· নিজের হাতে শিখবে, কি করে সে সব যন্ত্র চালানো যায়, কি করেই বা সে-সব যন্ত্র তৈরী করা যায়।

ইতিমধ্যে, এই গাঁয়ের আদুল বাতাসে, তার কলাবাগানের ছায়ায় ছায়ায়, মেঠো ফুলের গন্ধে-ভরা খোলা মাঠে, সমবয়সীদের সঙ্গে একজোটে গরু চরানোর অবকাশে, যদি এ-বাগান সে-বাগান থেকে ফল জুটিয়ে জড় করে, সকলে মিলে একসঙ্গে হৈ হৈ করে খেয়ে দেয়ে, গাছে গাছে লুকোচুরি খেলে দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়, মন্দ কি!

সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যা এসে যখন অঙ্গ দেয় জুড়িয়ে···শাল-সেগুন-দেওদারের অঙ্গে জাগিয়ে শিহরণ যখন আসে দূর পাহারের চূড়া থেকে

বরফ-ছোঁয়া বাউরী বাতাস···এই মুহূর্তে এখনও যা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সে ক'রছে অনুভব··বুনো ঝোপ থেকে ওঠে বুনো ফুলের ঝাপসা গন্ধ···কাছে ভিতে কোথা থেকে ডেকে ওঠে ব্যাঙের দল···পাখীরা উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে গান গেয়ে···প্রজাপতি ঘুরে মরে বুদ হয়ে রূপোলী রোদে··· ভ্রমর আসে গুণগুণিয়ে সর্ব-অঙ্গে মেখে ফুলের পরাগ···তখন কেমন করে সে ভাবতে পারে, এ-সব ছেড়ে চিরকালের মত চলে যেতে হবে তাকে !

তার নিজের অজ্ঞাতে, তার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ক্যাংড়ার সেই বুনো রূপ···জগতের সব বিচিত্র যন্ত্র যদি এখানে এসে তার সামনে দিয়ে সার বেঁধে একে একে চলে যায় তাকে ডেকে, তবুও সে পারবে না, এই শান্ত-স্রোত বিয়াস নদের বালুচর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সরিয়ে নিতে।

কিন্তু···

—মুন্নু রে···ওরে মুন্নু···ও কালামুখো—

চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেগে ওঠে আবার তার চাচীর সুমধুর আহ্বান।

এবার সে উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরাও সব উঠে দাঁড়ালো।

এমন কি জয় সিংও···

মুন্নু গরুগুলোকে হাঁক দিল···সঙ্গীরাও যে-যার গরু-মোষ ডাকতে সুরু করলো।

দেখতে দেখতে সেই আহ্বানে বিয়াসের বিশ্রাম-সলিল থেকে দলে দলে কর্দমাক্ত শৃঙ্গীর দল বিরাট সব দেহ মন্দ-গতিতে আন্দোলিত করে উঠতে লাগলো ; পথের দুধারে কাদাজলের ছিটে ছড়াতে ছড়াতে, প্রহার এবং গালাগাল, দুই-ই সমান উপেক্ষা করে অভ্যাস-নির্দিষ্ট পথে নতমস্তকে তারা অগ্রসর হয়ে চল্লো···

[দুই]

—আরো পা চালিয়ে চল···শূয়োরের বাচ্ছা···পেছন ফিরে মুন্নুর দিকে চেয়ে গর্জন করে ওঠে তার চাচা দয়ারাম।

দয়ারামের অঙ্গে ঝলমল করছে লাল কোর্তার ওপর ঝকঝকে সোনালী তক্‌মা। মাথায় অতি সযত্নে বাঁধা শাদা কাপড়ের পাগড়ী। মিলিটারী কায়দায় কদম ফেলে সে চলেছে—আংরেজ সরকারের তৈরী পাহাড়ী-সড়ক দিয়ে, খোদ ইমপীরিয়াল ব্যাঙ্কের চাপরাশী সে, দেখলে মনে হয়, আংরেজ সরকারের বিরাট দায়িত্বের বোঝা যেন তারই মাথায়···

মুন্নু পথের ধারে বসে পড়েছিল। দশ মাইল একাদিক্রমে হেঁটে আসার ফলে তার খালি পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল···সে আর চলতে পারছিল না। তার চাচার পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া গরম-কোর্তা তার গায়ে কোন রকমে জড়ানো ছিল···যেন একটা বস্তা···

মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশে খর সূর্য, গায়ে সেই গরম বস্তা···ঘামে, গরমে সর্ব-অঙ্গ তার অবশ হয়ে আসছিল···মনে হচ্ছিল যেন গায়ের সব রক্ত ঘেমে জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে···

ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই শোচনীয় অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দয়ারাম আবার চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো,

—আরে আফিসে যে দেরী হয়ে যাবে···কি সর্বনাশ···

আফিসে দেরী হবার বা আগে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ, দয়ারাম জানতো, সেদিন ছুটি, আফিস বন্ধ। তবু ও যে বারবার তারস্বরে সে-কথা মুন্নুকে জানাতে হচ্ছিল, মুন্নুকে তাগাদা দেবার জন্যেও নয়···তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, পথচারী অন্য পথিকদের এবং তার গেঁয়ো ভাইপোটার কাছে জাহির করা, সে যে-সে লোক নয়···খোদ আংরেজ সরকারের তক্‌মাধারী চাপরাশী!

পথের ধারে বসে মুন্নু তখন অসহায়ভাবে নিজের আহত পায়ের দিকে চেয়েছিল। তার দু'চোখ ভরে এসেছে জলে।

চাচার কথার উত্তরে রুদ্ধ-কণ্ঠে সে জানায়, পায়ে লাগছে বড় !

দয়ারাম বোঝে, কড়া হলে চলবে না এখন। যথাসম্ভব নিজেকে নরম্ করে নিয়ে বলে,—চলে আয়, চলে আয়… তোর পায়ের একটা জুতোর ব্যবস্থা আমি করে দেবো'খন, তোর সামনের মাসের মাইনে থেকে…

এমন সময় একটা গরুর গাড়ী পেছন থেকে এসে তাদের সামনে ক্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। হতাশভাবে সেই দিকে চেয়ে মুন্নু বলে, হাঁটতে আর পারছি না চাচা, তুমি বরঞ্চ গাড়োয়ানকে বল' না একবার আমাকে যদি তুলে নেয়…

গাড়োয়ান যাতে শুনতে পায়, এমন গলায় দয়ারাম বলে ওঠে, গাড়ীতে তোকে নিতে হলে গাড়োয়ানটা এখনি পয়সা চেয়ে বসবে…বুঝলি ? ভাবটা, গাড়োয়ান যদি যেচে তাকে ডেকে নেয়, তাতে তার আপত্তি নেই। নতুবা সে দয়ারাম… খোদ আংরেজ সরকারের চাপরাশী, নিজে ছোট হয়ে একজন গাড়োয়ানের কাছে তার ভাইপোর জন্যে স্থান-ভিক্ষা করতে পারবে না।

দয়ারামের ভাব-ভঙ্গী দেখে, গাড়োয়ানের সে-কথা বুঝতে একটুও দেরী হলো না। নিতান্ত সোজাভাবে সে বলে উঠলো, বলি ও কত্তা, কাজ করতো চাপরাশীর… অতো দেমাক কেন ? ছোঁড়াটাকে পেছনে চড়িয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে নিজেও উঠে পড়ো। এই ভর দুপুরে গায়ে ঐ সব চড়িয়ে তোমারও যে খুব সুখ হচ্ছে, তাতো মনে হয় না…

দয়ারাম, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের তকমাধারী চাপরাশী দয়ারাম, সামান্য সেই ছোটলোক গাড়োয়ানের মুরুব্বিয়ানায় জ্বলে উঠলো।

—চিল্লাও মত্…আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি যে তুই আমার কথার জবাব দিচ্ছিস্ ? আস্পর্ধা ! সিধে যেখানে যাচ্ছিস যা…নইলে এখুনি ধরে জেলে পুরে দেবো…জানিস, আমি সরকারী লোক !

আর কথা না বাড়িয়ে গাড়োয়ান গরু দুটোকে মোচর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, আচ্ছা বাবা…আনন্দ কর ! আরে ছোঃ… ঐ বাচ্ছাকে এমন কষ্ট দেয়…মানুষ না কি ?

দয়ারামের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল মুন্নুর ওপর। তার হাত ধরে হ্যাঁচকা দিয়ে গর্জে উঠলো, ওঠ্ বেটা বেজন্মা…ব্যাটার জন্যে আমায় কি না কথা শুনতে হলো একটা গাড়োয়ানের? ওঠ্…নইলে মেরে গুঁড়িয়ে ফেলবো!

দাঁতন করা সাদা দাঁত ক'টা সব বেরিয়ে পড়লো…

মুন্নু উঠে দাঁড়ালো…পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সে বেশ ভাল রকমই জানতো যে তার চাচা শুধু অকারণ ভয় দেখায় না…সেখানে তার কাজ আর কথা এক। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের জল মুছে, মনে মনে গালাগাল দিতে দিতে সে সেই দ্বিপ্রহরের রোদে অনুসরণ করে চল্লো তার অভিভাবককে।

খানিকটা ভয়ে, খানিকটা রাগে, চলতে চলতে পথের কথা, পায়ের ব্যথা সে ভুলে গেলো। মন তখন তার ভরপুর, ঐ সামনের লোকটার ওপর বিদ্বেষে…

হঠাৎ খাদ থেকে নেমে পথের বাঁকে তার চোখের সামনে জেগে উঠলো, অপরাহ্নের রক্তিম আলোকচ্ছটায় সুস্পষ্ট সুন্দর, প্রান্তরমেখলা নগরী…মন থেকে যেন তার মুছে গেল উঁচু-নীচু সেই পাহাড়ে-দেশের স্মৃতি। অদেখা সেই সমতলভূমি…বিচিত্র অভিনব তার পরিবেশ…এক অনাস্বাদিত মধুর অভিজ্ঞতার সম্ভাবনায় তার মনকে নিমেষে করে তুল্লো লদ্বেল।

যতই সে এগিয়ে চলে, ততই বিস্ময়ে তার চোখ বড় হয়ে উঠ্তে থাকে… আপনা থেকে দুঠো ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়…এত রকমের গাড়ী যে আছে,… তা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না…কোনটার দুটো চাকা, কোনটার চারটে চাকা…কোনটার আবার কাঠের চাকার বদলে রবারের চাকা…ফিটন… ল্যাণ্ডো…ফটফটী…টঙ্গা…

অবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে…

এমন সময় হঠাৎ বিপুল বিস্ময়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু দূরে সে দেখলো একটা কালো বিচিত্র-গড়ন জিনিস…পিঠের দিকে উটের কুঁজের

মত দুটো কালো কালো কি উঁচু হয়ে আছে···আর একটা লম্বা চোঙার ভেতর থেকে হু হু করে কালো, মিস কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুচ্ছে··· কি জোরে ছুটে চলেছে···আর তার সঙ্গে কাঁচের জানালা-বসানো মেটে রঙের সব ছোট ছোট বাড়ী · তারাও ছুটে চলেছে···আর কি জোরে বাঁশীর মত শব্দ করে চলেছে···সে-শব্দে তার মনে হলো তার বুকের ধুকধুকুনি যেন গলার কাছে এসে আটকে পড়েছে···

বুকের সেই অসহ্য ধুকধুকুনি আর সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে গিয়ে তার চাচাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে,

—চাচা, ওটা কি জানোয়ার ?

দয়ারাম এবার শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়, আরে বোকা জানোয়ার কেন ? রেল-গাড়ীর এন্‌জিন্‌

হঠাৎ দয়ারামের এই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের একটা কারণ ছিল। দয়ারাম এখন শহরে ঢুকতে চলেছে। পাড়াগাঁয়ের পথে যে-দাপট দেখানো সম্ভব, এখানে তা সম্ভব নয়। তাই ক্রমশ তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে ইম্‌পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সামান্য একজন চাকরের আসল রূপ ফুটে উঠছিল।

মুন্নুর নজর অবশ্য সেদিকে ছিল না। সে দেখছিল, সেই কালো জানোয়ারটা হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে—একটা ছোট্ট বাড়ীর সামনে থেমে গেল···আর সেই সঙ্গে অসংখ্য লোক সেই সব কাঁচের জানালাওয়ালা ঘর থেকে নেমে পড়ছে···কত রকমের লোক···কি বিচিত্র তাদের পোষাক··· এমন পোসাকের বাহার কাংড়ার গ্রামে সে তো দেখেনি কখনো ! আপনা থেকে সে বলে ওঠে, আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !

দয়ারামের কাছ ঘেঁষে সে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা চাচা, এত যে লোক··· এদের গরু-ছাগল চরাবার মাঠ সব কোথায় ? এদের ক্ষেতই বা কোথায় ?

ঘাড়টা সোজা করে নিয়ে দয়ারাম বলে, শহরের লোকের গরু-ছাগলও নেই—ক্ষেত খামারও নেই। যারা গেঁইয়া, তারাই শুধু গরু চরায় আর মাঠ চষে।

মুন্নু অবাক হয়ে যায়।

—তাহলে তারা খায় কি করে?

—খায় কি করে? আরে মুখ্যু—তাদের আছে টাকা…লাখ লাখ টাকা… আমার ব্যাঙ্কে সব জমা রাখে। চাষা যে গম চষে, ওরা তাই কিনে আটা তৈরী ক'রে আংরেজ সরকারকে বেচে, চাষাদের কাছ থেকে তুলো কিনে কাপড় তৈরী করে বেচে—তাতেমোটা টাকা লাভ করে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আছে, বাবু…তারা অফিসে কাজ করে, তাইতে টাকা কামায়। তোকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সে-ও অমনি বাবু… মস্ত বাবু…

—কি আশ্চর্য!

দয়ারামের পিছু পিছু সে শহরে প্রবেশ করে। পথের ধারে খাবারের দোকানে বৃহৎ কড়াতে তখন খাবারওয়ালা মেঠাই তৈরী করছে…তার তপ্ত সুবাস মুন্নুর নাকে এসে লাগে। দেখে, কত বিচিত্র সব মেঠাই, থাকের পর থাক, কিরকম কায়দায় সাজানো…পাশ দিয়ে ফিরিওয়ালা চলে যায়, হাতে তার সূতো দিয়ে বাঁধা নানান্ রঙীণ বেলুন…রাস্তার ধারে বিচিত্র সব খেলনা…কত রঙ-চঙে সব জিনিস…ঠাণ্ডা কুলপী…মুন্নু দেখে, একটা ছোট্ট টিনের চোঙা থেকে নেড়ে বরফওয়ালা শালপাতায় বরফ ঢেলে দিচ্ছে… কাঠের চৌকীতে বসে পথিক পরিতৃপ্তভাবে জিহ্বা বার ক'রে আস্বাদন করছে।

মুন্নুর শুষ্ক তৃষিত জিহ্বা সজল হয়ে আসে…দুর্বার বাসনা হয়, ঐ অপরূপ জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে, কিন্তু সাহস করে বলতে পারে না চাচাকে। কিন্তু সে-কথাও বেশীক্ষণ থাকে না মনে। হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখে একটা কাঠের বাক্সের ওপর একটা কালো চাকা ঘুরছে আর সেই কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে কেমন মিহি গানের আওয়াজ আসছে। সাহস করে সে সেই দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু হঠাৎ আওয়াজটা কি রকম গম্ভীর হয়ে আসে, সে ভয়ে পিছিয়ে পড়ে।

দয়ারাম পেছন ফিরে দেখে তার অনুবর্তীটি তখন বহুৎ পিছনে পড়ে রয়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে, আরে পা চালিয়ে আয়···নইলে ভিড়ে কোথায় যাবি হারিয়ে···

সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে মুন্নু জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা চাচা, লোকটা ঐ বাক্সের ভেতর থেকে গান গাইছে কি ক'রে?

কথাটা পাশের দোকানদারের কানে যেতেই সে হেসে উঠলো এবং মুন্নুর দিকে চেয়ে তার বুঝতে একটুও দেরী হলো না, যে ছেলেটী কোথা থেকে আমদানী হয়েছে।

দয়ারাম বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, আরে গরু···ওটা হলো ফনোগ্রাম··· মানুষ কোথায়? মেসিনে কথা বলছে···

কথাটা মুন্নুর কাছে সমানই দুর্বোধ্য লাগলো। মেসিন আবার মানুষের মত কথা বলে কি ক'রে? কিন্তু আর বেশী প্রশ্ন করা নিরাপদ হবে না মনে ক'রে সে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত যন্ত্রটী যেন পেছন দিক থেকে তাকে আকর্ষণ করতে লাগলো।

ক্রমশ শহরের ভেতর তারা এসে পড়ে। পাশ দিয়ে চলে যায় বিচিত্র সব পোষাকে নর-নারীর দল···মেয়েদের এমন চলন-চালন, এত পোষাকের বাহার সে কল্পনাই করতে পারেনি। যতই সে এগিয়ে চলে, ততই তার মনে হয়, সে যেন স্বপ্নে এগিয়ে চলেছে···তার আশে পাশে যে-সব বিচিত্র জিনিস সে দেখছে, যে-সব সুন্দর-বেশ নর-নারী আসছে যাচ্ছে, তারা যেন সব স্বপ্নলোকের বাসিন্দা···তার সেই পাহাড়ের ছোট্ট জগতের সঙ্গে তাদের যেন কোন সম্পর্কই নেই।

কিন্তু শহরের ভেতরে যখন খানিকটা এসে পড়েছে, তখন দেখে, কি আশ্চর্য, এই তো তাদের দেশের লোকও তো রয়েছে, তারি মতন পোষাক-পরিচ্ছদ, তারি মতন দেখতে···তবে তাদের কারুর মাথায় ঝাঁকা···কারুর মাথায় বস্তা ··

মুন্নুর যেন সব গোলমাল লেগে যায়। বুঝতে পারে না, এটা কি রকম দেশ। কাদের দেশ।

এমন সময় এক মস্ত বড় পাথরের বাড়ীর সামনে দয়ারাম দাঁড়িয়ে পড়ে। মুন্নুকে বলে একটু দাঁড়া এখানে!

মুন্নুর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের বাড়ীর সামনে কয়েক ধাপ উপরে উঠে দয়ারাম সেলাম ক'রে দাঁড়ায়,

—সেলাম পীর্ দীন্…

মুন্নু অবাক হয়ে দেখে, যে লোকটাকে চাচা সেলাম জানালো, তারও গায়ে টকটকে লাল কোর্তা, মেহেদী পাতার রঙে লোকটার দাড়ি সব লাল হয়ে গিয়েছে। হাঁপানি রুগীর মত কাশতে কাশতে দয়ারামের অভিবাদনের উত্তরে সে জানায়, এই যে সেলাম, সেলাম, আরে…এত দেরী ক'রে? বাবু সাহেব তো রেগে আগুন, কেউ নেই যে তার দুপুরের নাস্তা নিয়ে আসে!

—বাবু সাহেব তা হলে আফিসেই আছে?

—হাঁ…

দয়ারাম আশ্বস্ত হয়। যখন খানা আনবার কোন লোক নেই, এই উপযুক্ত সময়, এই সুযোগ মত সে নিশ্চয়ই মুন্নুর একটা ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারবে। মুন্নুকে কাছে ডেকে নিয়ে সে আফিসের ভিতর ঢুকে পড়ে।

মুন্নু নিঃশব্দে তার চাচার অনুসরণ ক'রে চলে…কোনখানে দেখে, রাশীকৃত টাকা গোনা হচ্ছে—কোথাও বা তাড়া তাড়া নোট খস্ খস্ ক'রে গোনা হচ্ছে। হঠাৎ সামনের একটা ঘরে দরজা ঠেলে দয়ারাম ঢুকে পড়ে।

একটা মস্ত বড় টেবিলের সামনে চেয়ারে একটী ছোট্ট মানুষ বসে… ফোলা মুখ, মুখের মধ্যে বৈশিষ্ট বলতে একটা চ্যাপটা নাক…

পা দুটো দরজার কাছে ঝেড়ে নিয়ে দয়ারাম হাত জোড় ক'রে বলে ওঠে, নমস্কার বাবুজী!

বাবুজী তখন ঘাড় নীচু করে লিখছিলেন। একবার ঘাড় তুলে দেখে নিলেন মাত্র। কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না।

মুন্নুর কানে দয়ারাম বলে, আরে নমস্কার দে, বাবুর নামে দেওতার কাছে দোয়া মাঙ্গ···

চারদিকে সেই টাকার ঝনঝনানি, নোটের খস্ খস্ আওয়াজ, ঝক্‌ঝকে সব পেতলের রেলিঙ, টেবিল, চেয়ার, পায়ের তলায় নরম কার্পেট, মাথার ওপরে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ইলেক্‌ট্রীক পাখা···মুন্নুর মন সে-বিচিত্র জগতে যেন পথ হারিয়ে ফেলে। চাচার নির্দেশ অনুযায়ী কলের পুতুলের মত আপনার মনে সে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বল্লো···মাটী থেকে মাথা তুলে সে কিন্তু চাইতে পারল না সামনে।

ক্ষণকালের জন্য ঘরে এক বিচিত্র নিস্তব্ধতা·· তার মধ্যে বাবুজী আবার ঘাড় তুলে হিসেব-ক'রে একটু হাসলেন···দেখতে দেখতে সে-হাসি ঠোঁটের কোণে অকথিত তাচ্ছিল্যে বেঁকে মিলিয়ে গেল···

মুন্নু সেই সময় একবার চোখ তুলতেই দেখতে পায় সে ভঙ্গী···ভয়ে আর ভাবনায় তার হাত-পা যেন কাঠ হয়ে আসে।

সিংহাসন-উপবিষ্ট রাজাধিরাজের দিকে একান্ত দীনভাবে চেয়ে দয়ারাম বলে, মহারাজ আপনার সেবার জন্যে ভাইপোটাকে নিয়ে এলাম···

মুন্নুর দিকে আঙ্গুল তুলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, অঃ—ওটা বুঝি?

—জী জনাব! আরে গেঁইয়া হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ্গ বাবুজীর জন্যে···

মুন্নু তখন একদৃষ্টিতে বাবুজীর পায়ের পালিশ-করা চকচকে বুট জোড়ার দিকে চেয়ে ছিল, চাচার কথায় কলের পুতুলের মতন সে শুধু ঘাড় আর পিঠ বেঁকিয়ে দিল···কোন দিন কি ঐ রকম এক জোড়া জুতো সে পরতে পারবে না? হঠাৎ চাচার দিকে চোখ পড়তেই, সে বুঝতে পারলো, তার নির্দেশের অর্ধেক সে পালন করেছে, বাকি অর্ধেক যা মুখের কথায় ব্যক্ত করতে হবে, তা তার করা হয় নি।

তাই হঠাৎ সে হাত জোড় ক'রে বলে উঠলো, ভগবান্ ভাল করুন···

বাবুজীর অবশ্য সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁর টেবিলের পাশে একটা কালো যন্ত্র তখন ক্রিং ক্রিং ক'রে অনবরত শব্দ করছে···মুন্নু দেখলো বাবুজী একটা

ছোট্ট চোঙার মত কি জিনিস কানের কাছে তুলে নিয়ে, কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন…কথাগুলো কিন্তু কোন্ ভাষায় তা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার কানে এসে লাগছিল,

হুস্…স্থার · ইয়ে · ফটনট ইয়াপ…

ভবিষ্যৎ মনিবের মুখে সেই ভাষা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল, তার স্কুলের কথা…তার মাষ্টার তাদের বার বার বলতো, বাবু হতে হলে আংরেজী শিখতে হবে…স্কুলে কিছু কিছু আংরেজী সে শিখেও ছিল…কিন্তু তার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সে যেন বিব্রত হয়ে পড়লো…কিছুক্ষণ ধরে শোনার পর, সে ঠিক করে নিল, এই হলো আসল আংরেজী ভাষা…

—আচ্ছা…বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বিবিজীর কাছে দিগে যা…

বাবুজী হুকুম দেন।

দয়ারাম জোড় হাতে মাথা নত ক'রে কৃতজ্ঞতা জানায়। তারপর মুন্নুর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে আসে সোজা রাস্তায়…

এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে তারা যে মহল্লায় এলো, মুন্নু দেখে, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সব বাড়ী, যেন একটার গা থেকে আর একটা বেরিয়েছে : কোন বাড়ীর কোন শ্রী ছাঁদ নেই…এলোমেলো ভাঙ্গা চোরা : কোথাও খানিকটা ফেলে-দেওয়া এঁটো শাক সব্জী পচচে… কোথাও হয়ত পড়ে আছে ভাঙ্গা কাঁচের সব শিশি-বোতল, পুরনো ভাঙ্গা টিনের কেনেস্তারা, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা ন্যাকড়ার জঞ্জাল, কোথাও বা ভাঙ্গা পাঁচিলের নোনা-ধরা ইঁটের স্তূপে শেওলা আর বুনো গাছ জমে রয়েছে : লোক-জনের আসা-যাওয়া থেকে মুন্নু নিজের মনে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে নিল, শহরের আশে-পাশে যে-সব বাবুরা থাকেন, এই বোধ হয় তাঁদের মহল্লা—

এই মহল্লার একান্তে বাবুজীর বাড়ী : একতলা, চৌকো মতন ছোট্ট বাড়ী। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে একটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডার ওপর একটা কালো কাঠের টুক্‌রোতে স্পষ্ট সাদা ইংরেজী অক্ষর আশে-পাশের দেশী

লোকদের সগর্বে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই বাড়ীতে বাস করেন, 'বাবু নাথু মল, সাব এ্যাকাউন্‌টেণ্ট, ইম্‌পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, শ্যামনগর।'

সেখান থেকে দাঁড়িয়ে মুন্নু দেখে পাশ দিয়ে যে উঁচু-নীচু পাহাড়ী রাস্তা চলে গিয়েছে, তার খানিকটা ওপরেই, বড় বড় গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় চমৎকার সব ছোট ছোট বাড়ী রয়েছে···ছবির মতন দেখতে সমান-ক'রে-কাটা বাহারী গাছের বেড়ায় ঘেরা, সবুজ মকমলের মত ঘাসের বিছানা পাতা···তার আশে-পাশে কত না রঙের কত না ফুলের বাহার···দূর রহস্য-লোকের মত সেই দৃশ্য তার মনকে টানে···বিস্ময়ে ভাবে, ওখানে কারা থাকে ?

এমন সময় সেই স্বর্গলোক থেকে হঠাৎ তার দৃষ্টি আবদ্ধ হ'য়ে গেল এক বিচিত্র মূর্তির ওপর···লাল টক্‌টকে ইয়া বড় মুখ···মাথার ওপর ছোট্ট চুবড়ীর মতন কি একটা বসানো···গায়ের জামাটা, মুন্নুর মনে হলো যেন কোমরের তলা থেকে হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছে···নিম্ন-অঙ্গে এমন আঁট ক'রে কি একটা পরেছে, যাতে মুন্নুর নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো···সমস্ত বিপুল নিতম্ব দেশটা যেন আরো প্রকট হয়ে উঠেছে··তার ওপর বাদামি রঙের এমন একটা জুতো পরেছে যে সেটা হাঁটু পর্যন্ত চলে গিয়েছে···এমন কিম্ভূতকিমাকার পোষাক-পরা মানুষ সে এর আগে আর কখনও দেখে নি···মনে মনে সে ঠিক করে নিলো, তা হলে এই হলো আংরেজ···

হঠাৎ দেখলো তার চাচা, ডান পা-টা সজোরে বাঁ পায়ের সঙ্গে ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, সালাম হুজুর !

অভিবাদনের উত্তরে সেই কিম্ভূতকিমাকার ভয়াবহ মূর্তি কি করলো তা দেখবার সাহস মুন্নুর কুললো না, সে শুধু দেখলো তার হাতের বেতটা হাওয়ায় একবার দুলে উঠলো···জোর করে মুন্নু নীচে শহরের ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে রইলো।

মুন্নু যখন বুঝলো, যে মূর্তিটী তাদের শ্রবন-সীমার বাইরে চলে গিয়েছে তখন সে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাচার দিকে দু'চোখ বড় বড় করে চাইলো···তার উত্তরে দয়ারাম বলে উঠলো, ব্যাঙ্কের বড় সাহেব !

এই তিনটী কথা উচ্চারণ করতে দয়ারামের কণ্ঠ ভয়, ভক্তি এবং সম্ভ্রমে ভেঙ্গে পড়লো !

দয়ারাম কয়েক ধাপ উঠে দরজায় ধাক্কা দিল কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ এলো না। কড়া ধরে নাড়া দিল। তাতেও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন হাঁক দিল, বিবিজী ! দরাজাটা খুলুন একবার।

পাশের একটা দরজা থেকে চিক তুলে একটা নারীর মুখ দেখা দিল।

দয়ারাম হাতজোড় করে বলে উঠলো, বিবিজী আপনার সেবার জন্যে আমার ভাইপোকে নিয়ে এসেছি, এই যে আমার সঙ্গে

তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মুন্নুর দিকে চেয়ে বলে উঠলো, শূয়োর, হাত জোর করে বিবিজীকে বল, আপনার চরণে পেন্নাম হই বিবিজী।

মুন্নু যন্ত্রচালিতের মত হাতজোড় করে কোন রকমে উচ্চারণ করে, আপনার চরণে ··

এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে শিশু-কণ্ঠে আর্তনাদ জেগে উঠলো এবং সেই সঙ্গে নারী মূর্তিটীও বাড়ীর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল··

মুন্নু শুনতে পেল, বাড়ীর ভেতর থেকে তীব্র উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ আসছে, —মর্ · মর্·· আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে, দুদণ্ড লোকজনের সঙ্গে একটু কথা বলবো তারও উপায় নাই ? মরবি কবে···হাড় জুড়োবে আমার··· মলপ্পেয়ে, ড্যাগরা···

ছেলের জন্যে আরো অনেক ভাল ভাল বিশেষণ বিবিজী প্রয়োগ করে যেতেন, কিন্তু হঠাৎ দয়ারামের উচ্চ প্রশ্নে তা বাধা পড়ে গেল।

—তাহলে বিবিজী, কথাবার্তা সব ঠিকই রইলো, আমি এখন একে রেখে যাই ?

কি উত্তর আসে তার জন্যে মুন্নু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাব গতিক দেখে ইতিমধ্যেই তার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল।

বিবিজী কয়েক পা এগিয়ে আসতেই, আবার সুরু হলো সেই কান্না !

শুধু বিশেষণে কাজ হলো না দেখে বিবিজী তখন ঘরের ভেতরে গিয়ে

ছেলেটির গালে একটি বিশেষ চড় বসিয়ে হন্ হন্ করে ফিরে এসে বল্লেন, না, যেও না, দাঁড়াও ! বাবুজীকে বলেছ সব ?

—সে আর বলতে হবে না বিবিজী···আফিসে তাঁকে আগে জানিয়ে তাঁর কথামত আপনার কাছে হাজির হয়েছি !

—বেশ ! তাহলে ও এক কাজ করুক—বাড়ীতে কোন তরি-তরকারি নেই···আফিসে যাক্, ফেরবার সময় বাজার থেকে···দাঁড়া মুখপোড়া, যাচ্ছি···

কথা অসমাপ্ত রেখে বিবিজীকে আবার ঘরের ভেতর ছুটতে হলো, কারণ শান্ত ছেলেটি তখন কান্নায় মার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অপারগ হয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে···

মুন্নু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে, গুণে গুণে গালে চড় পড়ছে·

হঠাৎ মুন্নুর মনে পড়ে গেল তার চাচীর কথা। মনে হলো, তার চাচী অন্তত এর তুলনায় দয়ালু। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার কিশোর চিত্তে, ছিন্ন সুরের মত এক বিষণ্ণ আর্তনাদ জেগে উঠলো, কেমন করে এখানে সে বাস করবে ?

হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে যায় কানে আসে বিবিজীর কণ্ঠস্বর···

—তুমি বরঞ্চ বাবুজীকে গিয়ে বলো, এর হাত দিয়ে যেন বাজার পাঠিয়ে দেন।

এত দূর পাহাড়ে পথ হেঁটে এসে মুন্নু একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল··· ক্ষিদেয় তার সারা অঙ্গ জ্বলছে·· এতক্ষণ পর্যন্ত তার মনে মনে আশা ছিল, যাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে, তারা নিশ্চয়ই হাতমুখ ধুতে বলবে, খেতে দেবে···কারণ, তাদের গাঁয়ে যে সে তাই দেখে এসেছে, যখনি কোন নতুন লোক আসে, তা সে যখনি আসুক না কেন, আর যেই হোক্ না কেন, আগে তাকে খেতে দেওয়া হয়·· তারপর, কাজকর্ম, অন্য কথা। কিন্তু এখানে একি ব্যাপার ! এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে, ধূলো-পায়েই আবার তাকে কাজে পাঠাচ্ছে ! সে ভাবে, হয়ত শহরের এই রীতি-নীতি।

এক সর্বগ্রাসী অবসাদের ভারে মুন্নু যেন ভেঙ্গে পড়ে।

দয়ারাম উত্তরে জানায়, বেশ তাই হবে বিবিজী!

আবার সেই রাস্তা! মুন্নু হাঁটতে আরম্ভ করে। দয়ারাম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, পা চালিয়ে আয়, পা চালিয়ে আয়! তোর আর ভাবনা কি বিবিজীর কাছে সুখে থাকবি, খাবি দাবি...তার ওপর মাসে মাসে তিন টাকা করে মাইনে পাবি। আমার ডেরা তোকে দেখিয়ে দেবো...ছুটি পেলে চলে আসবি। হাঁ...মন দিয়ে কাজ করবি...আর সব সময় মনে রাখবি, তুই ওদের চাকর...তবে ওরা লোক ভাল!

চাচার সেই অমূল্য উপদেশবাণী শুনতে শুনতে মুন্নুর দু'চোখ ফেটে জল ঝরে পড়ে...সেই অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে ঝাপসা সে যেন দেখতে পায় পেছনে ফেলে-আসা তাঁর গাঁয়ের সব পাহাড়...সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে দ্বিপ্রহরের খর রবিকরে ধূসর নীল...দেখতে পায় ঝিকিমিকি বিয়াসের রৌপ্য-রেখা... তীরে তার তেমনি চরছে গরুর পাল সবুজ তৃণে মুখ ডুবিয়ে...মাথার ওপরে তেমনি রয়েছে উদাস, উদার আকাশ, মাইলের পর মাইল জুড়ে...

বাবু নাথুমলের বাড়ীর রান্নাঘরের এক কোণে কোন রকমে জড়সড় হয়ে মুন্ন সে রাত্রির মত শয্যাগ্রহণ করে। কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে সে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারেনা। বিষণ্ণ চিত্তে নিদ্রাও প্রবেশ করতে চায় না। গায়ে দেবার জন্যে একটা শতছিন্ন ময়লা লেপ সে পেয়েছিল বটে, কিন্তু মশার কামড়ে তাকে সারাক্ষণ প্রায় অর্ধ-সজাগ করে রাখে। তার ওপর একদল রাতকানা মাছি তাদের রাত্রি-বাসের উপযুক্ত স্থান হিসাবে তার মুখটিকেই নির্বাচিত ক'রে নিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে চোখ দু'টি বন্ধ করে সে পড়ে রইলো।

ভোর বেলা সে আর শুয়ে থাকতে পারলো না। কোথায় এসেছে, রাত্রির অন্ধকারে তা সে ভাল ক'রে দেখতেই পায় নি। তাই ঘুম থেকে

উঠে, রান্না ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে সে উঁকি মেরে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো।

একটা তীব্র নাক-ডাকার আওয়াজ আসছে। বাবু নাথুমল ঘুমুচ্ছেন। তার পাশেই আর একটা ঘর। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে মুন্নু দেখে তার মনিবের চেয়ে ফর্সা আর একজন লোক ঘরে বিছানার ওপর ঘুমুচ্ছে। কাল রাত্রিতে সে কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে, তার মনিবের একজন ছোট ভাই আছে। নিশ্চয়ই এই সেই ছোট বাবু।

এমন সময় হঠাৎ মুন্নু চমকে উঠলো!

বিবিজীর গলার আওয়াজ...এ মুন্নু, উঠেছিস?

মুন্নুর বুকের ভেতরটা যেন খুব জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। তার ভয় হলো, হয় তো তার পায়ের শব্দে বিবিজীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

ভীতকণ্ঠে সে জবাব দেয়, উঠেছি বিবিজী!

ঘরের ভেতর থেকে নিদ্রা-অলস কণ্ঠে আদেশ আসে,

—তাহলে বসে না থেকে উনুনের ছাইগুলো ফেল্...রাত্রিরের এঁটো বাসনগুলো মাজ...বলি, বাসনগুলো মেজে শুতে পারো নি? অত সকাল সকাল শোবার ঘটা কেন?...হাঁ। তারপর উনুন ধরিয়ে কেটলিতে করে জল চড়িয়ে দিবি...বাবুজীর চা হবে...একটু পরে আমি উঠছি।

রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতে হঠাৎ মুন্নুর শরীরটা যেন কেমন করে উঠলো। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘটী হাতে সে মাঠে চলে যেতো। মাঠ থেকে কাজ সেরে, একেবারে পাতকুয়োর জলে স্নান সেরে সে বাড়ী ফিরতো।

এতক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না, কিন্তু প্রকৃতি যথাকালে তা স্মরণ করিয়ে দেবেই। কিন্তু বিপদ হলো সে যায় কোথায়? চারিদিকেই ঘর বাড়ী। রাস্তায় তখন লোক চলাচল সুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে এলো। সে আর নিজেকে চেপে থাকতে পারছে না। কি বিপদ! কোথায় যায়, কি ভয়ঙ্কর জায়গা রে বাবা, শহর!

বাড়ীর গায়ে পাঁচিলের ধারেই নিরুপায় হয়ে সে বসে পড়লো।

এমন সময় বিবিজী হেঁকে উঠলেন, আরে মুন্নু, কোথায় গেলি রে মড়া ?

মুন্নু মহা বিপদে পড়লো, কিন্তু প্রকৃতির চরম আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় কি ?

কোন উত্তর না পেয়ে বিবিজী বাড়ীর ভেতর এ-দিক ও-দিক খুঁজে দেখতে না পেয়ে, সদর দরজা খুলে যেই বাইরে চেয়েছেন, অমনি দেখেন...ও মা...

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন,—

ওমা ছি, ছি, কি সর্বনাশ ! কি লজ্জা, কি ঘেন্না, কোথাকার একটা নির্লজ্জ, বেহায়া চাষা মরতে এলো রে ? শোর কুকুরেরও অধম !

দম-দেওয়া কলের মত অনর্গল চলতে থাকে...

—বলি আমার বরাতে কোথা থেকে এসে জুটলো এ পাপ মরেও না এরা গো, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না...বলি, কোথায় মরবি আমাকে জিজ্ঞেস্ করতে কি হয়েছিল রে মড়া ! কোথা থেকে একটা জানোয়ার মরতে এলো রে আমার ঘাড়ে...মর্...মর্...দু'বেলা বড় সাহেব এই পথ দিয়ে যায়...যদি দেখে, কি বলবে মাগো...বাবুজীর মান মর্যাদা থাকবে কোথায় ? কি সর্বনাশ...আমারই দরজার গোড়ায় কি বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড গো ! ওমা, কি হবে !

দীর্ঘ বক্তৃতা, কিন্তু একটানা সুর নয়। তার মধ্যে কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন আছে। প্রথমটা খাদে, আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কা, তারপর, রাগের চাপা ফোঁসফোঁসানি, ক্রমশ সেটা আপনা থেকে শক্তি অর্জন ক'রে অভিশাপ-বর্ষণের গর্জনে পরিণত হয়ে শেষকালে ফেটে পড়ে, অসহায় হতাশায়।

মুন্নুর মনে হতে লাগলো, দেহের সমস্ত রক্ত ছুটে মাথার দিকে চলেছে... চোখের সামনে সেই প্রভাতকালে যেন সব আবছা হয়ে আসছে...কোন রকমে সে যেমন-আছে তেমনি-ভাবে যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ! নিত্য প্রভাতে সে যে-কাজ বিনা চিন্তায় সমাপন করে এসেছে,

তার জন্মে যে জীবনে এত লাঞ্ছনা আর লজ্জা পেতে হবে, সুদূরতম কল্পনাতেও সে তা ভেবে উঠতে পারে নি।

ইতিমধ্যে সমস্ত বাড়ী সজাগ হয়ে উঠেছে।

প্রথম এলেন বাড়ীর কর্তা স্বয়ং বাবু নাথুমল···বক্র পদ···চতুষ্কোণ গ্রীবা, তাঁর ধারণা যে বাড়ীতে নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে কিম্বা ডাকাত পড়েছে···

তার পর এলেন, ছোটবাবু প্রেমচাঁদ···সুদর্শন সুগঠিত দেহ···স্বচ্ছন্দ-গতি এবং সহজ···প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার? বলি হলো কি?

তারপর এলো বাবুজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শীলা···দশমবর্ষীয়া ক্ষীণাঙ্গী বালিকা··· মাথায় এক রাশ সোনালী চুল···দুধের মত গায়ের রঙ···ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তার দুষ্টু চোখ দু'টো আপনা থেকে হেসে উঠলো··

—হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! দেখো না, লক্ষীছাড়া গেঁয়ো-ভূত আমার রান্নাঘরের সামনে ওর বাপের পিণ্ডি নামিয়েছে! রক্ত-খেগো মর্···মর্···

এতক্ষণ পরে বাবু নাথুমল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শীর্ণ হাতখানি তুলে গর্জন করে উঠলেন, হারামজাদা, এ কি করেছিস! এখানে কেন?

বিবিজীকে আর একটু উত্তেজিত করে তোলবার জন্য ছোটবাবু রসান দিয়ে উত্তর দিলেন, ওখানে না করলে, কাপড়ে করতে হতো···তখন হয়ত বিবিজীকেই পরিষ্কার করতে হতো···এতে অন্তত মেথর এসে সাফ করে নিয়ে যাবে···

শীলা ছোটকাকার পা জড়িয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

বহু কষ্টে রাগ দমন করে নাথুমল শীলার দিকে চেয়ে বললেন, তুই এখানে কি করছিস, এখান থেকে যা। চল্·· চল্···

ঘরের ভেতর এসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, পায়খানাটা কোথায় তা তোমার দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল!

বিবিজী গর্জন করে উঠলেন, তাই বটে আর কি! ঐ চাষাকে দিচ্ছি কি না, আমাদের পায়খানা ব্যবহার করতে! এখন যাও শিগ্‌গির একটা মেথর ডেকে আনো।

ব্যাপারটা যাতে সেইখানেই শেষ হয়ে যায়, সেইজন্য ছোটবাবু শীলার মারফৎ বিবিজীকে জানালেন, বলি, ও শীলা তা বলে আমরা কি দোষ করলুম? আমরা কি আজ চা পাবো না?

উত্তর শীলাকে দিতে হলো না। বিবিজীই দিলেন, থাম প্রেম···একটু আর সবুর সইছে না? আগে এটার একটা ব্যবস্থা করি তারপর···

হন্ হন্ করে ঘরের বাইরে যেতেই দেখেন, রান্নাঘরের সামনে মুন্নু দাঁড়িয়ে আছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন, বলি হারামজাদা, মরতে গিয়েছিলি কোথায়?

যন্ত্রচালিতের মত মুন্নু বলে, হাত মুখ ধুতে।

—হাত মুখ ধুতে? যা, বাইরের কল থেকে নেয়ে আয়···তবে আমার বাসন-পত্র ছুঁবি··দাঁড়িয়ে রইলি যে, বেরো আমার সামনে থেকে রক্ত-খেগোর ঝাড়··

মুন্নু যেতে যেতে শুনতে লাগলো বিবিজী তখনও গর্জন করছেন,

—ভাবলুম, যাক্, একটা চাকর এলো, এবার বুঝি একটু ঝাড়া হাত-পা হবো, ওমা উল্টো দেখছি, এ এক নতুন বিপত্তি ঘাড়ে চাপলো···পাড়াগেঁয়ে ভূত, কত আর ভাল হবে!

ছোটবাবু হেসে বলে ওঠেন, সাবধান ভাবী. পাড়াগাঁয়ের লোকদের অমন ক'রে নিন্দা করো না ··তুমিও পাড়াগাঁ থেকে এসেছ···

বিবিজী ঘাড় বেঁকিয়ে বলে ওঠেন, তুমি রসো ঠাকুর-পো, আর জ্বালিয়ো না···চাকর-বাকরের সামনে ও রকম করলে মান-মর্যাদা থাকে না।

যাতে বিবিজীর শ্রুতিগোচর হয় এমন উচ্চকণ্ঠে শীলাকে ডেকে ছোটবাবু বলেন,—শীলা তোর মনে আছে, রেলের ষ্টেশনে চা-কোম্পানীর সেই বিজ্ঞাপনে কি কবিতা লেখা ছিল ?

কাকাবাবুর অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে শীলা সহজ ভাবেই উত্তর দেয়, ও সেই কবিতাটা, না ? গ্রীষ্মকালে চা খাও শরীর ঠাণ্ডা হবে···শীতকালে,—

—হাঁ, হাঁ, তোর মনে আছে তো দেখছি। যা তো তোর মা-জননী, বিবি উত্তম কাউরের কানের কাছে গিয়ে জোরে জোরে আবৃত্তি কর্·· শীলা ছুটে গিয়ে সুরু করে.

গ্রীষ্মকালে চা খাও শরীর ঠাণ্ডা···

রুক্ষকণ্ঠে বিবিজী চীৎকার ক'রে ওঠেন, থাম্ থাম্ পাজী। তোরা সবাই মিলে আমার মাথাটা চিবিয়ে খা। বলি তোর চাচা না হয় ডাক্তারী-কলেজে পড়তে গিয়ে সাহেব হয়ে গিয়েছে, তুই-ও দেখছি মেম্-সাহেব হতে চলেছিস ?

মুন্নু তখন ভিজে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার কল-তলায় বসে বাসন মাজছিল ·· কোথা থেকে একটা ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ এসে হঠাৎ তার নাকে লাগতেই, সে এদিক ও-দিক চেয়ে দেখলো. সামনে একটা ভাঙ্গা কাঠের দরজা ঈষৎ খোলা রয়েছে···দুর্গন্ধটা সেখান থেকেই আসছে। এবং গন্ধের ইঙ্গিতে মুন্নু বুঝলো, ঐটেই নিশ্চয়ই পায়খানা ! কি আশ্চর্য !

হঠাৎ শীলা বলে উঠলো, মা, দু'একখানা বাসন মেজে দোবো আমি ?

—দূর হয়ে যা এখান থেকে। ভালোয় নেই, মন্দোয় আছে। শূয়োর পেটে খাবে কাজ করবে না ? তোমাকে আর হাত নোংরা করতে হবে না।

এমন সময় হঠাৎ বাইরের ঘরে গ্রামোফোন বেজে উঠলো। মুন্নু বাসন রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরের কলে ধোবার অছিলায় বাসনগুলো নিয়ে সে বাইরের ঘরের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে যায়·· ঠিক ঐ রকমই তো যন্ত্র আসবার সময় পথে সে দেখেছিল।

তাড়াতাড়ি কোন রকমে বাসনগুলো ধুয়ে বারাণ্ডা দিয়ে না গিয়ে, মুন্নু সোজা বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটী স্বচক্ষে

দেখবার জন্যে তার চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন। তাকে দেখেই ছোটবাবু বলে উঠলেন. এই হুতুম প্যাঁচার বাচ্ছা, ভিজে পায়ে ঘরে ঢুকলি যে?

ঘরের কার্পেটের ওপর তখন ভিজে বাসন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

ব্যঙ্গের সুরে ছোটবাবু বলে উঠলেন, হুজুর, ঐ সামনে চট রয়েছে···ঘরে ঢুকতে হলে ঐ চটে পা মুছে ঢুকতে হয়···বুঝেছেন হুজুর?

মুন্নুর মন খুসীই হলো তাতে। ছোটবাবু তো আমাকে ঘরে ঢুকতে বারণ করলেন না!

সাহস করে সে মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল। ইচ্ছা হলো একবার সে নিজের হাতে দিয়ে যন্ত্রটা ছুঁয়ে দেখবে···দেখবে, কেমন করে কোথা থেকে গান আসছে। উল্লাসে সে সব ভুলে গেল·· কয়েক মুহূর্ত আগে যে লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তখন শুধু তার এই ভেবেই মন আনন্দে ভরে উঠেছে, এমন আশ্চর্য জিনিস যে-বাড়ীতে আছে, তার পরম সৌভাগ্য যে, সে সেই বাড়ীতেই এসে পড়েছে!

তাড়াতাড়ি বাসনগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে দিয়ে, ছাই ফেলবার অছিলায় সে আবার ছুটলো বাইরের ঘরের দিকে।

বাইরে তাড়াতাড়ি ছাইগুলো ফেলে আসবে, এমন সময় হঠাৎ গান থেমে গেল।

—এই তোর নাম কি রে?

মুন্নু ফিরে দেখে একটা ছেলে কলসীতে জল ভরছে আর দু'জন বসে আছে। যে জল ভরছে. সেই ছেলেটাই প্রশ্ন-কর্তা।

—ছাই ফেলতে হয় তো এই গাদায় ফেলবি।

নির্দেশ মত মুন্নু সেই গাদায় ছাই ফেলে সহজ ভাবে জিজ্ঞাস করে,

—তুমিও বুঝি এখানকার চাকর, না?

ছেলেটা উত্তর দেয়, বাবু গোপাল দাসের বাড়ীতে আমি কাজ করি। তোর বাবুর চেয়ে ঢের বড় বাবু। আর এরা দু' জন কোর্টের

বাবুদের বাড়ীতে কাজ করে। আমরা তিনজনেই হোসিয়ারপুরের ছেলে।

উৎসাহিত হয়ে মুন্নু বলতে আরম্ভ করে, সে আসছে ক্যাংড়া থেকে…সেখানে তার চাচা আর চাচীর বাড়ী আছে…সেখানে কত সব লোকজন ক্ষেতখামার…অযাচিতভাবে অনর্গল সে বলে চলে তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সব সংবাদ…একবার যখন সে খুব ছোট ছিল, সেও তার বাবার সঙ্গে হোসিয়ারপুর গিয়েছিল…

প্রত্যুত্তরে তারাও জানায় তাদের জীবনের সব ঘটনা।

এইভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের সব অন্তরঙ্গ সংবাদ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা নিঃশেষিত করে ফেলে।

এমন সময় আবার গান বেজে ওঠে। মুন্নু ছুটে চলে আসে সোজা বাইরের ঘরে।

—এই বাঁদর! নাচ দেখি…বাঁদর-নাচ…হঠাৎ ছোটবাবু রসিকতা করে ওঠেন।

ছোট মনিবের মনের ভাব মুন্নু বুঝতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ কার্পেটের ওপর পড়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করে। গাঁয়ে পেশাদার বাঁদর-নাচিয়েদের কাছে সে যেমনটী দেখেছিল, মনিবের মনোরঞ্জনের জন্যে ঠিক তেমনিভাবে বানরের মতন হেলে দুলে নাচতে আরম্ভ করে।

শীলা হাসিতে ফেটে পড়ে, চাচা, চাচা, দেখো কি সুন্দর বাঁদর!

ছোটবাবু পেশাদার নাচিয়েদের মত হাত নেড়ে উৎসাহ দিয়ে বলে ওঠেন, সাবাস বাঁদর…সাবাস!

বাবু নাথুমলের ছোট মেয়ে লীলাও সে খেলায় যোগদান করে। ছোট দু'টি হাতে সে হাততালি দিতে আরম্ভ করে।

উল্লাসে শীলা প্রস্তাব করে, চাচা আমি ভালুক হবো?

মুন্নু সব ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে হেলে দুলে নাচে, মুখ ভ্যাংচায়, চোখ ঘোরায়, বাঁদরের মত চেঁচিয়ে ওঠে।

হঠাৎ সুর ছিঁড়ে যায়।

বিবিজী গর্জন করতে করতে ঘরে ঢোকেন, বলি কিসের এত হৈ চৈ গোলমাল? ওমা একি কাণ্ড? এ হারামজাদাকে কে এ-ঘরে ঢুকতে দিল?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব স্থির হয়ে যায়। নিস্পন্দ, নীরব। কি সর্বনাশ! মনিবদের সামনে সমানে হাসছে! আস্পর্ধা!

মুন্নু ছুটে ঘর থেকে বেড়িয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাজির হয়। আজ বহুদিন পরে যেন সে আবার সেই তার পল্লী-জীবনের সহজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে...তার দেহ-মন খুশীতে ভরে উঠেছে। তখনও তার মুখে সে খুশীর হাসি লেগেছিল।

বিবিজী তখন টোষ্ট তৈরী করার ব্যাপারে নিতান্ত আটকে পড়েছিলেন বলে গালাগালের বন্যাটা সেইখানেই থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তিনি রান্নাঘরে ফিরে এলেন এবং কয়েক মিনিট ধরে ভৃত্যের কর্তব্য সম্বন্ধে অনর্গল উপদেশ বর্ষণ করে চল্লেন,—

—তোর জায়গা হলো রান্নাঘর...ছোটবাবু বা ছেলেদের হুল্লোড়ে যদি মিশিস তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন! কাজ সব চট্‌পট করবি এক মিনিট ফাঁকি দিতে পারবি না। দশটার সময় বাবুজী আফিসে যান...শীলাও সেই সময় স্কুলে যায়, সেই জন্যে তোকে রাখা হয়েছে, যাতে তার মধ্যে সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়...আর অমনি তো নয়...রীতিমত মোটা মাইনে দিয়ে তোমাকে পোষা হচ্ছে...এক গাদা টাকা...যে টাকা তুই জীবনে দেখিস নি, তোর বাপ-দাদাও দেখে নি...আর ভাল কথা...মেথর এলে, তাকে বলে দেখে নিবি, বাইরে পাহাড়ের তলায় চাকরদের পায়খানা কোথায় আছে...দরকার হলে সেখানে যাবি...আর স্নান না ক'রে বাড়ী ঢুকবি না...ময়লা হাতে আমার কোন জিনিস-পত্তর যদি ছুঁয়েছ তাহলে... হাত পরিষ্কার আছে তো?

মুন্নু সঙ্কুচিত হয়ে বলে হাঁ।

—যা চা'টা ছোটবাবুকে দিয়ে আয়!

মুন্নু দেখে একটা ট্রে-র ওপর চায়ের কাপ, আর একটা ডিসে টোষ্ট··· আর একটা বাটীতে দুধ···সে মহা-ভাবনায় পড়লো। কি ক'রে নিয়ে যাবে? এক একটা করে নিয়ে যাবে, না, সবগুলোই এক সঙ্গে নিয়ে যাবে? শেষকালে কি ক'রতে কি ক'রে বসবে, এই ভয়ে, সে বিবিজীকে জিজ্ঞাসা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো।

—এগুলো নিয়ে যাবো কি ক'রে?

—নিয়ে যাব কি করে! ওমা! কি বিপদেই পড়লাম! সারাদিন ধরে তোমাকে এক একটা ক'রে কাজ এমনি করে বলে বলে করাতে হবে নাকি··· পোড়া কপাল আমার···কোথা থেকে একটা উজবুক ধরে এনে গছিয়ে দিয়ে গেল দয়ারাম···বলি···

মুন্নু ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই কাপ-ডিসগুলি দেখছিল···এ ধরনের বাসন তাদের গাঁয়ে সে দেখে নি···খড়ির মত সাদা···অথচ কাঁচের মত চক্‌চক্ করছে···সে ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, এগুলো কিসের তৈরী। বিবিজীকে জিজ্ঞেস করবে?

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে. এগুলো কিসের তৈরী বিবিজী?

বিবিজী তখনও তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি। হঠাৎ তার মধ্যে এমন অবান্তর প্রশ্ন শুনে তিনি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন,—

—আস্পর্দ্ধা! আমার কথার মধ্যে কথা বলা! কিসের তৈরী? ন্যাকা··· যা, যা বলছি, তাই কর গে যা···ওধারে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল···ওমা, কি কাণ্ড! চীনে মাটির তৈরী, তা-ও জানো না···সাবধান···হাত থেকে যেন পড়ে না··· তা হলে তোমার হাড়ও আস্ত রাখবো না!

বিবিজী বকে যেতে লাগলেন···মুন্নু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ট্রে-টা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চল্লো।

বাবু প্রেমচাঁদ হাত তালি দিয়ে বলে উঠলেন, সুস্বাগতম্···শীলা···এতক্ষণ পরে তবু এলো চা···

উল্লাসে শীলা চীৎকার করে উঠলো চা চা…।

এক ধারে বসে ছোট্ট লীলা আপনার মনে ঘাড় নেড়ে নেড়ে গান শুনছিল… চায়ের গন্ধ পেয়ে সে-ও বলে উঠলো…এ্যা…উঁ…আমিও চা খাবো…

মুন্নুকে দেখে আংরেজী হিন্দুস্থানীতে কৃত্রিম কোপে প্রেমচাঁদ বলে উঠলো, ইধারমে রাখ্ হো…ইয়ে কালা অড্ মি!

এটা প্রেমচাঁদের বিলাস। কোন বিলিতী জিনিস দেখলে, বা সাহেবী পোষাক পরলে, সাহেবরা যে-ভাবে ট্যারা হিন্দুস্থানীতে তাদেরই 'বয়ে'র সঙ্গে কথা বলে, সে-ও তেমনি বলে।

টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে দিয়ে মুন্নু দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, ছোটবাবু কেমন করে একটা শুড়ওয়ালা বাটী থেকে চা ঢাললো, কেমন করে আলাদা আলাদা বাটী থেকে দুধ আর চিনি মেশালো…কেমন করে চামচে দিয়ে নাড়তে লাগলো…

আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, কি আশ্চর্য!

সবই তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। এক বাটী থেকে চা, আর এক বাটী থেকে দুধ ঢালবার মানে কি? তাদের বাড়ীতে সে দেখেছে, তার চাচী একটা কড়াঁয় চা, চিনি, দুধ সব একসঙ্গে দিয়ে গরম করে, তারপর এক এক গেলাস ঢেলে দেয়। একটু আগে সে দেখেছে, বিবিজী একটা কি-রকম ধরণের গোল রুটী ছুরি দিয়ে কেটে আগুনে এক একখানা টুকরো পোড়ালো! এ আবার কি রকম রুটী? বিলিতী পাঁউরুটী এর আগে সে দেখে নি।

মুন্নুকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ শীলা বলে উঠলো, চাচা, ওকে একটু চা দেবে না?

কথাটা বিবিজীর কানে যেতেই তিনি মুন্নুকে ধমক দিয়ে উঠলেন, ওখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন রে মড়া? কাজ নেই? বলি রান্নাঘর থেকে এখানে চায়ের ট্রে-টা এনেই বুঝি ভাবছো মাইনের জোগার হয়ে গেল!

চা খেতে পা'ক আর নাই পা'ক, শীলার কথাতে মুন্নুর মন ভিজে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল একটু দাঁড়িয়ে দেখে, কিন্তু বিবিজীর মুখের দিকে

চেয়ে সাহসে আর কুলালো না। সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হলো।

পেছনে পেছনে বিবিজীও এসে হাজির।—যাও, বাসনগুলো নিয়ে ফের বেশ ক'রে ছাই দিয়ে রগড়ে রগড়ে মেজে নিয়ে এসো···একটুও দাগ বা তেল্ যেন লেগে না থাকে।

মুন্নু নীরবে বাসনগুলো নিয়ে বসে। বিবিজী দাঁড়িয়ে দেখেন···মনঃপুত হয় না···গর্জন ক'রে উঠেন, খুব হয়েছে···আর মাজতে হবে না···সব কাজ সেই আমাকেই ক'রতে হবে···কাউকে কি একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার যো আছে···বলি, ও কাণা তোর-মাজা ঐ বাসনগুলো দেখ্, আর তাকের ঐ বাসনগুলো দেখ্···ঠিক অম্‌নি ঝক্‌ঝকে করতে হবে রে মড়া···

মুন্নুর বরাৎ ভালো ঠিক সেই সময় বাইরের ঘর থেকে বিবিজীর ডাক পড়লো।

—বলি অ-শীলার মা···শুনছো গো—। বাবু নাথুমলের গলা।

—বাবু রামলাল এসেছেন···আর এক কাপ চা চাই···ঐ সঙ্গে আমার জন্যে এক কাপ গরম জল···দাড়ি কামাবো···শীলার স্নানের জলও···রামলাল বাবুর মেয়েদের হ'য়ে গিয়েছে···শীলা যে ঐ সঙ্গে স্কুলে যাবে···

কিছুক্ষণ পরে বিবিজী শীলা আর লীলাকে স্নান করিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে এলেন।

মুন্নু বাসন মাজে আর দেখে আর ভাবে, মেয়েমানুষ, না রাক্ষুসী!

তার মন কিন্তু পড়ে থাকে বাইরের ঘরে···সেখানে ছোটবাবু চা খাচ্ছেন···লোকটা অন্তত আমুদে···বড়বাবু বিচিত্র দেহ নিয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন···আবার কে একজন নতুন বাবু এসেছেন···

এক ফাঁকে সে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে···ছোটবাবু ওকি কাণ্ড করছেন? একটা সাবান দিয়ে সারা মুখ ঘসছেন···তারপর একটা দাঁতওয়ালা ছোট যন্ত্র নিয়ে মুখটা যেন চষে ফেলছেন···

বুঝলো, ছোটবাবু দাড়ি কামাচ্ছেন। মনে পড়লো, তাদের গাঁয়ের নাপিত ভায়ের কথা। কিন্তু তার হাতে তো থাকে একটা লম্বা ক্ষুর আর কত সন্তর্পণে সেই ক্ষুর সে চালায়। ছোটবাবু কিন্তু চোখ বুঁজে যন্ত্রটা চালাচ্ছে…এদিক ওদিক ওপর নীচে…একটুও কাটছে না…কি মজা!

হঠাৎ মুন্নুর সেই বিস্মিত মুখের ওপর দৃষ্টি পড়াতে ছোটবাবু তাঁর স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, চোখ বার ক'রে কি দেখছিস রে পেঁচা?

মুন্নু একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। সামলে নিয়ে হেসে বলে, যন্ত্রটার বুঝি অনেক দাম, ছোটবাবু?

—কেন? মাথার চুল কামাবি নাকি? হঠাৎ তোর মা-বাপ কে মরলো?

—আমার মা-বাপ তো নেই বাবুজী!

—ও নেই! তা এ সখ হলো কেন? বয়সে তো আমার কড়ে আঙ্গুলেরও যুগ্যি নও, এর মধ্যে ক্ষুর দিয়ে করবে কি চাঁদ! আচ্ছা, চট ক'রে একটা কাজ কর দেখি…ও ঘর থেকে আমার তোয়ালেটা এনে দে…আমি তোকে একটা জিনিস দেবো…তবে ক্ষুর নয়, একটা ব্লেড…ইচ্ছে হলে নিজের গলাটা দিব্যি কেটে ফেলতে পারবি!

আহ্লাদে মুন্নুর মন ডগমগ হয়ে উঠলো…ছোটবাবু তাকে দেবে বলেছেন…মুহূর্তের মধ্যে ছোটবাবুর সঙ্গে একটা অন্তরের আত্মীয়তা সে তৈরী করে নিল। নাচতে নাচতে তোয়ালে নিয়ে হাজির হয়।

কিন্তু তখুনি পিছনে কামান ফেটে পড়ে।

—বলি ও ন্যাদা-পেটা, এখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস্? আর ওধারে আমি খেটে খেটে মরছি! দাঁড়িয়ে আছিস কি? কাজ নেই আর?

—কি কাজ ক'রবো বলুন?

—ওমা, তুমি কাজ দেখতে পাচ্ছ না? বলি ও কাণা, চায়ের বাসনগুলো ধোবে কে? তরকারীগুলো কুটবে কে?

মুন্নু বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের বাসনগুলো ধুতে আরম্ভ করে।

মনে পড়ে চাচীর কথা। চাচী তাকে গালাগাল দিত বটে কিন্তু এ-রকম ক'রে তো তাকে খাটিয়ে মারতো না। ঘরের সব কাজ চাচীই ক'রতো, সে নিজেই গায়ে পড়ে এটা ওটা ক'রে দিতো। তবে চাচীর ছেলেপুলে হয়নি বলে, গাঁয়ের লোকেরা তাকে কথা শোনাত। সে উল্টে সেই রাগ মুন্নুর ওপর ঝাড়তো। নইলে মুন্নুর মনে পড়ে, কতদিন চাচী তাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়েছে, চুমু খেয়েছে, কতদিন রাত্রি বেলায় চাচীর কোলের কাছে শুয়ে চাচীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ মাগী অকারণে তাকে গালাগাল দেয়, অকারণে তাকে উত্যক্ত করে মারে।

চায়ের বাসনগুলো ধুতে ধুতে সে ভাবে, নিজেকেই নিজে আশ্বাস দেয়, হয়ত একদিন বিবিজী আর তাকে এ রকম উত্যক্ত করবে না, বুঝবে মুন্নু কত ভাল ছেলে, সে-ও তখন বাড়ীর ছেলের মতন হয়ে যাবে। আপাততঃ ছোটবাবু তো মন্দ লোক নয়, ভারী মজার কথাবার্তা বলে, ছেলেমেয়েরাও তার বাঁদর-নাচ দেখে খুব খুশী হয়েছে। বড়বাবু তেমন কিছু বলেন না··· কিন্তু ঐ বিবিজী···

ভাবতে ভাবতে সে শিউরে ওঠে। বিবিজী সম্বন্ধে মনে মনে সে যে জল্পনা করছে, যদি তা কোন রকমে বিবিজী জানতে পারে! কাজ নেই বিবিজীর কথা ভেবে! সে ইচ্ছে করে অন্য জিনিস ভাবতে চেষ্টা করে। ছোটবাবুর ঘরে সে রেশমের কি সুন্দর সব পোষাক দেখেছে··· একমাত্র সেই সাহেবকেই সে-রকম সুন্দর পোষাক পরতে রাস্তায় সে দেখেছে···

কাজ সেরে উঠতেই দেখে সামনে ছোটবাবু···

—এই যে, মহামহিমান্বিত মুন্নু বাবু···আপনার কলতলার কাজ সারা হয়েছে বোধ হয়···এবার তা হলে আমি নামতে পারি···

—নিশ্চয়ই বাবুজী! আমাকে আপনি···

মুন্নু কথা শেষ ক'রতে পারে না। বিবিজী এসে পড়েন,

—বলি হলো ? যাও ওগুলো রেখে দিয়ে এসো···উধাও হয়ো না যেন···তরকারি কুটতে হবে···আর ফের বলছি শুনে রাখো, না ডাকলে যদি অন্য ঘরে ঢুকবে···তা হলে···বকতে বকতে বিবিজী অন্তর্ধান হন।

মাথায় জল ঢালতে ঢালতে ছোটবাবু বলে ওঠেন, এই রে, বন্যা সুরু হয়েছে আবার···বেটা, সাবধান, ডুবে মরবি···

বহু কষ্টে মুন্নু হাসি থামিয়ে রাখে।

এমন সময় বাইরে থেকে কে ডেকে ওঠে, শীলা ! ও শীলা !

মুন্নু দেখে, একটি ছোট্ট মেয়ে।

মুন্নুকে দেখে মেয়েটী যেন চমকে ওঠে। বিবিজী বলেন, কৌশল্যা, ওকে দেখে ভয় পেলি নাকি ? ভয় নেই, ভয় নেই, ও কিছু করবে না··· শীলার হয়ে গিয়েছে···ওকে সাবধানে নিয়ে যাবি কেমন !

কৌশল্যা বলে, আমি শুনেছি, ও নাকি খুব ভাল বাঁদর নাচতে পারে !

বিবিজী পরিচয়টা আরো গাঢ় করিয়ে দেবার জন্যে বলেন, অনেক কিছুই পারে আজ সকালে কি করেছে জানিস্ না বুঝি ?

সবিস্তারে সকালের প্রাতকৃত্য-পর্বের বর্ণনা করেন।

লজ্জায়, দুঃখে, মুন্নুর মনে হয় যেন সে মাটীর সঙ্গে মিশে যায়। সব লোককে বিবিজী যদি এই রকম ক'রে সেই কথা শুনিয়ে বেড়ায়, তাহলে সে মুখ দেখাবে কি ক'রে ? সে বুঝতে পারে এতক্ষণ পরে, চাকর হওয়া মানে কি, অষ্টপ্রহর তাকে মুখ বুঁজে এটা-ওটা-সেটা করতে হবে, নিত্য শুনতে হবে গালগাল এবং যদিও এখনো তার ভাগ্যে ঘটে নি, তবুও সে বুঝতে পারে, প্রহারও খেতে হবে সময় অ-সময়। সমস্ত মনটা তার ম্লান হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ কেন জানি মনে হয়, সে একলা, বড় একলা।

এমন সময় দেখে, সাহেবী-পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে ছোটবাবু হাজির।

হেসে মুন্নুকে জিজ্ঞাসা করেন, বলি ওহে ল্যাজহীন বাঁদর, বিবিজী কোথায় রে ?

বাইরের দরজা থেকে ভেতরে আসতে আসতে বিবিজী স্বয়ং জবাব দেন, কেন, কি দরকার?

—দরকার এমন বিশেষ কিছু নয়…খোদ আংরেজ সরকারের ইম্‌পিরীয়্যাল ব্যাঙ্ক হইতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতি মাসে যে একশত পঞ্চাশটি গোল গোল রূপার চাকতি লইয়া আসেন, তাহা হইতে পাঁচটি চাকতি এখন আমার চাই। একটা রুগীকে দেখতে যাচ্ছি সুতরাং পকেটে পাঁচটা টাকা থাকা দরকার। এক হাত দিয়ে রুগী দেখবো আর এক হাত দিয়ে পকেটে টাকাগুলো বাজাবো। লোকে জানবে ডাক্তারের পকেট টাকায় ভর্তি… দেখবে তখন লোকে আমার কাছেই রোগ দেখাতে ছুটবে…টাকায় টাকা আনে, বুঝলে?

টাকাটা এনে দেবার জন্যে বিবিজী ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, কিন্তু পেছন ফিরে ফিরে বক্র দৃষ্টি দিয়ে মুন্নুকে দেখতে লাগলেন, সে-বক্র দৃষ্টির অর্থ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাক…কোন্ বাক্‌সো থেকে টাকা বের করছি, তা' যেন উঁকি মেরে দেখতে এসো না!

কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখেন, মুন্নু উঁকি মারছে।

বাক্‌সোটা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বাইরে এসেই তিনি ঝংকার দিয়ে উঠলেন, এই চোর উঁকি মারছিস যে? কাজ করগে যা।

মুন্নুর মনে নিদারুণ রাগ হয়, এ কি ব্যাপার! অকারণে তাকে চোর বল্লো কেন মাগী? আপনার মনে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে সে কুটনো কুটতে বসে।

কিছুক্ষণ পরেই বিবিজী এসে হুকুম করেন, যা, এইবারে ঘরগুলো ঝাঁট দে, বিছানাগুলো পরিষ্কার ক'রে রাখ।

ঘরে ঢুকতে পারবে এই আনন্দে মুন্নু যেন ছুটে চলে আসে। রূপকথার রাজ্যের মতন ঘরের সব জিনিস-পত্র তার অদ্ভুত লাগে। ঝাঁট দিতে দিতে সে ঘেমে যায়, অবাক হয়ে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস যেন দৃষ্টি দিয়ে গিলে খেতে চায়। সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, বড় বড় ফটোগ্রাফগুলো। এ-দিক ও-দিক চেয়ে সে ফটোগ্রাফগুলোর কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে।

দেখে যেন তার আর তৃপ্তি হয় না। প্রত্যেকটী জিনিসের রঙ আর রেখা তার মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। ঐ বইগুলোর ভেতর কি লেখা আছে? ঘড়ির কাঁটাটা ও-রকম ক'রে চলছে কি ক'রে? গ্রামোফন মেশিনের ভেতরে গানগুলো এখন কি করছে? তারা কি ক'রে হঠাৎ শব্দ ক'রে ওঠে?

দুপুর বেলা তার চাচা এলো, বাবুজী আর শীলার খাবার নিয়ে যাবার জন্যে। হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগছে এখানে?

বিবিজী সামনেই দাঁড়িয়ে।

মুখ তুলে মৃদুস্বরে সে উত্তর দেয়, ভাল লাগছে!

নিজের কাজের ভার কমাবার জন্যে দয়ারাম বিবিজীর কাছে অনুরোধ জানায়, মুন্নুকে যদি এখন একটু ছেড়ে দেন.. তাহলে ওকে দেখিয়ে দেই... শীলার খাবারটা রোজ দুপুরে ও নিয়ে যাবে'খন!

বিবিজী সম্মত হন।

রাস্তায় এসে মুন্নু কেঁদে ফেলে! একে একে তার লাঞ্ছনার কথা সব জানায়। এ জীবন অসহ্য। বিশেষ ক'রে বিবিজীর মুখ, এক মুহূর্ত গালা-গালের কামাই নেই।

উত্তরে দয়ারাম বলে, ওরে আমার যাদু রে! মনিব কি বল্লো না বল্লো, চাকর বুঝি তাই মনে রাখে? তুই এখন ওদের চাকর...বড় হয়েছিস, কাজ করতে হবে না? দেশে তো দিব্যি মজায় দিন কাটিয়েছ, এখানে তো ভাল লাগবেই না! তোর মা তো তোর মাথা খেয়েছিলই, চাচীও আদর দিয়ে নাড়ু গোপালটী করেছে!

মুন্নু বহু কষ্টে মুখ বুজে সহ্য করে। ঘরের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে তার মধ্যে তখন জেগে উঠেছে গাঁয়ের সেই বুনো ছেলে, একবার ইচ্ছা হলো, কথায় উত্তর না দিয়ে, সোজা এক ঘুষি দিয়ে সে জবাব দেয়।

বাড়ী ফিরে এলে, বিবিজী তার হাতে দু'খানা চাপাটী আর একটু শাক দিলেন। হাতে করেই খেতে হবে, পাত্রে খাবার মতন লোক নাকি তারা নয়,

বিবিজী জানিয়ে দেন। অপমানে তার মনে হতে লাগলো গলা দিয়ে যেন খাবার নামছে না।

কিন্তু সে বুঝেছে, এ নিয়ে মন খারাপ ক'রে কোন লাভ নেই।

ছুপুরের কাজ সেরে বিকেলের দিকে সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ গোলমালে সে উঠে পড়ে দেখে, সকাল বেলার সেই কৌশল্যা মেয়েটী, আর ছু'টী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শীলার সঙ্গে খেলতে এসেছে। বাইরের ঘরে তারা নাচতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

তাদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করবার জন্যে মুন্নু চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু না ডাকলে কি ক'রে খেলা যায়? তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সে বাইরের ঘরের দরজার সামনে বাঁদর-নাচ নাচতে স্থরু করে দিল। কিছুক্ষণ পরেই মুন্নু দেখে কখন সে অতর্কিতে তাদের সঙ্গে খেলায় মিশে গিয়েছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন মুন্নুকে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়, বারে, তুমি তো চাকর, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে খেলবে?

এমন সময় ছোটবাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে আরো ছু'তিনটী বাবু। ঘরে ঢুকেই ছোটবাবু চায়ের হুকুম করলেন। বিবিজীর কাছে সে-সংবাদ চলে গেল।

ছোটবাবুর আগমনে মুন্নুর ভেঙ্গে-পড়া মন আবার জেগে উঠলো। ছোটবাবু বাইরে থেকে বড় বড় রসগোল্লা, গোলাপ জাম, আরো কত কি বিলিতী খাবার নিয়ে এসেছিলেন। মুন্নুর জিভে জল এসে গেল। ছোটবাবুর খাওয়া হয়ে গেলে, সেই প্লেটে যা পড়েছিল, ছোটবাবু মুন্নুকে খেতে দিলেন। মুন্নু নীরবে ছোটবাবুকে তার অন্তর সমর্পণ ক'রে দিল। ছোটবাবুর মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে মুন্নু খরগোসের মত ছুটে তা পালন করে। মনে পড়ে, গাঁয়ে তার দলের ছোট ছেলেরা তার জন্যে এমনি করেই হুকুম তামিল করতো।

হায়, ছোটবাবু বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থরু হলো, বিবিজীর আদেশ ও আক্রমণ। যা কিছু করতে যায়, তাতেই বিবিজী একটা না একটা খুঁত বার করেন। আর অমনি দমকা হাওয়ার মত স্থরু

হয় গালাগাল। সব কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা এক কোণে একটু বিশ্রামের জন্যে, সবেতেই ক্লান্তিতে দু'টো চোখ বুঁজে এলো। অমনি মাথার ওপর, এবার আর দমকা হাওয়া নয়, রীতিমত ঝড় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু নিদ্রাদেবী তখন তাকে যে অতল গভীর গহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে বাইরের কোন ঝড়েরই আওয়াজ পৌঁছল না।

।

বাবু নাথুমলের বাড়ীতে মুন্নুর জীবন কলে-বাঁধা চাকার মত একঘেয়ে চলতে থাকে···একঘেয়ে ক্রীতদাসের জীবন···

তাকে স্বীকার ক'রে নিতে মুন্নুকে নিজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়। বুনো পাখী কি সহজে খাঁচায় থাকতে চায় ?

একদিন ভোর বেলায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কে, বলতো মুন্নু ?

মনে মনে জবাব দেয়, তুমি মুন্নু···বাবু নাথুমলের বাড়ীর চাকর ! ফের প্রশ্ন করে, কেন আমি এখানে, এই বাড়ীতে ?

উত্তর আসে, কেন জানো না ? তোমার চাচা তোমার দু'বেলার দু'মুঠোর জন্যে তোমাকে এখানে এনেছে।

—কিন্তু এখানে না এনে তো, অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতো, অন্য কোন কাজে···তার মত কোন আফিসে চাপরাসী ক'রে ?

তার আর উত্তর সে খুঁজে পায় না !

সে যে কি, এবং তার যে কি উত্তর হতে পারে, তা সে সহজেই গ্রহণ করেছিল। বাবু নাথুমলের চাকর হওয়া ছাড়া, সে কি আর কিছু হতে পারে না ? সে প্রশ্ন করবার মত শক্তি তার মনে ছিল না। কেন সে চাকর ? আর কেনই বা বাবু নাথুমল তার মনিব ? এ জিজ্ঞাসা আসে না তার মনে। সে যা হয়েছে, সে তাই, এটা সে স্বতসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মতনই মেনে নিয়েছিল। তার সঙ্গে বাবু নাথুমলের যা সম্পর্ক, বাবু নাথুমল পায়ে যার চক্‌চকে কালো

বুট, আর সে, চলতে গেলে যার খালি পায়ে লাগে পথের ধুলো, তাদের হু'জনের সম্পর্কে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মত, স্থির সুনির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয়···

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে ছোটবাবুর কথা···রোজ বিকেলে বাড়ী ফেরবার সময় রসগোল্লা, আর গোলাম জাম আরও কত কি বিলিতী খাবার নিয়ে আসেন···বিবিজীর আড়ালে একটু আধটু ছোটবাবু তাকে নিয়মিত দেন···তবে রসগোল্লা আর গোলাপ জামের চেয়ে বিলিতী খাবারগুলো ঢের ভাল · কিন্তু বাবু বা সাহেব না হ'লে তো সে-সব খাওয়া যায় না! সে-সব খেতে হলে, ছোটবাবুর মত সিল্কের পোষাক পরতে হবে, মাথায় শোলার চুবড়ী রাখতে হবে···আর পায়ে দিতে হবে বুট! মনে পড়ে ছোটবাবুর বাক্‌সো···সে দেখেছে তার ভেতরে সুন্দর সুন্দর কত যে পোষাক আছে, কত রঙ-বেরঙের রুমাল···তুলোর মত নরম গরম সব জামা···কি অদ্ভুত সব দেখতে! অদ্ভুত সুন্দর! যখন সে বড় হবে, সেই ধরণের পোষাক পরবার মত তার বয়স হবে, ছোটবাবুর কাছে সে নিজে চেয়ে নেবে ঐ রকম একটা শার্ট আর কোট···ছোটবাবু নিশ্চয় না করবেন না·· দয়ার শরীর তাঁর···এই তো সেদিন তাকে একটা ব্লেড দিয়ে দিয়েছেন একেবারে···

ছোটবাবু তার মনকে দখল ক'রে বসেছেন···শুধু কি দয়ার শরীর? কি রকম বুদ্ধি! একটা রবারের নল দিয়ে তিনি সব বলে দিতে পারেন, কার শরীরের ভেতর কি অসুখ হয়েছে···বুকের কাছে কান পেতে তিনি শরীরের ভেতরের সব শুনতে পান! সে নিজের চোখে দেখেছে ছোটবাবুর সেই সব কীর্তি··· তা ছাড়া ছোটবাবুর একটা ভেলভেটের বাক্‌সো আছে···তার ভেতর কতরকম যন্ত্রপাতি·· উঃ···মুন্নু যদি পারতো সেই সব যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে··· ছোটবাবুর মতন ডাক্তার হতে! অন্তত যদি সে বড়বাবুর মতনও হতো··· তাতেও তার আপত্তি নেই···রাস্তায় বেরুলে কত লোক বড়বাবুকে যেচে নমস্কার জানায়। কিন্তু···

সে যে-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে, যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে জাতিভেদ আর শ্রেণী-ভেদের ওপর, সেখানে হাত-গোনা-যায় একদল মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান

লোক, যারা পৃথিবীর যা কিছু রূপ, রস, গন্ধ ভোগ ক'রে চলেছে। তারাই হলো সে জগতের আদর্শ। এবং সে জগতের একমাত্র নীতি হলো, নিজের জন্যে সব কিছু⋯সেই আবহাওয়ায় তারও মন তাই স্বভাবতই আকাঙ্খা করে, সব কিছু ভোগ করতে⋯

সে স্কুলে তার দেশের লোকদের যে সব গল্প শুনেছে বা পড়েছে, গাঁয়ের যে সব কাহিনী শুনেছে, সব তাতেই আছে সেই এক কথা, শক্তি দাও, সম্পত্তি দাও, অর্থ দাও⋯সকলের ওপর আমি করবো ভোগ⋯

এই ঐশ্বর্যের আকাঙ্খা, ভোগের দুর্নিবার স্পৃহা, প্রত্যেক শিশুর মনে⋯ শিশু কেন, বয়ঃপ্রাপ্তদেরও মনে, আলো জল হাওয়ার মত মিশে যায়⋯চোখের সামনে একটা পুরু পর্দা ফেলে দেয়, যার ফলে তারা দেখতে পায় না, এই সর্বস্ব চাওয়ার আড়ালে আছে সর্বস্ব-ক্ষয়-করা এমন এক মারাত্মক জীবন-নীতি, যার জন্যে জীবন অধিকাংশের কাছে হ'য়ে থাকে অর্থহীন, বর্ণহীন, মূল্যহীন⋯

শহরে এসে মুন্নুর চোখেও তাই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল⋯সেখানকার ঐশ্বর্যের আলোক ছটায়! মনে মনে সে ভাবতো, শহরের লোকেরা তাদের গাঁয়ের লোকদের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু কেন বড়? কিসে তারা বড়। সে প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারতো না। তারা সবাই ভাল ভাল পোষাক পড়ে, ভাল বাড়ীতে থাকে, ভাল ভাল জিনিস ব্যবহার করে⋯তাই থেকেই সে অনুমান ক'রে নেয়, এরা নিশ্চয়ই আলাদা ধরনের আশ্চর্য সব মানুষ। তাদের এই চাকচিক্য, এই নিরুদ্বেগ মসৃণতা, এই আড়ম্বরের আনন্দোচ্ছ্বাস, এর মূলে টাকা-আনা-পাই যে কতখানি রয়েছে, তা সে বুঝতে পারে না।

সব ভেবেচিন্তে একটা কথা সে স্থির সত্য বলে মেনে নেয়, সে যে চাকর, সে যে ছোট, সেইটেই একমাত্র সত্য। অতএব চাকর তাকে হ'য়ে থাকতেই হবে⋯মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যাতে সে ভাল চাকর হতে পারে⋯লোকে বলবে, হাঁ, চাকরের মতন চাকর বটে!

কিন্তু হায়, ভাল হবো বল্লেই কি ভালো হওয়া যায়? আদর্শে পৌঁছতে গেলে, যে-পথ দিয়ে যেতে হয়, তার মোড়ে মোড়ে গর্ত⋯গোপন গহ্বর⋯

অচিরকালের মধ্যেই মুন্নু সেই রকম একটী গর্তে পড়ে গেল···এবং যে-টুকু বিবিজীর মন ভিজেছিল, দেখতে দেখতে তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ঘটানটা স্থরু হলো, যেদিন বিকেলবেলা মিঃ ডবলু. পি. ইংলণ্ড বাবু নাথুমলের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে আহূত হয়ে আসেন।

মিঃ ইংলণ্ড শ্যামনগরের ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রধান ক্যাশিয়ার, বাবু নাথুমল তাঁর অধীনে সাব-এ্যাকাউন্টেন্ট। দীর্ঘকায়, যখন চলেন মনে হয় পা ছু'খানা যেন কাঠের, সর্বদাই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ রেখে মেপে ফেলেন ··· ছোট্ট মুখ···কিন্তু তাতে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই···কুঞ্চনহীন, সমতল··· চশমার মোটা ফ্রেমটা তাই মুখের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে। কিন্তু একটী জিনিস, ঠোঁটের আগায় একটুখানি পাতলা হাসি, সব বৈচিত্রহীনতার উপরেও চোখে পড়ে এবং এই পাতলা হাসিটুকুর ভরসাতেই বাবু নাথুমল তাঁকে তাঁর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকতে সাহসী হয়েছিলেন।

প্রতিদিন সকালবেলা অফিস-ঘরে ঢোকবার আগে বাবু নাথুমল সাহেবকে অভিবাদন জানান এবং তার প্রত্যুত্তরে প্রতিদিন ছোট্ট একটী গুড মর্ণিং-এর সঙ্গে এই পাতলা হাসিটুকু তিনি উপহার স্বরূপ পান। এবং এই হাসিটুকু যে মিঃ ইংলণ্ডের অন্তরের উদার তার বহিপ্র্কাশ সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোন সন্দেহই থাকে না। তবে এ-হাসির আর কোন গভীর সার্থকতা আছে কি না, তা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারেন না, এটা সত্যি হাসি, না মুখোসের হাসি। অবশ্য বাবু নাথুমল এই হাসির তাৎপর্য এত করে বুঝতে চেষ্টাই করতেন না, যদি না তিনি জানতেন যে, মিঃ ইংলণ্ডের স্থপারিশের উপরেই তাঁর পদোন্নতি নির্ভর করছে। এ্যাকাউন্টেন্টের পদের জন্যে তিনি অনেকদিন থেকেই আশা ক'রে আছেন কিন্তু বাবু আফজল-উল-হক্ আজ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল ধরে ঐ পদে এমন অচল ভাবে অধিষ্ঠান ক'রে আছেন যে, সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিজের আসন ক'রে নিতে হলে মিঃ ইংলণ্ডের ঐ পাতলা হাসিটুকুর সদ্-ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়।

মিঃ ইংলণ্ড নতুন অফিসর। এখনও ক্লাবের সাঁহেবদের সঙ্গে খানাপিনার ফলে তিনি ভারতীয় মাত্রকেই ঘৃণা করতে শেখেন নি, এখনও তাঁর ঠোঁটের সেই পাতলা হাসি শুকিয়ে তাচ্ছিল্যে পরিণত হয় নি, কিম্বা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জল হাওয়ার দোষে তা ঠোঁট থেকে দাঁতে এসে লাগে নি। তাই বাবু নাথুমল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপারিশটা এই অবসরে করিয়ে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাই পরস্পর পরস্পরকে ভাল ক'রে জানবার আগেই তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে ফেল্লেন এবং মিঃ ইংলণ্ডও তা গ্রহণ করলেন।

তবে নিমন্ত্রণ করবো বল্লেই নিমন্ত্রণ করার মতন সাহস বাবু নাথুমলের ছিল না। তার জন্যে দিনের পর দিন রীতিমত কসরৎ করতে হয়েছিল তাঁকে। রোজ সকাল বেলা ঠিক ক'রে আসেন, গুড-মর্ণিং বলার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পাড়বেন কিন্তু গুড-মর্ণিং-এর পর আর কিছুই গলা দিয়ে বেরুতে চায় না। কি নিয়ে কথাটা পাড়া যায়? হাতে একটা ফাইল বা একখানা চিঠি থাকলেও হতো, কিন্তু তখন সবেমাত্র আফিসে ঢুকছেন, ফাইল কোথায় পাবেন? আর চিঠিপত্র তখন খোলাই হয় না। তারপরে যখন অবকাশ হয়, তখন হাতে এত ফাইল বা চিঠি থাকে যে অবান্তর কোন কথাই উত্থাপন করা চলে না। তাই বাবু নাথুমল শুধু দূর থেকেই দেখেন মিঃ ইংলণ্ডের ঠোঁটে সেই পাতলা হাসি…সে-হাসির অর্থ যে কি, তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারেন না। তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন যে, এই সব সাহেবদের মতিগতির কোন স্থিরতা নাই…তাই তারা ইচ্ছা করেই মুখ বুঁজে থাকে… তারা শুধু মুখ হাঁ করে, কথা বলে না। নিজেরাও কথা বলবে না, তোমাকেও কথা বলতে দেবে না।

হঠাৎ একদিন বাবু নাথুমলের এক বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার বন্ধু তাঁকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটী সদুপদেশ দিলেন, দেখ, সাহেবদের সঙ্গে যদি কোন কথা পাড়তে চাও, তাহলে আবহাওয়ার ব্যাপার থেকে সুরু করতে পার।

তবুও প্রতিদিন সকাল বেলা ছোট্ট একটুখানি গুড-মর্ণিং ছাড়া আর কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। বন্ধুর উপদেশও বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়।

মিঃ ইংলণ্ড প্রত্যুত্তরে মিষ্টি ক'রে বলেন, গুড-মর্ণিং···আর ভাবেন, লোকটা বয়সে তার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড়···এত মাথা হেঁট করবার তার দরকার কি? আর তাছাড়া মিঃ ইংলণ্ড জানে লোকটা ধনী, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে তার চল্লিশ হাজার টাকার শেয়ার আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টেরও খুব প্রিয় পাত্র। হয়ত ব্যাঙ্কের সাহেব ডিরেক্টররাও তাকে খাতির করে; কিন্তু তবু কেন লোকটা এমন ভাবে থাকে? তার মর্যাদা-অনুযায়ী চলে না কেন? মনে পড়ে বড় সাহেব হর্ণের কথা···হর্ণ ঠিকই বলে, ভারতবর্ষের লোকেরা মাথা নীচু ক'রে, হাত জোড় ক'রে থাকতেই ভালবাসে।

একদিন সাহসে ভর ক'রে নাথুমল সাহেবের পিছু পিছু হাত কচলাতে কচলাতে চল্লো···সাহেব মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে···

হঠাৎ পেছন থেকেই নাথুমল বলে উঠেন, আজকের দিনটা চমৎকার স্যার! চমৎকার দিন!

মিঃ ইংলণ্ড পা ঘসে ঘুরে দাঁড়ালো, মনে হলো যেন তার পিঠের ওপর বাজ ভেঙ্গে পড়লো। অব্যক্ত চাঞ্চল্যে তার মুখ পাংশু হয়ে এলো, কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলে,

—সত্যি,—চমৎকার দিন! চমৎকার!

নাথুমল বুঝতে পারেন না, কণ্ঠস্বরের মধ্যে ওতপ্রোত তীব্র ব্যঙ্গ। এতদিনের চেষ্টায় তিনি যে মৌনতা ভাঙ্গতে পেরেছেন, এই খুশীতেই তিনি পারেন তো নিজের পিঠ চাপড়ান। চায়ের নিমন্ত্রণের কথা আর বলা হয় না।

ঘরে বসে নাথুমল কাজ করেন, আর ভাবেন, কখন কথাটা বলা যায়। মিঃ ইংলণ্ড কতকটা আন্দাজ ক'রে, সেদিন ঠিক করলো, ব্যাপারটা কি, জানতে হবে। নিজেই নাথমলের টেবিলের সামনে এসে হেসে বলে, কি নাথুমল? কেমন আছ?

হঠাৎ লেজার থেকে মুখ তুলে, কানের পাশে কলমটা গুঁজে নাথুমল বলে ওঠেন, চমৎকার দিন স্যার!

হেসে ইংলণ্ড উত্তর দেয়, কিন্তু আমার পক্ষে একটু কম চমৎকার হলে ভাল হতো!

কি উত্তর দেবেন ঠিক করতে না পেরে নাথুমল বলেন, হাঁ স্যার! ঠিক তাই স্যার!

তারপর আবার চুপচাপ। মিঃ ইংলণ্ড নাথুমলের দিকে চেয়ে, নাথুমল ইংলণ্ডের মুখের দিকে চেয়ে।

ইংলণ্ডই আগে কথা বলে, আমি লান্‌চ খেতে যাচ্ছি এখন…উঃ, এ গরমে কি কিছু খাওয়া যায়?

নাথুমল, এই অবকাশ!

নাথুমলের মুখে যেন কথা এ-ওর ঘাড়ে পড়ে যায়,—

—সত্যি স্যার…আপনার উচিত স্যার, দেশী খানা খাওয়া খেতে চমৎকার স্যার!

ইংলণ্ড উত্তরে জানায়, ক্লাবের খানসামা মাঝে মাঝে তোমাদের মত ঝোল তৈরী করে বটে কিন্তু বড় ঝাল্…

—আমার স্ত্রী স্যার, চমৎকার ঝোল রাঁধে…কত রকমের রান্না স্যার… একদিন আপনাকে আসতেই হবে…

—না, ঝোল আমার ভাল লাগে না…তবুও তোমার আহ্বানের জন্য ধন্যবাদ!

হঠাৎ ইংলণ্ডের মনে পড়ে যায়, যেন বড্ড বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলা হচ্ছে…ক্লাবে তারা বারবার ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, নেটিভদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। যাবার জন্যে ইংলণ্ড ঘুরে দাঁড়ায়।

নাথুমল কম্পিত হৃদয়ে বলে ফেলে, তা হোক্ স্যার! একদিন আমাদের বাড়ী আপনাকে আসতেই হবে স্যার! আপনি যদি পায়ের ধূলো দেন, আমার স্ত্রী ধন্য হয়ে যাবে স্যার! অন্তত চা খাবার জন্যে আসতে হবে স্যার! আমার ভাই স্যার ··

ইংলণ্ড ঘাড় নেড়ে জানায়, না···

—সে হবে না স্যার·· আমি শুনবো না···আজই যেতে হবে স্যার !

—না···আজ নয়···অন্য আর একদিন দেখা যাবে···

তারপর থেকে নাথুমল, সকালে, দুপুরে, বিকেলে যখনি ইংলণ্ডের সঙ্গে দেখা হয়, তখুনি সেই চায়ের কথা পাড়ে···একবার পায়ের ধূলো স্যার···

অবশেষে একদিন ইংলণ্ডকে রাজী হতেই হয়···এক সপ্তাহ পড়ে···

এক সপ্তাহ ধরে বাবু নাথুমলের বাড়ীতে সেই চা পার্টির আয়োজন চলতে লাগলো। সবাই উদগ্রীব চঞ্চল। সে উৎসাহের ছোঁয়া মুন্নুকেও লাগে। মেঝের কার্পেট তুলে, ধূলো ঝেড়ে, তাকে উলটিয়ে পাতা হলো। ঘরের এক কোণে শিশি, বোতল, বই, ছবি, ঘড়া, ঘটী সব একত্র ক'রে তার ওপরে আচ্ছাদনস্বরূপ একটা সাদা চাদর ঢেকে দেওয়া হলো···দেশী ঘরের এলোমেলো ভাবকে যতখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ভদ্র ক'রে তোলা যায়।

বাবু নাথুমলের বাড়ীতে যে একজন সাহেব আসছেন, সে-সংবাদ পাড়ায় আশে-পাশের বাড়ীতে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ো-বাড়ীর ভাঙ্গা জানলার মুক্তপথ দিয়ে সাহেবের দৃষ্টি যাতে জেনানা-মহলের আব্রু নষ্ট না করে, তার জন্যে প্রত্যেকে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা চট ইত্যাদি হাতের কাছে যে যা পেলো তাই দিয়ে ছিদ্র-পথগুলো আগে থাকতেই বন্ধ ক'রে দিতে লাগলো।

যথাদিনে মিঃ ইংলণ্ড, এক পাশে বাবু নাথুমল, আর এক পাশে তাঁর ডাক্তার ভ্রাতা প্রেমচাঁদ, পেছনে লাল-তকমা-আঁটা দয়ারাম চাপরাসী··· রাজসমারোহে পাড়ায় এসে প্রবেশ করলেন। মিঃ ইংলণ্ড কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন, বৈকালীন পার্টির মর্যাদা অনুযায়ী গরম নেভী ব্লুসুট প'রে এসে কি বোকামীই না তিনি করেছেন! গরমে তাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

পথে আসতে আসতে বাবু নাথুমলের মুখে অনর্গল চাটুবাদ আর শূন্য স্তোক বাক্য শুনতে শুনতে মিঃ ইংলণ্ড আরো যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করে, বাবু নাথুমলের বাড়ীটা কি রকমই বা হবে?

হোম্ ছেড়ে আসবার সময়, তার বাবা শহর থেকে দূরে ব্রিক্স্টন অঞ্চলে হেমিল এষ্টেটে যে ছোট্ট বাড়ীটা কিনেছেন, হয়ত সেই রকম হবে—কিম্বা হোলিউডের "ভারতীয় সন্ন্যাসীর অভিশাপ" ছায়াছিত্রে, সেই গল্পের 'হিন্দু-নায়ক বাবু আব্দুল করিমের' বাড়ীর যে-ছবি দেখেছিল…বাড়ীর ভেতর হল-ঘরের মধ্যে ফোয়ারা থেকে জল উপচে, পড়ছে; তার চারদিকে নানান্ রঙীন পোষাকে আর ঝলমল সব গয়নায় সুসজ্জিত হয়ে বাবুর ডজন খানেক স্ত্রী নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন—সেই রকম কোন দৃশ্য হবে নাকি ?

পাড়ার মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হয়ে মিঃ ইংলণ্ডের চোখে পড়ে, ভাঙ্গা-চোরা ইঁটের সব গহ্বর ঘেঁষাঘেঁষি কোন রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এইগুলিই কি তবে…? ইংলণ্ডের মনের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতে থাকে…

হঠাৎ চারদিক থেকে চাপা রব উঠলো, সাহেব ! সাহেব !

সঙ্গে সঙ্গে ময়লা চটের আশে পাশে কৌতূহলী সব মুখ দেখা দিয়ে সরে যেতে লাগলো।

বাবু নাথুমল সাহেবের অবগতির জন্যে নিবেদন করেন, মুসলমানেরা স্যার ভয়ানক পর্দা মানে কিনা ! তাই, ওই যে সব দেখছেন, ওরা হলো বাবু আজমল-উল্-হকের বাড়ীর মেয়েরা, আপনাকে দেখে লুকিয়ে পড়ছে স্যার !

মনে মনে নাথুমল খুব খুসী হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একটা খোঁচা যে বসাতে পেরেছে, সেটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলতে হবে বৈ কি !

মিঃ ইংলণ্ড কোন কথা না বলে অতি কষ্টে একটু হেসে পাশ ফিরে চান।

হঠাৎ প্রেমচাঁদ চীৎকার ক'রে ওঠে, আপনার মাথা স্যার ! আপনার মাথা…একটু সাবধান…

বাবু নাথমলের বাড়ীর দরজা পেরিয়ে মিঃ ইংলণ্ড মাথা তুলে ভেতরের ঘরে যেমন ঢুকতে যাচ্ছিলেন, অমনি প্রেমচাঁদ সাহেবের উন্নত-শিরের দুর্দশা আশঙ্কা ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে। ছোট দরজা, মাথা হেঁট না ক'রে ঢুকলে, মাথায় আঘাত লাগবে। সাহেবের গোলাপী মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠলো।

ঘরের ভেতর ঢুকে সাহেব দেখে, ঘরের ছাদটা যেন মাটীর দিকে ঝুঁকে আসছে…সেই ছোট্ট দশ ফিট দীর্ঘ আর ছ' ফিট প্রস্থের গহ্বরের মধ্যে এতগুলি লোক কোথায় বসবে বা নড়বে চড়বে, তা' ভেবে ঠিক করতে পারে না। দয়ারাম তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার টেনে এনে সাহেবের সামনে ধরে।

ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে, আশে-পাশের জিনিসগুলির দিকে চেয়ে, ইংলণ্ডের মনে হচ্ছিল, সব যেন কেমন ছোট-ছোট, খর্বাকৃতি…তার মধ্যে তাকে দেখাচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে যেমন দেখায় নেলসন্ স্তম্ভকে…

অবশ্য চোখ চেয়েও সাহেব যে বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিল, এমন নয়। চেয়ারে বসতেই মনে হলো যেন কাঁটা ফুটছে। সামনে দেখে, একটা কুলুঙ্গীর ভেতর, হস্তী-দেবতা গণেশের মাটীর মূর্তি…গলায় ফুলের মালা। ছেলে-বেলায় তার মার সঙ্গে গির্জায় যাবার পথে, তার মা যে-সব পৌত্তলিক দেব-দেবীর মূর্তিকে ঘৃণা করতে তাকে শিখিয়েছিল, এতদিন পরে সেই ধরণের কদাকার মূর্তি এই সে প্রথম চাক্ষুষ দেখলো!

বাবু নাথুমল পায়রার মত গাল ফুলিয়ে ইংরেজীতে সাহেবকে জানান—বিদ্যা, বুদ্ধি আর ঐশ্বর্যের দেবতা স্যার!

নাথুমল জানেন, পর্দার আড়ালে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে শুনছেন…শুনছেন, তাঁর স্বামী ইংরেজীতে ইংরেজের সঙ্গে সমানে কথা বলছেন…গর্বে বাবু নাথুমলের বুক ফুলে ওঠে।

মিঃ ইংলণ্ড কোন রকমে ঠোঁট ফাঁক ক'রে বলেন, বাঃ! চমৎকার!

প্রেমচাঁদ সহজভাবেই সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা সূচনা করে। কারণ, সে জানে, সে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জন করে, সাহেবের অফিসের কেরাণী সে নয়…

—ইচ্ছে আছে, মিঃ ইংলণ্ড, ভাল ক'রে ডাক্তারীটা শেখবার জন্যে আপনাদের দেশে যাব!

'হোমে'র কথা শুনে মিঃ ইংলণ্ড একটু সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন, বলেন, বটে! বেশ!

প্রেমচাঁদ বলে, নিশ্চয়ই সেখানে আপনি যে বাড়ীতে থাকেন, তা খুবই বড়...হাঁ ভাবছি, আপনার কাছ থেকে জেনে নেবো কোন্ কোর্স কি ভাবে নিলে সুবিধে হয়...এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে সাহায্য ক'রতে পারেন?

উত্তরে মিঃ ইংলণ্ড ছোট্ট ক'রে শুধু বলে, নিশ্চয়ই! সঙ্গে সঙ্গে এক গোপন লজ্জায় বিব্রত হয়ে পড়ে। যদিও এখানকার নেটিভদের কাছে সর্বদাই মাথা উঁচু ক'রে থাকতে হয় তবুও সে নিজের মনে জানে 'হোমে' বাড়া বলতে তার নিজস্ব কিছুই নেই ..যে ছোট্ট বাড়ীটা তার বাবা কিস্তিবন্দীতে কিনেছেন, তার সব কিস্তি এখনো শোধ দেওয়া হয় নি...আর তা ছাড়া পড়ার কোর্স সম্বন্ধে সে কি উপদেশই বা দিতে পারে? সে নিজে অন্তত জানে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া সে কোনদিন মাড়ায় নি...তার পড়া-শোনার দৌড় হচ্ছে, পিটম্যানের সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং স্কুলে মাত্র একটা বছর...তার পরই সে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে চাকুরীতে ঢোকে। মাঝে মাঝে তার মনে হতো, এ সম্পর্কে যা সত্য, তাই সে জানিয়ে দেবে, সে যা নয়, তাই সেজে সম্মান নিতে তার স্বাভাবিক সততায় বাধতো। কিন্তু তার ক্লাবের সহযাত্রীরা তাকে বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছে, এখানে মাথা তুলে সর্বদাই থাকতে হবে, তার জন্যে যদি দরকার হয়, নিজেকে স্বয়ং রাজা জর্জের পুত্র বলে পরিচয় দিতে, তাতেও সে যেন কোন দিন কুণ্ঠিত না হয়। তার ফলে, বর্তমান ক্ষেত্রের বাইরের যে কষ্ট তাকে সহ্য করতেই হচ্ছিল, তার সঙ্গে জ্ঞানপাপীর আভ্যন্তরিক গোপন অস্বস্তি মিশে, তাকে যেন আরো বিব্রত ক'রে তুল্লো।

দেয়াল থেকে মস্ত বড় একটা ছবি নামিয়ে সাহেবের সামনে তুলে ধরে বাবু নাথুমল সগর্বে বলেন, আমাদের ফ্যামেলি-ফটো স্যার? আমার বিয়ের সময় তোলা হয়েছিল।

সাহেব চোখ বিস্তারিত ক'রে দেখেন।

মুন্নু এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গেঁয়ো বুদ্ধিতে ছোট-বড় স্তর-ভেদের কোন সূক্ষ্ম ধারণা ছিল না। তাই স্বাভাবিক কৌতূহল-বশতঃ ছবিটি দেখবার জন্যে সাহেবের গা ঘেঁষে সে-ও এগিয়ে আসে।

বাবু নাথুমল চাপা গলায় চীৎকার ক'রে উঠেন, দূর হ এখান থেকে পাজী!

সঙ্গে সঙ্গে কনুই-এর ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেন।

মিঃ ইংলণ্ডের মন বহুচেষ্টার ফলে থিতিয়ে আসছিল। হঠাৎ এই ব্যাপারে আবার তা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। মুন্নু কে তা সে জানে না···মনে মনে ভাবে, হয়ত বা বাবুর ছেলেই হবে! যেই হোক্, তার সামনে এমনিভাবে একটা ছোট ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়া, সাহেবের ভব্যতায় রীতিমত আঘাত ক'রলো। কিন্তু আর একদিক থেকে মনে মনে সন্তুষ্টই হলো, ছেলেটার কাপড়-চোপড় যে রকম নোংরা আর ময়লা, কে জানে কত রোগের জীবাণু তাতে মিশিয়ে আছে! মনে পড়লো বড় সাহেব হর্ণের কথা, এই সব নেটিভ ছেলেদের গা নাকি মারাত্মক সব জীবাণুতে ভর্তি থাকে। হর্ণের কথা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ সে রাস্তার ধারে কুষ্ঠরুগী ভিখারীদের দেখেই বুঝেছে।

পাছে তাঁর ব্যবহারে সাহেব কিছু ভুল বোঝেন, সেইজন্যে বাবু নাথুমল জনান্তিকে তাকে জানিয়ে দেন, ওটা চাকর···

অর্থাৎ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কোন অন্যায় করেন নি।

সাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বাবুকে জানিয়ে দেয়, তা সে বুঝতে পেরেছে।

—ইনি হলেন আমার স্ত্রী, স্যার!

ফটোর মধ্যস্থলে কাপড় আর গয়নায় ঢাকা এক মনুষ্য-মূর্তি! পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে আছে, মুখটা সম্পূর্ণভাবে অবগুণ্ঠনে ঢাকা!

সাহেবের চোখের দোষ ছিল, কাছের জিনিস ভাল ক'রে দেখতে পেতো না। তাই চেষ্টা ক'রে চোখ বার ক'রে সে দেখে, মূর্তিটির মুখের কোন রেখা দেখা যায় কি না। কিন্তু কিছুই যখন দেখতে পেলো না, তখন ঈষৎ হেসে তারিফ ক'রে বলে উঠলো, বাঃ চমৎকার দেখতে!

হঠাৎ নিজের হাতের আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই, সাহেব দেখে, ছবিটা ধরবার সময় ধুলোতে হাত ভরে গিয়েছে···এমন কি প্যাণ্টেও ধুলো লেগে গিয়েছে···সাহেবের ভ্রূ আপনা থেকে কুঁচকে আসে।

হাত কচলাতে কচলাতে বাবু বলে ওঠেন, আমার স্ত্রী স্যার, উনি পর্দা মানেন না...তবে কি জানেন স্যার, বড় লাজুক! আর আমাদের দেশে মেয়েদের পরপুরুষদের সামনে বেরুনো রেওয়াজ নেই কি না!

সেই সঙ্গেই, ছবিটার দিকে আবার আঙুল দেখিয়ে বলেন,

—আর, এই যে দেখছেন এই হলুম আমি···বরের পোষাকে, স্যার!

এমন সময় পাশের ঘর থেকে গ্রামোফোনে রেকর্ড বেজে উঠলো·· সাহেবের মনে হলো কে যেন কাঁদছে, আঁই···আঁ···আঁয়···এঁ···এঁ···

সগর্বে নাথুমল বলে ওঠেন, এই হলো স্যার ইণ্ডিয়ান মিউজিক···গজল··· এলাহাবাদের জানকী বাঈ গাইছে···এটা হলো আমার মেয়ে···শীলা···আয়··· সাহেবকে নমস্কার কর···

শীলা তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল · এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্ব হয়ে···পিতার আদেশ প্রতিপালন ক'রবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না!

মিঃ ইংলণ্ডের যেন সব গুলিয়ে উঠছিল। কোন কিছুরই কোন হদিস্ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। ঘামে ভেতর থেকে পোষাক ভিজে উঠছে। পাশের ঘর থেকে সেই তীব্র আঁও···আঁয়···এ···যেন ছুঁচের মত বিঁধছে কানে···সে কান বড়জোর শুনতে অভ্যস্ত, আঁকা-বাঁকা চার্লষ্টন কিম্বা রুম্বার সঙ্গে তরুণ ইংলণ্ডের প্রেম-সঙ্গীত, "হায় সখি, প্রেম আমার, যেন একটা···সিগারেট!"

মিঃ ইংলণ্ড গুম্ হ'য়ে বসে ভাবে, কি ভুলই না ক'রেছি নিমন্ত্রণ নিয়ে··· এখন পর্ব শেষ হলেই বাঁচে!

—যা, চা নিয়ে আয়!

বাবু নাথুমল মুন্নুকে আদেশ করেন।

মুন্নু আনন্দে ও উত্তেজনায় ছুটে যায়। দয়ারাম তখন খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকছিল···আর একটু হলেই মুন্নু তার ঘাড়ে গিয়ে পড়তো···আর তখন?

বিবিজীর নজরে যে তা পড়েনি তা নয়, তবে আজ তাঁকে চুপ করে থাকতেই হবে, নইলে সাহেব কি মনে করবে! তাই উচ্চারিত ভৎর্সনার বদলে দুই

রুক্ষ চক্ষুর নীরব তিরস্কার একবার মুন্নুর সারা দেহে ঢেউ খেলিয়ে বয়ে গেল। কিন্তু মুন্নুর মন আজ আনন্দে ভরপুর, সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলতে পেয়েছে···বিবিজীর ভ্রূকুটী আজ আর তাকে বিকল করতে পারবে না।

একটা টেবিলে নানা জাতীয় দেশী খাদ্য সামগ্রী একে একে এনে রাখা হলো। তা থেকে দু'টো ডিস তুলে বাবু নাথুমল স্বয়ং সাহেবের সামনে ধরলেন,

—স্যার, এটা হলো আমাদের সেরা মিষ্টি, নাম গুলাব জামান···আর এটার নাম হলো রসগোল্লা. তাজা ছানা দিয়ে তৈরী স্যার!···শুঁকে দেখুন, গোলাপের আতর দেওয়া···আপনার জন্যে আলাদা ক'রে অর্ডার দিয়ে তৈরী করা স্যার!

মিঃ ইংলণ্ডের তখন গোলাব জামান আর রসগোল্লার গন্ধে এবং তাদের সেই রস-চট্‌-চটে মূর্তিতে গা বমি-বমি ক'রে উঠছিল। আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, না, না, ও সব খাবো না!

বাবু নাথুমল নাছোড়বান্দা,—সে কি হয় স্যার! একটু অন্তত মুখে দিতেই হবে!

যদি ডিসের সঙ্গে একটা কাঁটা কিম্বা চামচে দেওয়া হতো, তাহলে হয়ত মিঃ ইংলণ্ড কোনরকমে একটা তুলে নিতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার দেখে সে বুঝলো যে, সেই চট্‌চটে বস্তুটা আঙুল দিয়ে তুলতে হবে। একজন ইংরেজের পক্ষে তা' এক রকম অসম্ভব ব্যাপার···ভুলেও সে আঙুল দিয়ে একটা মুরগীর ছানার ঠ্যাং তুলে মুখে দেয় না।

অগত্যা নাথুমল বলেন. তাহলে এই পকোড়াগুলো অন্তত স্যার খেতে হবে! আমার স্ত্রী নিজে তৈরী করেছেন···দয়ারাম···নিয়ে আয়···

দয়ারাম যখন সাহেবের সামনে সেই তৈলসিক্ত অপূর্ব পদার্থটা ধরে দিল, তার কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি দেখে এবং তৈলাক্ত সুগন্ধ পেয়ে সাহেবের দেহের অভ্যন্তরে লিভার নামক পদার্থটা যেন উল্টে গেল। বিষের পাত্রের দিকে মানুষ যেমন সভয়ে চেয়ে থাকে, তেমনি আর্তদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে মিঃ ইংলণ্ড বলে উঠলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ! আজ বড় অবেলায় লান্চ খেয়েছি···

—বেশ, আমাদের দেশী খাবার যদি না খান, ষ্টিফিল্‌স্ হোটেল থেকে আপনার জন্যে অর্ডার দিয়ে বিলিতী প্যাসট্রী নিয়ে এসেছি, তাই খান্…

সাহেব পদার্থটীর দিকে সজোরে চেয়ে দেখে বুঝলো, তার সর্বাঙ্গ এমনভাবে চিনি দিয়ে আবৃত যে, তার ভেতরে যে মূল পদার্থটী কি আছে, তা' ঘোরতর গবেষণার বিষয়!

—ধন্যবাদ! গরমের দিনে আমার এত শিগ্‌গির ক্ষিদে হয় না!

নাথুমল হতাশ হয়ে পড়েন। সাহেব যদি নাই খায়…তাহলে কিসের ভরসায় সে সুপারিশ চাইবে?

সাহেবের একেবারে নাকের কাছে ডিসটা ধরে বাবু নাথুমল কাতরকণ্ঠে আবেদন করেন, দয়া ক'রে একটুখানি অন্তত মুখে দিন স্যার!

প্রায় পরাজিত হয়ে উঠে মিঃ ইংলণ্ড বলেন, ও সব থাক্, তাহলে আমাকে এক কাপ চা দাও ..আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে…তুমি তো জানো. আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে!

বাবু নাথুমলের অধর-ওষ্ঠ আবেগে কেঁপে উঠলো…দাঁত দিয়ে চেপে তিনি কোন রকমে বলেন, স্যার বড় আশা করেছিলাম, দরিদ্র মতে আপনার সেবার জন্যে যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তা গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করবেন কিন্তু তার বদলে শুধু এক কাপ চা…শুধু চা…ওঃ ..চা নিয়ে আয় মুন্নু।

মুন্নু এতক্ষণ ধরে এই আদেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তার সর্বদেহ উৎসাহে কাঁপছিল। প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্রই সে চায়ের ট্রে তুলে ধাবমান হলো। উৎসাহে পায়ের আঙুল মুচকে তার হাতের ট্রে সশব্দে নীচে পড়ে গেল…চীনে মাটীর বাসন ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল…

বাবু নাথুমলের বুকের ভেতর হৃদ্-যন্ত্র যেন হঠাৎ থেমে গেল। বহু-কষ্টে অর্জিত অর্থের নগদ পাঁচ টাকা তিনি এই চা-পার্টির জন্য খরচ করেছেন… তার শেস পরিনতি কিনা, মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল!

ডাক্তার প্রেমচাঁদ তাৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বহু কষ্টে বিবিজীর বাক্-সংযম উৎপাদন ক'রে তাড়াতাড়ি আর এক কাপ চা তৈরী ক'রে নিয়ে হাসতে হাসতে সাহেবের সামনে ধরলো।

—আমাদের এই যে চাকরটী দেখছেন, মিঃ ইংলণ্ড, ও জানে একটা জাপানী চা-সেটের দাম মাত্র এক টাকা বারো আনা…তাই ও বেপরোয়া হয়ে কাপ ডিস ভাঙ্গে।

মিঃ ইংলণ্ড তখন গরমে ঘেমে নেয়ে উঠছিল। তার ওপর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। কোন রকমে চায়ের কাপটী তুলে চুমুক দিতেই গরমে জিভ পুড়ে গেল।

চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে সাহেব উঠে পড়লো, এইবার আমি যাবো!

বাবু নাথমল হাত জোড় ক'রে বলেন, বড় নিরাশ হলুম স্যার! তবে আমার স্ত্রী আর আমার অনুরোধ, আপনি আবার আসবেন একদিন শিগ্গির।

মিঃ ইংলণ্ড তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের দরজা দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন!

চা-পার্টি, ভাঙ্গা কাপের মতন, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল।

সাহেবকে বিদায় ক'রে এসেই ডাক্তার মিষ্টান্নগুলির দিকে নজর দিল— বিবিজী তখন বিপুল বিক্রমে মুন্নুকে নিয়ে পড়েছেন,—

—বলি ও কানা…চোখ-খেগো…বলি এত লোক মরে, তোর মরণ হয় না? কি করেছিস্ তার খেয়াল আছে? নরকে পচে মরবি তা জানিস্! বলি তোর একমাসের মাইনে দিলেও ঐ সব কাপ ডিসের দাম হয় না, জানিস্?

সে দিকে কর্ণপাত না ক'রে ডাক্তার বলে উঠলো, সাহেবটা চাষা… খেতে জানে না…এমন সুন্দর জিনিস, একটাও মুখে দিল না!

বিবিজী তার উত্তর দিলেন, সে দোষ সাহেবের নয়…ঐ হারামজাদার দোষেই তো সব মাটী হয়ে গেল !'

—সে কি কথা ভাবী ! ঐ বাঁদর-মুখো সাহেবটা খেতে জানে না, মুন্নুর কি দোষ বল ? আর তোমার ঘরে এই যে পাহাড়-পর্বত জমা হ'য়ে রয়েছে, যা দেখেই সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, তাও কি মুন্নুর অপরাধ ?

বিবিজী গর্জন ক'রে ওঠেন, তুমি অমন ক'রে ঐ মড়াটাকে আস্কারা দিও না ঠাকুর পো ! ঐ চাষাটা আসবার আগে আমাদের ঘর-দোর তো ঠিক সাহেবদের মতই ছিল ঐ তো এসে সব নোংরা করলো…অমন কাপ-ডিস্‌গুলো সব ভেঙ্গে ফেলো গো !

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিবিজী সজোরে মুন্নুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন। মুন্নু যেমন মুক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বিবিজীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে ক'রে প্রেমচাঁদ মুন্নুর কাছে এগিয়ে যায়।

—আর কত বকবে ভাবী ? ও-র কোন দোষ নেই ! ওরে, তুই একবার যা তো…

কাজের অছিলায় মুন্নুকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

সেই দিনের পর থেকে মুন্নুর আর কাজে মন বসে না…কেমন যেন আচ্ছন্নের মত সে ঘোরা-ফেরা করে…সর্বদাই ভাবে কি ক'রে এ-কাজ থেকে মুক্তি পাবে সে। মন তার পড়ে থাকে, কখন ছুটি পাবে…

বিবিজী জানতেন ছুটি পেলেই মুন্নু তার চাচার ওখানে যায়। তাই যাতে সে ছুটি না পায়, তার জন্যে ইদানীং তিনি সর্বদাই একটা না একটা কাজে তাকে আটকে রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ভয়, হয়ত দয়ারামের কাছে গিয়ে যা তা ক'রে সব লাগাবে !

কিন্তু এক-আধ-বেলা ছুটি পেলেই যে মুন্নু দয়ারামের ওখানে চলে যেতো, তার পেছনে শুধু যে এই নিত্য গালাগাল আর নিষ্ঠুর নিপীড়ন থেকে ক্ষণিক অব্যাহতি পাবার আশাই একমাত্র প্রেরণা স্বরূপ থাকতো তা' নয়, বিবিজীর

স্নেহের শাক-চচ্চড়ী খেতে খেতে তার অরুচি ধরে গিয়েছিল, তাই ঠিক সময় মত গিয়ে পড়তে পারলে চাচার প্রসাদ স্বরূপ খানিকটা ডাল-ভাত জুটতো··· খেয়ে দেহটা ঠাণ্ডা হতো।

সেদিন সকাল থেকেই তার মনটা পড়েছিল চাচার সেই ডাল-ভাতের ওপর। তাই দুপুর বেলা যখন বিবিজী ভুক্তাবশিষ্ট কুড়িয়ে নিয়মিত শাক চচ্চড়ী দিয়ে মুন্নুকে খেতে ডাকলেন, মুন্নু স্পষ্ট ঘোষণা করলো সে খাবে না, সে তার চাচার ওখানে একটু যাবে।

বিবিজীর পায়ে কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিল।

—ওমা·· বলি কোন্ মুখে এমন নির্লজ্জের মত কথা বলতে পারলি রে মুখপোড়া, এখানকার খাবার তোমার মুখে রোচে না···তাই কাজ ফেলে ছুটছো চাচার ঘাড় ভাঙবার জন্যে? আর আমি সারা দুপুর খেটে মরি! বলি এমন চাকর রেখে লাভ কি আমার?

বাবুজী সেদিন বাড়ীতেই ছিলেন। চীৎকার শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

—বলি, যা খেতে দেওয়া হয়, তা বুঝি নবাবের মুখে রোচে না? নবাবের বেটা নবাব আমার! বেরো···বেরো হারামজাদা···যা·· যা-খেলে তোর শো'র-পেট ভরে, যা তাই খাগে যা···যা···

মুন্নু ততক্ষণ দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে।

পাহাড়ী পথ দিয়ে নীচে নামতে নামতে, তার মনে পড়ে একে একে কত না লাঞ্ছনা তাকে এখানে এসে ভোগ করতে হচ্ছে প্রতিদিন···প্রতিমুহূর্ত, অকারণ নিষ্ঠুর নির্যাতন···

বহু কষ্টে সে চোখের জল ধরে রাখে···কিন্তু তার শরীরের মধ্যে ঠিক তার পেটের ভেতর থেকে যেন কি রকম একটা গরম বায়ু ওপর দিকে ঠেলে উঠতে থাকে···চোখের পাতার আড়ালে এসে তা জলে পরিণত হয়ে গড়িয়ে পড়ে!

চাচার ঘরের সামনে এসে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে ঘরে ঢোকে···দেখে, দয়ারাম নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে···

আস্তে আস্তে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সে এগিয়ে যায়···চাচার পায়ের কাছে এসে পায়ের আঙুল নেড়ে চাচাকে ডাকে।

দয়ারাম ধড়মড় ক'রে উঠে বসে, কে ? কে রে ?···ও···তুই ? কি দরকার ?

—কিছু খাবার আছে চাচা ?

সাপের মত ফোঁস ক'রে ওঠে দয়ারাম,

—বলি এখন আমি খাবার পাবো কোথায় ? জন্মের ঠিক নেই বলে কি তোর কিছুরই ঠিক নেই ? কেন, বাবুর বাড়ীতে তোকে খেতে দেয় না ?

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুন্নু সোজা বলে, তাহলে কিছু পয়সা দাও আমাকে, বাজার থেকে কিছু কিনে খাই !

মুন্নু মাসকাবারি যা মাইনে পেতো, তা তার হাতে পড়তো না। দয়ারামের ব্যবস্থা অনুযায়ী নাথুমল দয়ারামের হাতেই দিতেন।

দয়ারাম সোজা হ'য়ে বসে।

—এই বাঁদর-বাচ্চা···রোজ রোজ তোকে যদি এই রকম পয়সাই দেবো, তা হলে কোথেকে তোর জামাকাপড় জুতো হবে !

মুন্নু প্রতিবাদ করে, কই, তুমি তো একখানাও কাপড় আমাকে কিনে দাওনি ! জুতোই বা কোথায় ?

সোজা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, দয়ারাম মুন্নুর ঘাড় চেপে ধরে বলে, এত বড় আস্পর্ধা তোর। আমার কাছে হিসেব চাচ্ছিস্ ? এতদিন ধরে খাইয়ে পরিয়ে চাকরী ক'রে দিয়ে, তার এই পরিণাম ? পয়সা···পয়সা···বলি সব সময় তোর এত পয়সারই বা দরকার কি শুনি ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে পিঠে, পাঁজরে পড়ে ঘুসি।

—তোমার পায়ে পড়ি, চাচা, মেরো না আমাকে ! মেরো না আমাকে ···বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তাই খেতে এসেছি···

—বলি এতক্ষণ ধরে কোথায় গোবর খাচ্ছিলি ? খাবার সময় আসতে পারো নি ? ক্ষিদে পেয়েছে··· কেন বাবুরা খেতে দেয় না তোকে ?

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মুন্নু বলে, আসবো কি ক'রে? বিবিজী কিছুতেই ছুটী দেয় না। রাতদিন আমাকে মারে, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে···কি রকম যে করে যদি জানতে তাহলে তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে না। রোজ সেই শাক-চচ্চড়ী···আমি আর খেতে পারি না।

দয়ারাম গর্জন ক'রে ওঠে, মিথ্যাবাদী, বদমায়েস, শয়তান! রাতদিন অকারণে ভালমানসের নামে লাগানো—

দয়ারাম রাগে অন্ধ হ'য়ে এত জোরে চড় মারে যে মুন্নু তাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ে।

শরীরের অভ্যন্তর থেকে আর্তনাদ জেগে ওঠে, মা·· মাগো!

কিন্তু দয়ারামের স্নেহমায়াহীন চিত্তে তার কোন রেখাই পড়ে না।

—বল্, সত্যি ক'রে বল্, কোথায় টো টো ক'রে বেড়াচ্ছিলি এতক্ষণ?

কথার জবাব দিতে মুন্নুর আর প্রবৃত্তি হয় না। নীরবে দুই চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

নীরবতা আরো উত্তেজিত ক'রে তোলে দয়ারামকে।

—কোথায় ছিলি, বল্? উত্তর দে? চুপ করে রইলি যে শয়তান?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মুন্নু বলে, বাড়ীতে ছিলাম!

বাড়ীতে ছিলাম! ফের মিথ্যে কথা! আঁস্তাকুড়ের কুকুর, কাজ কামাই ক'রে আঁস্তাকুড়ের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, জানি না আমি! ফের যদি বাবুদের নামে লাগাবি তো খুন ক'রে ফেলবো···পাজী, শয়তান, সেদিন কাপ ডিসগুলো ভেঙে সাহেবের সামনে বাবুদের অপদস্থ করলি···উল্টে লাগাতে এসেছো—হারামজাদা—

মুন্নু সাবধান হবার আগেই দয়ারাম লাথি মেরে তাকে ফেলে দেয়।

—তোর জন্যে বাবুদের কাছে আমার পর্যন্ত বদনাম হ'য়ে গেল···

কত কষ্ট ক'রে নাম কিনতে হয় তা' তুই জানবি কি ক'রে? তোর বরাৎ ভাল যে অমন মনিব পেয়েছিস···ভাল চাস তো মন দিয়ে কাজ কর গে যা··· নইলে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবো—চাকর, চাকরের মত থাকবি···চাকরের

আবার বই হাতে ক'রে পড়া কি ? দূর হ···তোর মত ছেলের জন্তে আমার এতটুকুও দুঃখ দরদ নেই···

হাত ধরে দয়ারাম তাকে তুলে দরজার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

[দুই]

মুন্নু ফিরে চলে বাবু নাথুমলের বাড়ীতে, আদর্শ চাকরের শিক্ষানবিশী করবার অনুপ্রেরণা সর্ব অঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে।

পথে যেতে যেতে যেই চাচার মূর্তি মনে পড়ে, অমনি নিরুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় তার মনে তীব্র বিদ্রোহ জেগে ওঠে।

—আঁস্তাকুড়ের কুকুর আমি নই, তুমি। তোমার মত লোককে ঘেন্না করি আমি।

তরঙ্গ-আস্ফালনের মত মনে রুদ্ধ আক্রোশ ফুলে ফেঁপে ওঠে।

—আমি চলে যাব···এখান থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যাব··· দয়ারাম···ঐ পাজী মাগী···সকলের কাছ থেকে একেবারে দূরে চলে যাব··· আমাকে খুঁজবে···ধরবার জন্তে চারদিকে ঢোল পিটিয়ে দেবে কিন্তু কোথায় পাবে আমাকে ? কিন্তু···আমার কাছে তো একটাও পয়সা নেই ? খাব কি ? আর যদি খুঁজে বার করতে পারে ! তাহলে তো মেরেই ফেলবে···

গলির মোড়ে তাঁতিদের ভাঙ্গা বাড়ীর কাটলে চড়ুই পাখীরা কলরব করে ···মুন্নুর মনে হয়, তারাও যেন তাকে গালাগাল দিচ্ছে।

আশে-পাশের তাঁতশালা থেকে মাকুর শব্দ উঠছে···মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে···ছেলেরা লুকোচুরি খেলছে···চেঁচাচ্ছে···কিন্তু মুন্নু তার কিছুই দেখতে পায় না···কিছুই শুনতে পায় না···

তার মনে হচ্ছিল তার জিভের ডগায় যেন কি রকম জালা করছে, কি একটা অস্বস্তি···যেন জ্বর হয়েছে···পেটের ভেতর ক্ষিদেতে আগুন জ্বলছে

…জলুক ! এক রকম অচৈতন্যের মত সে বাড়ী ফিরে আসে। তার সৌভাগ্য বিবিজী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। রান্না ঘরে ঢুকে যা হাতের কাছে পায় তাই খানিকটা মুখে পুরে দেয়। তারপর একজায়গায় চুপটি ক'রে শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার চেষ্টা করে, ঘুমের মধ্যে যদি এসব ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু ঘুম আসে না। মনের মধ্যে পাগলা ঘোড়ার মতন ক্ষ্যাপা ভাবনা টগবগিয়ে উঠতে থাকে…সে ক্ষেপে ওঠে…আমাকে যেমন ভাবে মেরেছ তেমনি ভাবে তোমাকে মারবো… তোমার গা থেকে চামড়া টেনে ছিড়ে ফেলবো…যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন গিয়ে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবো…

ক্রমশঃ ঠাণ্ডা মাটি মস্তিষ্কের উত্তাপকে ধীরে ধীরে অপহরণ ক'রে নেয়… মাটির সঙ্গে মিশে তার চেতনা মাটি হ'য়ে আসে…সে ঘুমিয়ে পড়ে। মড়ার মত তার দেহ পড়ে থাকে, অচেতন, অসার—কিন্তু ভেতরে তখনও আহত চিত্ত জ্বলন্ত কড়ায় ফুটন্ত জলের মত টগবগ ক'রতে থাকে…অদৃশ্য অবচেতনায়।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে, মুন্নু যেন ভুলে যায় সব। তার গেঁয়ো পাহাড়ী মন পূর্ণ সজীবতায় আবার সহজ হ'য়ে ওঠে। সেই সব-তাতে-খুসী, সহজ সবল মন…জীবনের সেই আদিম আগ্রহ…দেহের প্রতি অনু-পরমানুতে পরিব্যাপ্ত সেই কৌতুহল-শিখা…অব্যাহত অনাহত ভাবে আবার তাকে টেনে নিয়ে চলে। আশেপাশের রঙে-রেখায় আবার সাড়া দিয়ে ওঠে তার মন।

দিন যায়।

একদিন বাইরের কলে জল তুলতে গিয়ে দেখে, কল জুড়ে বসে আছে সাব্‌জজ বাবুর বাড়ীর রাঁধুনে-বামুন বর্মা। বর্মা যখন কলে আসে, তখন অন্য বাড়ীর চাকরদের ধরে নিতে হয় যে সেই কল শুধু তার একলার জন্যেই হয়েছে।

সেদিন সকাল থেকে বিবিজী মুন্নুকে একবারও মৃদু সম্ভাষণ করেন নি, তাই তার মেজাজটা ছিল বেশ খুসী। বর্মাকে দেখে তাই 'মৌজ' ক'রে বলে উঠলো, এই যে মহারাজ…কেমন আছেন ?

কিন্তু বর্মা ব্যাপারটা অন্যভাবে গ্রহণ করলো। আর মুখের বেয়াড়া চেহারা দেখে কারও বুঝতে দেরী হয় না, তার মনটা কি রকম, যদিও ব্রাহ্মণোচিত তিলক ফোঁটার অভাব মুখে ছিল না।

মুন্নুর সম্ভাষণের উত্তরে সেই বিকৃত মুখকে আরো বিকৃত ক'রে বর্মা বলে উঠলো, কি রে পাহাড়ী কুত্তা, কি বলছিস? বলি তোর হুজুরাণী আজকাল কি রকম আদর যত্ন করছে? সেই রকম মারছে ধরছে···না, আজকাল বুকে ক'রে দুধ খাওয়াচ্ছে?

এ ধরণের রসিকতায় মুন্নু অভ্যস্ত ছিল না। হঠাৎ লজ্জায় তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো।

—আমার সঙ্গে এ রকম কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? আমি তোমার মনিব বা মনিবানী সম্বন্ধে তো কোন কথা বলি নি।

—বলি অত চটিস কেন? লক্ষণ তো ভাল নয় বাবা! হুজুরাণী তা হ'লে তোকে পটিয়েছে বল্? তাই, যা গালাগাল দেয়, মুখ বুঁজে সব সয়ে থাকিস্··· পেটে খেলে পিঠে সয়···না রে? বলি···কেমন?

কথায় পর্যাপ্ত বোধ না হওয়ায় বর্মা কুৎসিৎ অঙ্গ-ভঙ্গী করে···মুন্নু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে···

—কল ছেড়ে দাও···আমি জল নেবো···কল জুড়ে বসে আছ, কল কি তোমার একার?

ততক্ষণে পাশের আর এক বাড়ীর চাকর, লেহ্নু সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে···

লেহ্নুকে শুনিয়ে বর্মা বলে, পাহাড়ী চাষার রোক দেখ! ওর হুজুরাণীর নাম করছি বলে উনি চটেছেন · বলি ··তোরা করতে পারিস, আর আমরা বলতে পারি না? কি লেহ্নু, বল না! বলি বাবা ভেতরে কিছু নট-ঘট না থাকলে, কেউ অমন চোরের মার সইতে পারে?

মুন্নু সে-কথায় লক্ষ্য না ক'রে জলের কলের দিকে এগিয়ে আসে,—কল ছেড়ে দাও, জল নেবো।

লেহ্নু উস্‌কে দেয়,

—বর্মাজী, ছোঁড়ার বড় তেজ হয়েছে—দাও না একহাত ঠিক ক'রে··· ব্যাটা মুনিবানীর পয়সা থেকে চুরি ক'রে বাজারে গিয়ে ক্ষীর-রাবড়ী খায়··· তাই এত তেজ···

হঠাৎ এই মিথ্যা অভিযোগে মুন্নু অস্থির হয়ে ওঠে, মিথ্যা কথা! মিথ্যেবাদী···ছাড় কল্·· জল নিয়ে আমি চলে যাই!

লেহ্নু পথ আটকিয়ে বলে, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে তুই যাবি কোথায়? বর্মা···লাগাত শালাকে···

মুন্নু রাগে কট মট ক'রে লেহ্নুর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। সেই অবসরে বর্মা পেছন থেকে তাকে ধাক্কা মারতেই সে পড়ে যায়। কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে উঠে মুন্নু এক লাফে বর্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং টিকি শুদ্ধ এক মুঠো চুল ধরে তাকে নিয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ে। কোন রকমে ধস্তাধস্তি ক'রে টিকি উদ্ধার ক'রে বর্মা তার মুখে সজোরে এক ঘুষি লাগায়···লেহ্নু পেছন থেকে লাথির পর লাথি মারতে থাকে।···আহত বাঘের মত আক্রোশে মুন্নু সজোরে বর্মার গলা টিপে ধরে, কিন্তু দুজনের সঙ্গে একা সে কতক্ষণ পারবে? বর্মা সামনে থেকে একটা কাঠের চ্যালা তুলে নিয়ে সজোরে মুন্নুর মাথায় বসিয়ে দেয়·· মাথা ফেটে তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে পরে···গণ্ডগোল দেখে লেহ্নু সরে পড়ে···

সেই অবস্থায় মুন্নু কলেতে গিয়ে কলসী বসিয়ে দিয়ে ছুটে বর্মার হাত থেকে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়···

—যা ব্যাটা, তোর হুজুরাণীর কোলে গিয়ে ঘুমুগে যা—বলে বর্মা রণে ভঙ্গ দেয়··

ভর্তি কলসীর শব্দে মুন্নুর খেয়াল হলো, দেরী হয়ে গিয়েছে···

রক্ত-ঝরা মাথা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। সামনেই বিবিজী।

—কি সর্বনাশ! জল তুলতে গিয়ে কার সঙ্গে মারামারি করেছিস?

—কারুর সঙ্গে না!

—বলি, মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে···আর বলছিস্ কি না মারামারি করিনি? এ নিশ্চয়ই ঐ নচ্ছার বর্মার কাণ্ড? বারবার না বারণ করেছি, ওর সঙ্গে মিশবি না? এখন বোঝ, বন্ধুত্বের কি সুখ?

—ও কিছু নয়···একটু ছড়ে গেছে মাত্র!

টানতে টানতে মুন্নুকে নিয়ে বিবজী ছোটবাবুর কাছে হাজির করেন, ছোটবাবু তখন জামা ইস্ত্রী করছিল···

—দেখ, দেখ কাণ্ড! কার সঙ্গে মারামারি ক'রে মাথা ফাটিয়ে এসেছে!

ছোটবাবু লাফিয়ে ওঠেন, কই, এদিকে আয় তো দেখি!

ছোটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে মুন্নু বলে, ও কিছু নয়···আমি ছাই দিয়ে ঠিক ক'রে দিয়েছি! এক্ষুণি সেরে যাবে!

এই অব্যর্থ মহৌষধটি সে গাঁয়ে থাকতে গাঁয়ের নাপিতের কাছ থেকে শিখেছিল।

ছোটবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, কি সর্বনাশ! কি করেছিস্ রে মুখ্যু! এখুনি যে বিষিয়ে উঠবে, তা জানিস না বুঝি? এদিকে আয় রাস্কেল!

তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার ক'রে টিন্‌চার দিয়ে ছোটবাবু বেঁধে দেন। যন্ত্রণায় মুন্নুর মাথা ঘুরে আসে কিন্তু ছোটবাবুর ওপর অগাধ বিশ্বাসে সে চুপটী ক'রে থাকে।

রান্নাঘরের দাওয়ার এক ধারে ছোটবাবুর আদেশে সে শুয়ে পড়ে। তন্দ্রার ঝোঁকে সে শোনে, বিবিজী চেঁচাচ্ছেন···তবে তার বিরুদ্ধে নয়·· বর্মা এবং তার মনিবদের নিয়ে পড়েছেন···

—যত সব ছোটলোক আস্পর্ধা পেয়ে মাথায় উঠেছে···যেমন মনিব, চাকরও তো তেমনি হবে? বলি, মান-সম্মান ওদের কি একার আছে? আর কারুর নেই? না হয় দুটো টাকা মাইনে বেশী পায়···তা' বলে এত তেজ কিসের? তারাও মানুষ···আমরাও মানুষ···তেজ দেখাতে হয়, যে যার নিজের ঘরে দেখাবে···

কথাটা যাঁকে শুনিয়ে জোর গলায় বিবিজী জাহির করছিলেন, তাঁর কানে পৌঁছতে দেরী হলো না। পাশের বাড়ীর পাঁচিল থেকে গলা উঁচু

ক'রে সাব্-জজ-সাহেবের গিন্নী বলে উঠলেন, কেরাণীর মাগ তার আবার এত দেমাক্ কিসের? দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে আস্পর্ধা। লঘু গুরু জ্ঞান নেই! আজ আসুন উনি বাড়ী, দেখিয়ে দেবো গায়ে পড়ে অপমান করার ঠেলাটা কতদূর! কোথা থেকে একটা পাহাড়ে চাষা ধরে এনেছে... তার জন্যে এত দেমাক। কুকুর! কুকুর! রাস্তার কুকুর!

যাকে নিয়ে এই ঝগড়া সে তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

ঘুম থেকে উঠে মুন্নু দেখে, তার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণায়, সে কাঁদতে সুরু ক'রে দিল।

জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুল বকতে আরম্ভ করলো। তার মনে হলো তার চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছে...রাত্রির আকাশ যেমন অন্ধকার হয়ে যায়...শুধু তার মধ্যে দু'একটা তারা মিট মিট করছে। কানে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না...শুধু মনে হচ্ছে যেন মহাশূন্য অব্যক্ত গর্জন ক'রে উঠছে। এক কোণে শুয়ে সে কাঁপতে থাকে। কোন কিছুরই সাড়া নেই... দিনরাত যেন সব এক হয়ে গলে গিয়ে অন্তহীন বেদনায় পরিণত হচ্ছে।

ছোটবাবু ওষুধ দেয়। তার ফলে, সে ঘেমে নেয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরটা যেন কি রকম হাল্কা অবশ হয়ে যায়। আবার যেন একটু একটু ক'রে সে তার আগেকার অনুভূতি ফিরে পায়...আশে-পাশের সব জিনিস আবার যেন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বোধ হয়।

একে একে তার মনে ছবির মত অতীতের সব ঘটনা আসা-যাওয়া করতে থাকে। চাচার সঙ্গে তার শহরে আসা—চাচার মুখে নানান আশার বাণী...তারপর কাজে লেগে যাওয়া...সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কাজের অস্বস্তি ...কাপ্-ডিস্ ভাঙ্গা...বিবিজীর নিত্য গঞ্জনা...চাচার হাতে অপমান...একে একে তার সব মনে পড়তে থাকে। কাউকেই সে চায় না, তাকেও কেউ চায় না। একমাত্র শুধু ছোটবাবু যে তাকে একটু স্নেহ করে। মনে পড়ে, শীলাকে...যদিও মাঝে মাঝে তাকে বানর বলে বিদ্রূপ করে, তবুও মন্দ লাগে না তাকে। স্নান সেরে যখন ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে স্নানঘর থেকে

বেরিয়ে আসে, মুন্নু একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে···চেয়ে থাকতে তার ভাল লাগে। মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকে সে শুনে এসেছে, সব মেয়েকে মা বা বোনের মত দেখতে। শীলার ছবি মনে পড়লেই, সে চেষ্টা করে তাকে বোন বলে সম্বোধন করতে। কিন্তু যতই সে শীলাকে দেখে, ততই তার সঙ্গে থাকতে, তার সঙ্গে খেলা করতে প্রবল ইচ্ছা জাগে···ভুলে যায় তাকে বোন বলে তফাতে রাখতে হবে। কল্পনায় অথবা প্রত্যক্ষ জীবনে, ইদানীং তাই শীলাকে দেখলেই কি রকম এক লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যায়···গাঁয়ে গ্রীষ্মকালে যখন পড়শীদের বাগানের গাছে ফল পেকে উঠতো, সেই সব পাকা ফলের দিকে চেয়ে চেয়ে ঠিক এমনি তার মাথা হেঁট হয়ে যেতো···পাতলা ঠোঁটের কোণে বঞ্চিত ক্ষুধার ম্লান হাসি ফুটে উঠতো। শীলার ছবি ভাবতে ভাবতে তার ছোট্ট বুক আনন্দে দুলে উঠতো···আপনার অজ্ঞাতে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতো। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অসম্ভব আশার পরিণতির কথা ভাবতেই সে হাসি ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে যেতো। যদি তার টাকা থাকতো, যদি সে যা মাইনে পেতো তা দয়ারামের হাতে না দিয়ে বাবু তাকেই দিতেন, সে এক পয়সা তা থেকে খরচ করতো না··· জমিয়ে জমিয়ে সে মিঠাইওয়ালা হয়ে ফেরি ক'রে বেড়াতো···শীলাদের স্কুলের সামনে সে দেখেছে, একটা ছেলেকে মিঠাই ফেরি করতে···রোজ একটা ক'রে টাকা সে রোজগার করে। মনে পড়ে, যেদিন তার চাচা তাকে শহরে নিয়ে আসে, সেদিন দয়ারাম বলেছিল, দুনিয়ায় টাকাই সব! মুন্নু আজ বোঝে, সত্যিই, দুনিয়ায় টাকাই হলো সব! আজ জীবনে সে প্রথম বুঝলো, তার সঙ্গে তার গাঁয়ের মহাজনের ছেলে জয় সিং-এর তফাৎ কোথায়, গরীব লোকদের সঙ্গে বড়লোকদের পার্থক্য কোথায়!

একে একে তার মনে পড়ে তার গাঁয়ের সব হতভাগ্য লোকদের ছবি··· আজ যেন সে বুঝতে পারে, তাদের চেহারার মধ্যে রেখায় রেখায় কি কথা ফুটে আছে। মনে পড়ে সত্তর বছরের বুড়ো গাঙ্গুর চেহারা···হাড়ের ওপর শুধু একটা চামড়া জড়ানো···তারই সহপাঠী বিষাণের ঠাকুরদা···সেই বুড়ো

বয়সে সেই ক'খানা হাড় নিয়ে মাঠে মাঠে জনমজুর খেটে তাকে দিন-গুজরান করতে হয়…মনে পড়ে বিশ্বম্ভরের মায়ের শীর্ণ মুখখানি, জমিদার-বাড়ীতে দু'বেলা ঘর ঝাঁট দিয়ে যাকে দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করতে হয়…অস্পষ্ট ছায়ার মত মনে পড়ে তার নিজের বাবার কোটরাগত দু'টো চোখ…যেন সে স্পষ্ট অনুভব করে তার নিজের মায়ের কোলের সেই স্নিগ্ধ উত্তাপ…যার কোলে সে শুয়ে আছে আর তার মা জাঁতা চালিয়ে চলেছে…বিরাম বিহীন…যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে সে-হাত থামিয়ে দিয়েছে। আজ সে বুঝতে পারে সেই ছোট্ট কোলের সেই উত্তাপটুকু জীবনে কত প্রয়োজন…সাধ যায়, সেই উত্তাপকে কাপড়ের মত সারা অঙ্গে সে জড়িয়ে রাখে।

সে ভাবে আর চারদিকে চেয়ে দেখে, দেখে তার মতন গরীব লোক, তারাই তো সংসার জুড়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে হাতে গোনা যায়, দু'তিন জন মাত্র বড়লোক। আচ্ছা, এই যে এত সব গরীব লোক, তারা কি সবাই তার বাবার মতন একদিন অসহায়ভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ? গরীব লোকেরা কি এই রকম ক'রেই মরে ? শহরে অবশ্য সে দেখছে, গাঁয়ের চেয়ে বড়লোকদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু সে নিজের মনে হিসাব ক'রে দেখে, একশোটা গাঁয়ের মধ্যে আছে বড় জোর একটা শহর · আর সেই এক একটা গাঁয়ে সে যত গরীব লোক দেখেছে, সেই রকম যদি সব গাঁয়েই থাকে, তা' হলে পৃথিবীতে কত গরীব লোক আছে ?

সে নিজের মধ্যে বিচার করে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, এত যে সব জাত বিচার, তার মধ্যে সে দেখেছে, আসলে মাত্র দুটো জাত আছে। জাতিতে সে ক্ষত্রিয়, কিন্তু গরীব…বর্মা জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে-ও গরীব…মনিবেরা তাকেও যেমন চাকর বলে ঘৃণা করে, বর্মার মনিবও বর্মাকে তেমনি চাকর বলে ঘৃণা করে। সেখানে তারা দু'জনেই এক জাতের লোক। বাবুদের যে-জাতই হোক না কেন, তারা সাহেবদের মতই ··তারা সবাই এক জাত। সে স্থির মীমাংসায় আসে, জগতে দুটো জাত আছে ··এক জাতের নাম হলো

মনিব, আর এক জাতের নাম হলো চাকর। এক জাত ধনী··· আর এক জাত গরীব।

কিন্তু বিবিজীর ডাকে সেদিন তার সেই চিন্তাধারার গতিরেখা হঠাৎ ঘুরে সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে যায়। কাজ করতে করতে দেহের সবলতার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অজ্ঞাতে তার মনের স্বাভাবিক সজীবতাও আবার ফিরে আসে; তার নিজের অজ্ঞাতে তার সত্তার ভিত্তিমূলে ছিল যে দুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ···তার সহজ মানবীয় স্ফুরণে, সে ভুলে যায় উঁচু-নীচুর ভেদ-জ্ঞান, মনের আনন্দে আবার সে নেচে বেড়ায়, গান গায়, চেঁচায়, ডিগ্‌বাজী খায়। দুর্দিনের দুশ্চিন্তা মনের আশে-পাশে যে-সব বেড়া তৈরী করে, তার বুনো প্রাণের পাগলা-ঝোরা তাদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় আবার।

কিন্তু তার এই স্বভাবজাত বুনোমি, যা কোনদিন ভাল-মন্দের নীতিবোধে বাঁধা পড়েনি, এবং যা দৈহিক আঘাতের বেদনাতেও কোনদিন সঙ্কুচিত হয়নি, তাকেই মাঝে মাঝে বিপন্ন ক'রে তুলতো। তখন আর তার লজ্জার অন্ত থাকতো না।

ঠিক এমনি ভাবে সে বিপন্ন হলো একদিন।

সেদিন বিকেলবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সে আলু কুটছিল। এমন সময় শুনলো শীলা আর তার স্কুলের বান্ধবীরা বাইরের ঘরে এসেছে। বিবিজী তখন পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে খোসগল্প করতে বেরিয়েছেন। সে ভাবলো, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাইরের ঘরে তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটবে।

হাত ধুতে ধুতে সে শুনতে পেলো, সেই বাক্সের গান সুরু হয়ে গিয়েছে। এই তো তার সুযোগ! ইদানীং বিবিজী কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন মুন্নুর সঙ্গে খেলা না করে। তাদের মন-ভুলানোর জন্যে মুন্নুর কাছে এক ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, বাঁদর-নাচ দেখানো। তারই প্রলোভনে তারা ভুলে যেতো বিবিজীর নিষেধ···মুন্নু নিঃশব্দে মিশে যেতো তাদের দলে।

শীলা তখন বান্ধবীদের নিয়ে স্কুলে-শেখা একটা নাচের মহড়া দিচ্ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে মুন্নু হামাগুঁড়ি দিয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রতে সুরু ক'রে দিল। মেয়েরা ভয়ে নাচ বন্ধ ক'রে দিল!

কৌশল্যা ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো, এই, চলে যা এখান থেকে!

শীলা সমর্থন ক'রে বলে, আমাদের সঙ্গে তুই খেলতে এলি যে? মনে নেই, মা বারণ ক'রে দিয়েছেন বারবার?

কিন্তু মুখে যাই বলুক না কেন, তার সেই বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী এবং নৃত্য শীলার ভালো লাগতো। সে নিজেও চাইতো মুন্নুর সঙ্গে খেলতে কিন্তু তার মায়ের আদেশ তাকে লাগাম টেনে ধরতো। কিন্তু মুন্নুর রকম-সকম দেখে শীলা বেশীক্ষণ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কৃত্রিম রাগে মুন্নুর কান ধরে তাকে ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগলো।

মুন্নুও ইচ্ছা ক'রে তাকে তার কান ধরতে দিলো।

মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়লো। শীলা যত জোরে কান ধ'রে টানে, সে তত তার ওপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দাঁত কড়মড় ক'রে, কামড়াবার জন্যে মুখ হাঁ করে, যেন সে সত্যিকারের বাঁদর।

খেলতে খেলতে সে হঠাৎ শীলার মুখে দাঁত বসিয়ে দেয়! তার ধারণাতেই ছিল না, সে কি অনর্থই না ক'রে ফেলেছে।

—মা! মাগো!– শীলা চীৎকার ক'রে ওঠে।

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না মায়ের। তখন কৌশল্যা বেরিয়ে গেল শীলার মাকে ডেকে আনবার জন্যে।

—ওগো শীলার মা! শিগ্‌গির এসো! শিগ্‌গির এসো! দেখে যাও, মুন্নু কি ক'রেছে!

বিবিজী উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে পড়েন।

ঘরে ঢুকেই দেখেন শীলা আহত গণ্ডে হাত বুলোচ্ছে।

—কি করেছে দেখি···ওকি, তোর মুখে কি হয়েছে?

দুধের মত সাদা গালে কাল-শিরার দাগ পড়ে গিয়েছে।

ঝড় ভেঙ্গে পড়বার আগেই মুন্নু কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, দোহাই বিবিজী …আমি শুধু খেলছিলাম…

দেখতে দেখতে কাল-বৈশাখীর ঝড় ভেঙ্গে পড়ে…

—ওরে মড়া…তুই মরবি কবে? কবে হাড় জুড়োবে আমার…ওমা… কি হবে গো…এই দুধের বাছার ওপর…ইত্যাদি ইত্যাদি…

দৈবচক্রে বাবু নাথুমলও তখন আফিস থেকে ফিরছিলেন! চীৎকার শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

তার উত্তরে বিবিজী গর্জন ক'রে ওঠেন, বলি, কি না হয়েছে? হবার আর বাকি কি আছে? মর্‌না…মর্‌না মড়া?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বাবু নাথুমল আরো রেগে ওঠেন, বলি, কি হয়েছে তা তো বলবে?

—বলবো…বলবো…রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে…ঐ হতভাগা সর্বস্ব-খেগো শীলার গাল কামড়ে দিয়েছে! ও মা! ঘোর কলি…ঘোর কলি …এইটুকু বাচ্চা ছোঁড়া…এখনও জন্মায় নি বল্লে হয়…তার'কি না এত বাড়…

বাবু নাথুমল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে, দাঁতে দাঁত চেপে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই হারামজাদা… কি করেছিস্ বল?

মুন্নু মাথা হেট ক'রে দাঁড়িয়েছিল…লজ্জায় আর অপমানে তার দেহের সব রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে বুক এত জোরে কাঁপছে যে সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে তার ধুকধুকুনি!

বাবু নাথুমল এগিয়ে গিয়ে সজোরে মুন্নুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন।

—চুপ ক'রে রইলি যে শূয়ার! উত্তর দে?

কোন রকমে মুখ তুলে মুন্নু বলে, বাবুজী…বিশ্বাস করুন, আমি খেলছিলাম শুধু…

—খেলছিলে…খেলছিলে…বাঁদর-বাচ্ছা কোথাকার—

হাড়-বার করা হাতে বাবুজী পুনরায় আর এক চড় বসিয়ে দেন সজোরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিস-করা কালো বুট-শুদ্ধ পায়ের এক লাথি…

চক্‌-চকে কালো পালিস-করা বুট…মুন্নুর বড় সাধের জিনিস !

সেই লাথির বেগ সামলাতে সামলাতে মুন্নু কেঁদে বলে ওঠে, আমাকে মাপ করুন বাবুজী…মাপ করুন আমাকে…

—মাপ করবো…ভাল ক'রে তোকে মাপ ক'রবো, আঁস্তাকুড়ের কুকুর ! সঙ্গে সঙ্গে বুট-শুদ্ধ পায়ের আবার লাথি…

তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা লাঠি তুলে নিলেন। লাঠি দেখে মুন্নুর মনের ভেতর এক মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। এক দুরন্ত বিদ্রোহ তার মনে জেগে উঠলো। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ ক'রতে সে ভীত হয়ে পড়লো।

পরিবর্তে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদে আর বলে, বাবুজী মাপ করুন… মাপ করুন বাবুজী !

—মাপ ক'রবোই তো শূয়ার !

বাবু নাথ্‌মল সবেগে লাঠি তুলে আঘাতের পর আঘাত ক'রে চলে ।

ন্ন যন্ত্রণায় মাটীতে-পড়ে কাতরাতে লাগলো।

বাবু নাথ্‌মল বীরভঙ্গীতে শেষবারের মতন লাঠী তুল্লেন,

—যেমন কুকুর…তেমনি মুগুর…

এতক্ষণ পরে বিবিজী বাবুর হাত ধরে বলে উঠলেন, থাক্‌…আর নয়…

অন্ধকার ঘরের এক কোণে মাটীতে মুখ ক'রে মুন্ন অর্ধ-চেতন অবস্থায় শুধু বলে, মাপ করুন আমাকে…

বেত্রাহত সারমেয় খোঁজে অন্ধকার কোণ…বেত্রাহত মানুষ খোঁজে নিষ্ক্রমণের পথ।

সেদিন সন্ধ্যার পর, যখন তাকে একলা ঘরে ফেলে রেখে দিয়ে, যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় মুন্নু সকলের অতর্কিতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। পাহাড়ী পথ ধরে নীচের দিকে সে নামতে সুরু

করলো, সারি সারি দেওদার গাছ পেরিয়ে, ব্যাঙ্কের বাড়ী ছাড়িয়ে, নানান কাজ-করা বড় বড় সব থামওয়ালা বাড়ী পেছনে ফেলে, সে এসে পড়লো বাজারের মধ্যে। ছোট-বড় দোকান গুলোর মধ্যে কারুর ঘরে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিক আলো, কারুর দরজা থেকে দেখা যাচ্ছে হ্যারিকেনের লণ্ঠন··· কোনটাতে জ্বলছে মোমবাতি। সেই আলোর ঝলমলানি মুন্নুর অশ্রুসিক্ত চোখে তীরের মতন এসে লাগে। অশ্রু-আহত চোখ খোঁজে অন্ধকার। তাই গলির অন্ধকারের মধ্যে মুন্নু ঢুকে পড়ে। কিন্তু ছোট্ট গলির মধ্যে কাছাকাছি সব লোক চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে···আলোর চেয়ে সে আরো অসহ লাগে। তার সর্ব দেহ-মন খুঁজছে কোথায় অন্ধকার···কোথায় কোলাহলহীন নীরবতা। এই মানুষের ভিড় থেকে সে যদি এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে! কোথাও কোন গভীর অন্ধকারে মুখ রেখে সে যদি ভুলে যেতে পারে, সর্ব-অঙ্গে সেই নিদারুণ প্রহারের নির্মম অপমানের জ্বালা। কেউ যেন তাকে না দেখে, না চিনতে পারে। সে এ-গলি সে-গলি দিয়ে মানুষ এড়িয়ে চলে···শেষকালে সে ছুটতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখে, একটা প্রকাণ্ড দরজার ওধারে একটা মস্ত বড় উঠানের মত খোলা জায়গা···তার ভেতর জায়গায় জায়গায় কাঠের আগুনে মানুষের মৃতদেহ পুড়ছে! সব চুপচাপ···কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। সে-স্তব্ধ অন্ধকারে মুন্নু ভীত হয়ে ওঠে···

পাশের এক খোলা নর্দমায় দু'টো কুকুর কি নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো ···দূরে একটা এঞ্জিন সশব্দে চলে গেল··মুন্নুর মনে হলো, কে যেন তার পেছনে পেছনে আসছে···ভূত নাকি? না, কাছের রেলের গুদামের প্রহরী? মুন্নু দম বন্ধ ক'রে ছুটতে আরম্ভ করলো। দেখে সামনে অসংখ্য লাল নীল আলো···পায়ের তলায় অজগর সাপের মত পড়ে রয়েছে রেলের লাইন···

রেল-লাইন ধরে মুন্নু ষ্টেশনের ধারে এসে দেখলো একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে···কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। গাড়ীর ভেতরেও অন্ধকার। দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে গাড়ীর

ভেতর সে লাফিয়ে পড়লো…গাড়ীর মেঝেতে…সটান সেখানেই সে শুয়ে পড়লো…

কিছুক্ষণ পরেই সে শুনতে পেলো, মানুষের আওয়াজ…ক্রমশ তা' কলরবে পরিণত হলো…গাড়ীর দরজা খুলে অন্ধকারে যে-যার আসন খুঁজে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিল…মুটেরা দুমদাম ক'রে পোঁটলা নামিয়ে দিতে লাগলো…মানুষের চেঁচামেচিতে আর নিঃশ্বাসে গাড়ীর ভেতরের অন্ধকার গরম হ'য়ে উঠলো…কিছুক্ষণ পরে গাড়ী নড়ে উঠলো…ট্রেন ছেড়ে দিল…

কোথায় চলেছে সে-ট্রেন, তা মুন্নু জানে না…তবে একটা চলন্ত জিনিসের সংস্পর্শে সে-ও চলেছে, এই সান্ত্বনাই তার কাছে চরম হয়ে দেখা দিল।

শ্যামনগর থেকে দৌলতপুরের দিকে যে ট্রেনটী রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছিল, তার থার্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্টের এক কোণে শেঠ প্রভুদয়াল রাশীকৃত লগেজের ওপর কোন রকমে হাত-পা গুটিয়ে বসে ঘুমুবার চেষ্টা ক'রে ভোরের দিকে বুঝলেন বৃথা সে চেষ্টা…সামনেই তার নামবার ষ্টেশন…অতএব আগে থাকতে লগেজগুলো সামলে নেওয়া দরকার! কিন্তু লগেজ সামলাতে গিয়ে দেখেন, গাড়ীর মেঝের এক কোণে একটী ছেলে অগাধে ঘুমুচ্ছে…হঠাৎ তার গায়ে পা পড়ে যেতে যেতে সামলিয়ে নিয়ে শেঠজী বলে উঠলেন, রাম…আরে…রাম!

তখন একজন শিখযাত্রী সবেমাত্র চোখ খুলে গুরুজীর নাম স্মরণ করছিলেন, ওয়া গুরুজী! ওয়া গুরুজী!

একজন মুসলমান-যাত্রী উঠে দাঁড়াতেই দেখে, তার পায়ের তলায় একজন শুয়ে পড়ে আছে, ইয়ে আল্লাহ। ইয়ে কৌন্ হ্যায়?

পাশেই একজন নারী শিশু-পুত্রকে স্তন্যদান করছিলেন, তাঁরও দৃষ্টি সেই দিকে পড়তে তিনি বলে উঠলেন, মড়া, না, জ্যান্ত?

দেখতে দেখতে সেই উষার আলোকে গাড়ী শুদ্ধ লোকের মধ্যে একটা সশঙ্ক কৌতূহল জেগে উঠলো। শেঠজী হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে মুন্নুকে জাগিয়ে তুল্লেন।

জেগে উঠে চোখ খুলে সেই দৃশ্য দেখে মুন্নু ভয়ে মুখ বুঁজে পড়ে রইলো। সবেমাত্র সে স্বপ্ন দেখছিল, বিরাটকায় সব দৈত্য তার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে...আর দু'দিক থেকে দু'টো শিঙ-ওয়ালা দৈত্য তাকে তাড়া ক'রে আসছে...

শেঠ প্রভুদয়াল ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে অর্ধ-স্বগতোক্তি ক'রে বল্লেন, ভগবানের ইচ্ছে কে বুঝতে পারে? ভোর বেলা চোখ মেলতেই কি না দেখি একটা ছেলে!

সহযাত্রী বন্ধু গণপত শেঠজীর মনের কথা বুঝতে পেরে ঠাট্টা ক'রে বলে উঠলেন, আর ভাবনা কি শেঠজী? একেবারে "রেডি-মেড" ছেলে...শেঠ-গিন্নীকেও আর গাছ-গাছড়া খুঁজতে হবে না...তোমাকেও আর হেকিমী ওষুধ খেতে হবে না।

তারপর নিজের রসিকতায় নিজে খানিকটা হেসে নিয়ে বল্লেন, আমার মনে হয় বন্ধু, দোষটা শেঠ-গিন্নীর নয়...তোমারই!

শেঠ প্রভুদয়ালেরও আদি-বাড়ী ছিল ক্যাংড়ার পাহাড়ে। সেখান থেকে একদিন ভাগ্যবিতাড়িত হয়ে দৌলতপুরে এসে তিনি কপর্দকহীন পথের কুলি থেকে ক্রমশঃ শেঠজী হয়েছেন...এখন একটা চাটনীর কল এবং এসেন্স-তৈরীর কারখানার তিনি মালিক।

তাই মুন্নুকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন, পাহাড়ী বলে। পাহাড়ী লোকদের কথার টানে তিনি তখন জিজ্ঞাসাবাদ সুরু ক'রে দিয়েছেন, কি নাম? কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কার ছেলে? কোথায় যাবে?

হঠাৎ সেই অবস্থায় নিজের গেঁয়ো বুলি শুনতে পেয়ে মুন্নুর মন যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সে সহজ ভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়, আমাদের গাঁ বিলাসপুরে, আমাকে তারা মুন্নু বলে ডাকতো, শ্যামনগরে এসে

আমার নাম হয়ে যায় মুনডু। ছেলেবেলাতেই আমার মা-বাপ মারা যায়। আমার চাচা দয়ারাম শ্যামনগরে ব্যাঙ্কের চাপরাসী। সেখানে এক বাবুর বাড়ীতে আমার চাকরী ক'রে দেয়। পরশু দিন আমার মনিব আমাকে এ রকম মারে যে আমি পালিয়ে আসি...

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের অজ্ঞাতে তার ঠোঁটের দুই কোণ কেঁপে উঠে...দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। ততক্ষণে তাকে নিয়ে গাড়ীর ভেতর জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গিয়েছে। একজন আধা-দেশী আধা-বিলাতী পোসাক-পরা হিন্দু ছাত্র বলে উঠলো, ও সব হলো ডবলু-টি'র দল।

সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে প্রভুদয়াল তাঁর সহযাত্রী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, কি বল হে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক্?

গণপত তাতে আপত্তি জানায়, বলে, জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে, তাকে বাড়ী নিয়ে তুলবে কি হে? বলি চোর ছ্যাঁচোড়ও তো হতে পারে? তবে কারখানাতে আমাদের একটা ছেলের দরকার হতে পারে, তুলসী, মহারাজ, বোঙ্গা, ওদের সাহায্য করবার জন্যে...এ-ধার ও-ধার যাওয়া ...এটা সেটা করা...আর দেখে মনে হচ্ছে, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিলেই চলবে · মাইনে টাইনে দিতে হবে না...

গণপতের উপদেশ যে বিশেষ কার্যকরী হলো তা প্রভুদয়ালের মুখের ভাব থেকে ঠিক বোঝা গেল না। শেঠজী একটু স্নেহকোমল ভাবেই মুন্নুকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলি...ও মুন্নু না মুনডু তুই আসবি আমাদের সঙ্গে? আমাদের কাছেই থাকবি। আমার বাড়ী হচ্ছে হামিরপুর...বিলাসপুরের কাছেই।

মুন্নু কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালো, তার আপত্তি নেই। কিন্তু মনে মনে তার তখন ভয় এবং সন্দেহ দুই-ই ছিল। পালিয়ে আসবার পর থেকে, সে এক মুহূর্তের জন্যেও ভাববার অবকাশ পায় নি, সে কি করবে বা করতে পারে... তার মনকে সারাক্ষণ ধরে জুড়ে ছিল শুধু এই দুশ্চিন্তা, যদি সে ধরা পড়ে!

মুন্নুকে নীরব দেখে, প্রভুদয়াল উৎসাহ দেবার জন্যে পিঠ চাপড়ে বলে, 'ভয় কি ? আরে কাঁদতে আছে নাকি ? চোখের জল মুছে ফেল···সাহস কর ! আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা তোমার দেখা শোনা ক'রবো···উঠে পড়··· এই তো দৌলতপুরের কাছ বরাবর এসে পড়লাম !

নিজে একটু সরে দেহটাকে পাতলা ক'রে নিয়ে, শেঠজী একধারে মুন্নুর একটু বসবার জায়গা ক'রে দেন। হঠাৎ সেই অবস্থায় মুন্নুকে দেখে তাঁর মন সেই অসহায় বালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মনে হয়, তিনি যেন তার আত্মীয়···অজাত-শিশুর দাবী নিয়ে মুন্নু যেন তাঁর পুত্রস্নেহবঞ্চিত অন্তরে অনায়াসে প্রবেশ ক'রে গিয়েছে। কিন্তু একমাত্র ভাবনা, এই সম্পূর্ণ অজানা অচেনা ছেলেটিকে পুত্র বলে গ্রহণ করা সম্ভব হবে কি না। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেন, এর মা-বাপ কি ধরণের লোক হতে পারে! নিশ্চয়ই গরীব। তার পরমুহূর্তেই নিজেকে বোঝাবার জন্যে নিজেই ভাবেন, পাহাড়ী লোক মাত্রেই তো গরীব। সেই সঙ্গে স্মরণ করেন তাঁর বাল্যকালের কথা, তাঁর মা-বাপের কথা, তাঁরাও তো গরীব ছিলেন! একদিন এই দৌলতপুর শহরে কুলিগিরি ক'রে তাঁকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করতে হয়েছে··· মা-বাপকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতেও পারেন নি। আজ তিনি শেঠজী, দু-দুটো কারখানার মালিক···আজ যদি, তাঁর মা-বাপ বেঁচে থাকতেন! আপনা থেকে শেঠজীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, যা হবে না, অসম্ভব, তা ভেবে কি লাভ ? চিন্তাকে উপস্থিত-ক্ষেত্রে নিয়ে এসে ভাবেন, এ ছেলেটীর অবস্থা আরো শোচনীয়, তার রোজগার করবার আগেই তার মা-বাপ তাকে ছেড়ে বিদায় নেয়! গণপৎ এসব জানবে কি ক'রে ? বড়লোকের ছেলে হয়েই সে জন্মেছে···মদে, মেয়েমানুষে, জুয়োয় পয়সা উড়িয়েছে···তার বাবা তাও জুগিয়ে গিয়েছেন···প্রভুদয়াল আজও মনে মনে আক্ষেপ করে, হায়, পয়সার অভাবে আমি শত ইচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে পারলাম না—আর পয়সা দু'হাতে নষ্ট ক'রে এরা পড়াশোনার ধারেও গেল না···হয়ত ঠিক আমারই মতন এই ছেলেটীও মনে মনে তাই আক্ষেপ করে···হয়ত পয়সার অভাবে সে-ও স্কুলে যেতে পায় নি!

পাশ ফিরে শেঠজী জিজ্ঞাসা করেন, তুমি খোকা স্কুলে পড়েছ কখনো ?

—হাঁ, আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছিলাম, আমার চাচা আমাকে কাজ করবার জন্যে নিয়ে এলো স্কুল ছাড়িয়ে !

গণপত তখন তন্দ্রায় ঢুলছিল। ব্যঙ্গ ক'রে বলে ওঠে, তাহলে আর ভাবনা কি ! তোমার হিসেব পত্র রাখতে পারবে !

প্রত্যুত্তরে শেঠজী গম্ভীর ভাবে বলেন, হাঁ…আমিও তাই ভাবছি… আমাদের একজন কেরাণী তো দরকার।

গণপত বিজ্ঞের মত বলে, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি…গোড়া থেকেই ছেলেটার মাথা ও ভাবে খেয়ো না। পুষ্যিপুত্তুর নেবে, মুন্সী ক'রবে …ওতো মাটীতে আর পা-ই ফেলবে না। কোথাকার কে, তার নেই ঠিক ! একটা চোরও হতে পারে…গাঁটকাটার দলের লোকও হতে পারে !

গণপত শেঠজীর ব্যবসার অংশীদার এবং ধনী…সেইজন্যে শেঠজী তাকে একটু ভয় করেই চলতেন ! তাই গণপতের শেষ সতর্কবাণীর উত্তরে তিনি শুধু একটু ক্ষীণ হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু সব সতর্কবাণী সত্ত্বেও, তাঁর মন যেন আপনা থেকেই অপত্য-স্নেহে সেই অজানা অচেনা বালকটীর দিকে গড়িয়ে চলছিল।

ট্রেন তখন দৌলতপুরের উপকণ্ঠ ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছে। মুন্নু নীরবে জানালার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে…তার চোখের সামনে দ্রুত চলে যায় দৃশ্যের পর দৃশ্য…একটা ছবি ভাল ক'রে দেখতে না দেখতে এসে পড়ে আর একটা ছবি…পাতকুয়ার ধারে মেয়েরা জল তুলছে, অর্ধ-নগ্ন দেহে পুরুষেরা স্নান করছে…কলা-বাগান-ঘেরা মন্দির… মসজিদ…সোডা ওয়াটার ওয়ার্কস্‌-এর কারখানা… বর্মা অয়েল কোম্পানীর বড় বড় হরফে লেখা বিজ্ঞাপন…একটার পর একটা দ্রুত চলে যায়…ট্রেন যতই দৌলতপুরের দিকে এগিয়ে চলে মুন্নুর মনের কাঁপন ততই বাড়তে থাকে… আশা ও আতঙ্ক এক সঙ্গে মিলে যেন ডানার ঝাপটা দিতে থাকে…ঠিক যেমনটী হয়েছিল যখন সে প্রথম আসে শ্যামনগরে।

ষ্টেশনে একটা ঢাকা গরুর গাড়ী ভাড়া করা হলো···তার ভেতর প্রভুদয়াল আর গণপতের মাঝখানে কোন রকমে মুন্নুর একটু জায়গা হলো··· কেন না, আরো চারজন যাত্রী সেই গাড়ীতেই উঠলো। সুতরাং অন্তরের সমস্ত আগ্রহ সত্ত্বেও সে বাইরের কোন কিছুই দেখতে পেলনা···কখন যে দৌলতপুরের বাজার তারা পেরিয়ে এল, তা জানতেই পারলো না। ক্রমে একটা ছোট্ট গলির মুখে গাড়ীটা এসে থামলো·· বেড়াল-খাকীর গলি, সেখানকার লোকে নাম দিয়েছে গলিটার। গলির মুখে খানকতক ছোট ছোট দোকান···মধ্যে ছোট্ট রাস্তার দু'ধারে আবর্জনা আর আঁস্তাকুড়···পা ফেলবার জায়গা নেই···বাতাস যেন তারি দুর্গন্ধে ভারি···তারি মধ্যে দু'ধার থেকে উঠেছে গায়ে গা-ঘেঁষিয়ে সরু সরু লম্বা সব তেতলা বাড়ী।

প্রভুদয়াল আর গণপতের পিছু পিছু নীরবে মুন্নু সেই গলির ভেতর দিয়ে চলে আর দু'ধারে চেয়ে দেখে···আলুলায়িত-বাস স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর রোয়াকে বসে মাটীর বাসন-পত্র তৈরী করছে···দেখলেই বোঝা যায়, তারাও এসেছে পাহাড় থেকে নেমে···কুলিদের বউ···স্বামীরা দিনের বেলায় খাটতে বেরোয়···তখন ঘরে বসে তারা এ-টা ও-টা তৈরী ক'রে দু'চার পয়সা বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করে।

প্রভুদয়ালকে দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানায় এবং পাহাড়ী বুলিতে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, জয় দেব শেঠজী! ঘর থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এলেন তা হলে? সেখানে লোকজন সব ভাল আছে তো?

প্রভুদয়াল হাতজোড় ক'রে তাদের প্রত্যাভিবাদন জানায়, তোমাদের আশীর্বাদে সবাই ভাল আছে।

পাহাড়ী বুলি শুনে মুন্নুর মন যেন একটু আশ্বস্ত হয়।

একটা প্রকাণ্ড দরজার ভেতর দিয়ে তারা একটা বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াতেই, বাড়ীর ভেতর থেকে রাজ্যের মেয়ে এসে প্রভুদয়াল আর গণপতকে ঘিরে দাঁড়ায়···বুড়িও আছে···তরুণীও আছে সে-দলে। কিন্তু সকলের মুখে এক কথা, কি আনলে আমাদের জন্যে?

তাদের সকলের উত্তরে প্রভুদয়াল ঈষৎ হেসে আঙুল দিয়ে মুন্নুকে দেখিয়ে দেন...বলেন, তোমাদের জন্যে মাত্র এই একটী জিনিস এনেছি

মুন্নু রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ে।

উঠোন থেকে কয়েক ধাপ উঠে তারা সকলে মিলে একটা বড় ঘরে এলো —সেখানে মুন্নু দেখে, একটী স্বল্প-দেহা নিরীহ নারী-মূর্তি যেন তাদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল...চোখে তার স্নিগ্ধ আলো, দীপ-শিখার মতন যেন দুলছে ...মুন্নুর মনে হলো, ইনিই বোধ হয় শেঠজীর স্ত্রী। ঈষৎ ম্লান বিবর্ণ...অতি ধীর স্থির...কিন্তু মুন্নুকে দেখেই তিনি আকুল অগ্র হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে এলেন · সে কে...কোথা থেকে এসেছে...কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না...কাছে এসে মধুর স্নেহে দু'হাত দিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন এবং চিবুক ধরে এমন সহজ ভাবে মুন্নুকে আদর ক'রতে লাগলেন যে এক নিমিষের মধ্যে মুন্নুর মনের সব আশঙ্কা যেন মুছে গেল...এমনি ধারা জীবনে আসে এক একটী মুহূর্ত, যার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গড়ে ওঠে একটা জীবনের সম্বন্ধ।

শেঠ-গৃহিণীর হাব-ভাব দেখে ব্যঙ্গ-স্বরে গণপত বলে উঠলো, চরণে পেন্নাম হই ভাবী।

একান্ত সহজভাবে সেই অভিবাদন গ্রহণ ক'রে পার্বতী প্রত্যুত্তরে রসিকতা ক'রে উত্তর দিলেন, তাহলে ভাইয়া এবারেও পাহাড় থেকে দেখে-শুনে একটা ভাল বউ নিয়ে আসতে পারলে না ?

গণপত উত্তর দেয়, না ভাবী...আমার বরাৎ মন্দ...তবে তোমার বরাৎ ভাল...তোমার জন্যে একেবারে একটা তৈরী ছেলে নিয়ে এসেছি !

মুন্নুকে সস্নেহে জরিয়ে ধ'রে পার্বতী বলে, তা তো দেখছি।

তারপর সে-কথা চাপা দেবার জন্যেই স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলে, খাবার তৈরী ক'রে রেখেছি। আমি বলি কি, আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নাও... তারপর স্নান ক'রে বিশ্রাম করবে'খন। কেমন ?

আড়ম্বরহীন সহজ স্নেহে প্রভুদয়াল বলেন, বেশ !

দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া একটা খাটিয়া টেনে নিয়ে, তার ওপর মাল-পত্র গুলো রেখে প্রভুদয়াল মুন্নুকে বসতে বলেন।

মুন্নু খাটের ওপর ব'সে ভাবে, কারখানাটা তাহলে কোথায়।

এমন সময় পার্বতী তার সামনে এক গেলাস সরবৎ নিয়ে এসে ধরলেন। মুন্নু বিশ্বাস করতেই পারেনি, যে সরবৎই তার জন্যে আনা হয়েছে এবং এনেছেন স্বয়ং শেঠ-গৃহিণী।

সরবৎ খাওয়া হ'য়ে গেলে পার্বতী মুন্নুকে স্নানের ঘরে নিয়ে গেলেন।

স্নান সেরে আহার।

ভাত...ডাল...দু'তিন রকম তরকারি...পায়েস...তাদের গাঁয়ের রান্না, বহুদিন মুন্নু যার স্বাদ পায় নি...তেঁতুলের চাটনি সেই সঙ্গে শহরের রান্না দু'চারটে...জীবনে এরকম ভাবে পেটভরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে আর খায় নি।

উদর আজ পরিপূর্ণ...দেহ স্নিগ্ধ...শান্ত...খাটিয়ার ওপর শুতেই ঘুমের অতলে যেন সে ডুবে গেল।

ঘুম ভেঙ্গে যখন উঠলো তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখে শেঠজী কাছে বসে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন। মুন্নুকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে তিনি বল্লেন, এবারে উঠে মুখ ধুয়ে কারখানায় যাও.. ঐ যে জানালা দেখছো...ওর তলায় নীচের ঘরে কারখানা...ওখান থেকে তুমি নিজে নামতে পারবে না...ওখানে গেলেই কেউ না কেউ তোমাকে হাত ধরে নামিয়ে নেবে'খন।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখেই মুন্নুর যেন দম আটকে এলো। কিছু দূরেই অন্ধকার বন্ধ ঘরে দু'তিনটে বড় বড় উনুন জ্বলছে... সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ার অন্ধকারে যেন কালো হয়ে আছে ..মাঝে মাঝে সেদিক থেকে যখন বাতাস আসছে...মনে হচ্ছে যেন আগুনের ঝলকা...এর মধ্যে মানুষ কাজ করে কি ক'রে?

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নীচে থেকে এক বিরাটকায় লোক তাকে তুলে ধরে নীচে নামিয়ে নিলো। বিরাট দেহ...সর্ব-অঙ্গে কালি-মাখা

…মুখটা দেখলে মানুষের চেয়ে জন্তুর কথাই বেশী মনে পড়ে…হাত-পা, বুক সবজায়গাতেই যেন মাংস ফুলে শক্ত ইঁট হয়ে আছে…এমন বদ-চেহারার লোক মুন্নু এর আগে আর কখনো দেখেনি। লোকটার স্পর্শে তার দেহের মধ্যে কেমন তীব্র অস্বস্তি জেগে উঠলো!

এমন সময় গণপতের কণ্ঠস্বর মুন্নুর কানে এলো,—ওকে ছেড়ে এখন কাজে চলে যাও মহারাজ!

মুন্নু ভাবছে কি করবে, এমন সময় দেখে একটা ছোট ছেলে…বেঁটে… মোটাসোটা, মুখ-খানা যেন কে কাদা দিয়ে লেপে দিয়েছে…কারখানার ঢোকবার মুখে বসে রয়েছে…দুটো কট্‌কটে লাল চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে যেন কি বলতে চাইছে…মুন্নুর অস্বস্তি বেড়ে ওঠে…সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে যেন ধাক্কা মারলো…মুখ হাঁ ক'রে কি যেন বলতে গেল…কিন্তু কথার বদলে কতকগুলো অস্পষ্ট বিকৃত আওয়াজ তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো…মুন্নু অবাক হয়ে ভাবে, কি ব্যাপার?

অন্ধকারে এককোণে বসে গণপত তামাক খাচ্ছিল। মুন্নুর অবস্থা দেখে বলে উঠলো, বুঝতে পারছিস না? বোঙ্গা তোকে বসতে বলছে…ও হাবা-কালা কি না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুন্নু যেন ধাতস্থ হলো। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে যেতেই দেখে একজন ভদ্রবেশী লোক…গায়ে বাবুদের মতন সার্ট, মাথার চুল বাবুদের মতনই আঁচড়ানো…একটা গর্তের মধ্যে মস্ত বড় কড়া থেকে গরম জলের মতন কি যেন ঢালছে।

যেই আরো দু'এক পা এগিয়েছে অমনি লোকটা চীৎকার ক'রে উঠলো, আরে আরে, গিধ্‌ধোড়…গাধা…করে কি?

অমনি চারিদিক থেকে লোকে চীৎকার ক'রে উঠলো, এই! এই! কোথাকার উজবুক…! পুড়ে মরলো নাকি?

গণপৎ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, এই শূয়োর···এ-দিক ও-দিক ঘুরঘুর করছিস কেন? মরবি! দেখছিস না, তুলসী এসেন্স তৈরী ক'রছে? একটু পরেই তোকে নিয়ে ও বেরুবে···যেখানে যেখানে বিলি ক'রতে হবে, ওর সঙ্গে গিয়ে দেখে নিবি···বুঝলি? কাল থেকে তোকেই বিলি ক'রতে হবে দোকানে দোকানে। আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে, কারখানার মধ্যে ঘুরঘুর ক'রে অন্য লোকের কাজ-কর্ম পণ্ড করিস না···চুপটী ক'রে একজায়গায় বোস · অভ্যেস কর ভদ্র হয়ে বসে থাকতে···

এই বলে একটা টুলের ওপর মুন্নুকে টেনে বসিয়ে দেয়।

—এতক্ষণ তো পথে পথে না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াতে আর না হয়, কাঁড়িতে বসে লঁপ্সী খেতে···দয়া ক'রে তোমাকে এখানে আমরা যে নিয়ে এসেছি···দয়া ক'রে সেটা যেন ভুল না!

স্তম্ভিত হয়ে সেখানে ব'সে মুন্নু চারদিকে চেয়ে দেখে। হঠাৎ তুলসীর জ্বলন্ত কড়া থেকে এক ঝলক গরম হাওয়া সোজা তার চোখেমুখে এসে লাগে, চোখ যেন ঝলসে যায়···

সেই আধ-অন্ধকার···তপ্ত বদ্ধ হাওয়া···তার মধ্যে জ্বলছে বড় বড় উনুন···উঠছে নামছে বড় বড় সব লোহার কড়া···মস্ত মস্ত সব কাঠের পিপে···তার মধ্যে মুন্নুর মনে হতে লাগলো, সে যেন একান্তই নিরর্থক···ক্ষুদ্র · অপদার্থ···

চোখ রগড়াতে রগড়াতে মুন্নু দেখতে পেল, তার সামনেই তিনজন লোক তার দিকে আড়চোখে চেয়ে আছে। যেন তাদের দৃষ্টি বলতে চাইছে, তুমি আবার কে বাবা? উড়ে এসে জুড়ে বসলে?

মুন্নুর মনে হলো, সত্যই সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে। যতই সে-কথা ভাবে, ততই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যদি তার পাখা থাকত, এই মুহূর্তে এখান থেকে সে উড়ে চলে যেতো।

ঠিক এমনি সময় শেঠ প্রভুদয়াল এসে পড়ায় মুন্নু যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলো।

—বলি ও মুন্নু, কোথায় হে?

সেই তপ্ত ধুম্রল অন্ধকারে চোখ টেনে টেনে শেঠজী অনুসন্ধান করেন।

উত্তর দেয় গণপত :

—ঐ যে ওখানে বসে। হারামজাদা আর একটু হ'লে পুড়ে মরেছিল··· তুলসী গরম জলের কড়া নামাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে উনি ঘুরঘুর করছিলেন।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রভুদয়াল মুন্নুকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, চলো আমার সঙ্গে···আমাদের যে-সব খদ্দের আছে, তাদের কাছে আমিই তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। আর তা ছাড়া·· ফেরবার সময় আমি মন্দিরে যাব যেতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই তোমার!

গণপত রাগে গর্ গর্ করতে করতে বলে উঠে. এমনি করেই তুমি সব চাকরগুলোর মাথা খাও!

হিসেবের জাব্‌দা খাতাটা কোলে তুলে নিয়ে প্রভুদয়াল হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ে।

মুন্নু আকুল আগ্রহে অনুসরণ করে।

এক চোখ দোকানের দিকে, আর এক চোখ শেঠজীর দিকে·· পাছে সেই গলি-ঘুঁজি আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়ে যায়···মুন্নু পরম আনন্দে শেঠজীর পেছন পেছন চলে।

কে একজন শেঠজীকে দেখে বলে উঠলো,আরে শেঠজী—বলি ফিরলে কবে?

শেঠজী সেখানে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। সেই অবসরে মুন্নু দু'চোখ ভ'রে দুদিকে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়···তন্ন তন্ন ক'রে সব দেখে···তার পাহাড়ী কৌতূহল যেন বেড়েই চলে···

একটা দোকানের সামনে আসতেই মুন্নুর দৃষ্টি পড়ে···বাবা! কত রকমের যে শিশি বোতল তার আর ইয়ত্তা নেই···

—লালাজী, এবার থেকে এই নতুন ছেলেটাই আপনার দোকানে জিনিস-পত্তর নিয়ে আসবে—

এই বলে মুন্নুকে আগিয়ে ধরেন।

লালাজী গদির ওপর থেকে মুন্নুর ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, আচ্ছা শেঠজী, আচ্ছা!

হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে আবার চলতে আরম্ভ করেন শেঠজী।

মুন্নু পিছু পিছু চলে প্রভুভক্ত কুকুরের মত।

এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে সন্ধ্যার মুখে তাঁরা মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে মুন্নু সারাদিনের ঘটনা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। এ আর এক কোন বিচিত্র জগতে এসে পড়লো সে! মনে মনে ভাবে, যে-বাড়ীতে এসেছি, সেটা তো ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে এখানে মনের সুখে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারবো…আমার অযত্নও এরা ক'রবে না। কিন্তু কারখানায় আমি কি করবো?

তবে বাইরে সে যে ঘুরে বেড়াতে পারবে, রোজ বাজারে যেতে পারবে, তাতেই সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই কয়েকঘণ্টা শেঠজীর সঙ্গে বেড়িয়ে সে কত না বিচিত্র জিনিস দেখে এসেছে…এত জিনিস, মুন্নুর বোধ হয়, দেখে শেষ করা যায় না। বোধহয়…শ্যামনগরে সে কি দেখেছে? তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী…অদ্ভুত আশ্চর্য সব জিনিস! বেড়িয়ে ফেরবার সময়, তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, স্কুলে ভূগোলে সে পড়েছে দৌলতপুরের কথা…"উত্তর ভারতের একটি প্রধানতম শহর"…মনে পড়ে তার, হাঁ, শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব ক'রতেন, সেই সময় সেই প্রাচীন কালে দৌলৎ সিংহ নামে এক রাজপুত মহারাজা এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন…তারপর কত রাজা কত মহারাজা এখানে রাজত্ব ক'রে গিয়েছেন…আপনার মনে একলা ব'সে সে সেই সব রাজাদের চিত্র কল্পনা করে…যেন রাস্তা দিয়ে তাঁরা চলেছেন সুসজ্জিত হাওদার উপরে চ'ড়ে…গলায় গজমতির মালা… জরীর পাগড়ীতে হীরে-মণি মুক্তা সূর্যকরে ক'রছে ঝলমল…

অতীতের স্বপ্নলোক থেকে যখন নিজের ওপর দৃষ্টি পড়ে, নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসে…ভাবে, যদি শেঠজী ট্রেন থেকে

তুলে নিয়ে না আসতেন তাহলে আজ হয়ত ট্রেনের মধ্যে না খেয়ে পড়ে থাকতে হতো···

ভোর না হতেই ঘুমের ঘোরে মুন্নু শোনে, তুলসী তার বাজ-খাঁই গলায় তাকে ডাকছে, মুন্নু···আরে ওঠ্···ওঠ্···

মুন্নুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বুঝতে পারে, তুলসী তার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে মোচড় দিচ্ছে ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য···

—ওঠ্ না!

—বলি ওরে মুন্নু···ওঠনা!

মুন্নু আস্তে আস্তে চোখ খোলে।

—আরে ওঠ্ ছোঁড়া···নইলে শেঠজী রাগ ক'রবে!

তুলসী তার নিজের বিছানা বগলে তুলে নেয়। মুন্নুও উঠে দাঁড়ায়। জানালার কাছে এসে পৌঁছলে তুলসী বলে, আয়, তোকে ধরে নামিয়ে দিই!

আজ আর তার প্রয়োজন হবে না। তাদের গাঁয়ে এর থেকে কত নীচুতে সে লাফ দিয়ে নেমেছে। অনায়াসে সে এক লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়লো।

একটা কাঠের তক্তার ওপর পাশাপাশি দুটো মাংস পিণ্ড শুয়েছিল? তুলসী কাছে গিয়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলো, এই মহারাজ·· বোঙ্গা···ওঠ্ ওঠ্রে।

মুন্নু দেখে নিবিড় ঘুমের মধ্যে দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে আছে, হস্তী-মূর্খ মহারাজ···আর হাবা-কালা বোঙ্গা। মুন্নু চোখ বড়ো ক'রে তাদের দু'জনকে দেখে। তাহলে, ওরা দু'জনেই রোজ এখানে শোয়। ওদের থেকে মুন্নুর বরাৎ ঢের ভাল। সে শেঠজীর বাড়ীর ছাদে শুতে পেয়েছে। সেখানে গণপত আর তুলসী শোয়। আর একটা ব্যাপারে মুন্নু নিজেকে আরো সৌভাগ্যবান মনে করে। ছোট হ'লেও তার নিজের আলাদা একটা বিছানা সে পেয়েছে। এই বিরাট সৌভাগ্য যে কার জন্যে সম্ভব হয়েছে, তা সে

জানে। ঘুমুবার সময় সে শুনেছে শেঠজী আর পার্বতী তার সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন। তাঁদের নাকি ইচ্ছা তাকে পৌষ্যপুত্র ক'রে নেন। বাড়ীতে পা দেওয়া থেকেই পার্বতীকে সে মনে মনে ভালবেসেছে। রাত্রিতে খাবার সময় পার্বতী তাকে রুটীর সঙ্গে ক্ষীর খেতে দিয়েছিলেন। সে-কথা সে ভুলতে পারেনি, কিন্তু মুন্নু মনে মনে ভাবে, উনি এত চুপ চাপ থাকেন কেন? ক্বচিৎ কখনো তাঁর ম্লান বিবর্ণ মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা যায়, তখন মুখটা কি সুন্দরই না দেখায়। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে তাঁকে দু'একটা ছাড়া কথা বলতেই শোনে নি। মুন্নুর কেমন যেন ভয় করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে··· লজ্জাও যে করে না, তা নয়।

তুলসী তখন একটা লোহার হাতার মতন জিনিস নিয়ে একটা উনুন থেকে ছাই তুলছিল। মুন্নুকে ডেকে বলে, সামনের ঐ উনুনটা থেকে ছাই গুলো তুলে ফেল!

মুন্নু দ্বিরুক্তি না ক'রে উনুনের কাছে এগিয়ে যায় এবং উনুনের মুখের ভেতর দিয়ে ভেতরে সটান্ হাত ঢুকিয়ে দেয়।

—উঃ···উহ্···বাবারে···

মুন্নু ছিটকে পেছনে লাফিয়ে পড়ে···যন্ত্রণায় তার মুখ এক নিমিষের মধ্যে যেন বেঁকে যায়···মুঠো ক'রে ছাই তুলতে গিয়ে ছাই-এর মধ্যে একটা জ্বলন্ত কয়লা সে চেপে ধরে···

তুলসীর উচিত ছিল তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া, কিন্তু সে তা করে নি। তাই নিজের ত্রুটী ঢাকবার জন্যে সে বলে ওঠে, দূর মুখ্যু! ও সয়ে যাবে··· দু'দিন ক'রলেই সব সয়ে যাবে!

মুন্নু তখন যন্ত্রণায় হাত মোচড়াতে থাকে কাজ করবার মুখেই এই রকম একটা বাধা পেয়ে তার মনটা মুষড়ে পড়ে।

তুলসী হাসতে হাসতে বলে, আয়, আয়, সেরে গেলে আর কিছু থাকবে না···দুদিন পরেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গিয়েছে···কোন অসুবিধে হচ্ছে না··· তুই বোকা, তাই খালি হাতে ছাই তুলতে গেছিস্! একটা কিছু জোগাড়

করেনে—লোহার কিংবা টিনের…তাই দিয়ে ছাই তুলবি…বুঝলি? ঐ দেখ, ওখানে ওটা কি রয়েছে!

কারখানায় ঢোকবার মুখে একটা পুরানো টিনের ক্যানাস্তারা ভাঙ্গা পড়েছিল—তুলসীর নির্দেশ অনুযায়ী মুন্নু সেটা তুলে নিয়ে আবার ছাই তুলতে আরম্ভ ক'রে দিল।

এমন সময় কারখানার গর্তের উপরের জানালায় গণপতের মুখ দেখা গেল।

—কি…এখনও দেখছি উনুন জ্বালা হয় নি?

সে কথার উত্তরে তুলসী মুন্নুকে তাড়া দিয়ে বলে উঠলো. শিগ্‌গির কর মুন্নু!

এই ভাবে ওপর-ওয়ালাদের নিদেশকে কারখানার কুলীদের ওপর হুকুম রূপে চালাতে তুলসীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই জন্যে কারখানায় একরকম ফোরম্যান-সর্দারের মত সে হয়ে উঠেছিল।

তুলসীর হুকুমে মুন্নু আরো তাড়াতাড়ি ছাই তুলতে সুরু করে! কথার আওয়াজ থেকে সে বুঝেছিল গণপত জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে… ইতিমধ্যেই সেই ঘোড়ামুখো লোকটাকে সে ভয় করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, যেমন ভয় সে করতো শ্যামনগরে তার ভূতপূর্ব মনিবাণী এবং তার কাকাকে। ছাই তুলতে তুলতে সে ভাবে, আমার বরাৎটাই এই রকম। যদিও এখানে ভাল আশ্রয় পেলাম, কিন্তু এই একটা পাজী লোকের জন্যে বোধ হয় সব নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভরসা…যারা আমার আসল মনিব তাঁরা আমাকে রীতি-মত ভালবাসেন…শেঠজীর স্ত্রী রাত্রিতে রুটীর সঙ্গে আমাকে ক্ষীর দিয়েছিল…

এমন সময় ক্ষীরের চিন্তা ভেঙ্গে দিয়ে তুলসী হুকুম করে, ছাইগুলো তুলে এবার ঐ গর্তের ভেতর ফেলে দে!

তুলসী নিজে তখন উনুন ধরাবার চেষ্টা করছিল।

জানালার ওখানে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে গণপত জিজ্ঞাসা করে, মহারাজ আর বোঙ্গা কোথায়? তারা কি এখনও ওঠেনি নাকি?

তুলসী চীৎকার করে ওঠে, ওরে মহারাজ…এই বোঙ্গা…ওঠ্ রে ওঠ্…

—দাঁড়া, আমি নিজে যাচ্ছি! এই বলে গণপত সেখান থেকে নেমে সোজা মহারাজ আর বোঙ্গা যেখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, সেদিকে অগ্রসর হয়।

—এত বেলা হয়ে গেল…কারখানায় লোকজনের দেখা নেই…এখনও পর্যন্ত প'ড়ে প'ড়ে ঘুমচ্ছেন লাটসাহেবরা…! যে ক'দিন এখানে ছিলাম না, খুব মজা ক'রে নিয়েছে সবাই…কারখানা যে কি করে চলতো তাই ভাবি… দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার একজনও লোক নেই…যাদের জাতের ঠিক নেই …তাদের কিছুরই ঠিক নেই…

তক্তার কাছে গিয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠে, এই আঁস্তাকুড়ের কুকুরের দল…ওঠ্—ওঠ্…

বোঙ্গা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়লো কিন্তু মহারাজ যেমন অসাড় পড়েছিল তেমনি পড়ে রইলো।

মহারাজকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে গণপত চীৎকার ক'রে ডাকে, এই হাতীর বাচ্ছা…ওঠ্…

নিদ্রালু মাংস-পিণ্ডের ভেতর থেকে ঘুমে-জড়ানো আওয়াজ এলো, এই যে উঠচি হুজুর! কিন্তু পরক্ষণেই আবার চুপ্‌চাপ…ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

কাছেই একটা কাঠের টুকরো পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে সেই ঘুমন্ত মাংস-পিণ্ডের ওপর বেশ কয়েক ঘা দেবার পর দেখা গেল, ফল ফলেছে। রক্ত-বর্ণ চোখ খুলে মহারাজ উঠে বসলো। এবং ঘন ঘন হাই তুলতে লাগলো। মনিবের কাষ্ঠ-প্রীতি যে তার অঙ্গে বিশেষ কোন বেদনার সঞ্চার করেছে, তার ভাবগতিক দেখে তা বোঝা গেল না।

প্রভাতে উঠেই দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালনের ফলে গণপত হাঁপিয়ে উঠেছিল।

—রোদে সারা দেশ পুড়ে যাচ্ছে আর তুমি শুয়োর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছো? হাঁপাতে হাঁপাতে গণপত গর্জন ক'রে ওঠে।

—কাঠ না হলে কি কাঠের ঘুম ভাঙ্গে? ফের যদি দেখি এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছো, তাহ'লে এরপর হাড় গুড়ো ক'রে দেবো!

এই ভাবে কারখানাকে জাগিয়ে তুলে, দরজার দিকে ফিরতেই মুন্নুর চোখে চোখ পড়ে গেল। মুন্ন ভয়-সঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ছিল··· তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

—এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখছিস কি? কাজ নেই? যদি কারুর সঙ্গে এখানে দলে ভেড়ো···তা হ'লে তোমারও ভাগ্যে এই রকম জুটবে···নিজের যা কাজ মুখ বুঁজে তা ক'রে যাবে নইলে এই চ্যালা কাঠ তোমারও পিঠে ভাঙ্গবো, বুঝলে?

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কড়ানাড়ার আওয়াজ এলো। গণপত নিজেই এগিয়ে গেল দরজা খুলে দেবার জন্যে, কুলী-কামিনরা আসছে।

দাঁড়া, দাঁড়া, বুড়ো শালিকের দল!

দরজা খুলতেই প্রথমেই লাচী এসে ঢুকলো···ছোট্ট মোটা-সোটা, গড়ন-পিটন মন্দ না···

গণপতকে দেখেই মুচকে হেসে চোখ ঘুরিয়ে বলে উঠলো, কি ভোর না হতেই মার-ধোর আরম্ভ করেছ তো? কোথায় এখন ঠাকুর-দেবতার নাম নেবে, না, গালাগাল আর মার-ধোর!

লাচীর পেছনে আরো দু'জন কামিন এসে ঢুকলো···মাথার চুল সাদা··· দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে শরীর গিয়েছে বেঁকে···মুখে উপবাস আর অনশনের দীর্ঘ-রেখা···

—রাম···রাম···শেঠজী!

লাচীকে দেখে গণপতের উষ্মা নিমেষের মধ্যে যেন উড়ে গেল··· কোন কথার আর জবার না দিয়ে তার জায়গায় এসে হুঁকো কল্কের বন্দোবস্ত করতে বসে গেল।

লাচী এগিয়ে এসে তুলসীকে ডেকে বল্লো, এই তুলসী, আমাদের পিদিমে তেল নেই, তেল দিয়ে দে!

তারা যেখানে বসে কাজ করে, দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় না।

তুলসী তখন উনুন ধরাবার জন্যে শুকনো কাঠের ওপর কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরাবার চেষ্টা ক'রছে।

লাচীর কথার উত্তর গণপতই দেয়, যা, যা, কাছে বসগে যা·· সব হচ্ছে···

ছিলিম তৈরী ক'রে গণপত হুঁকোতে মুখ দেয়।

মুন্নুর যেন দম আটকে আসে গণপতকে যত দেখে তত যেন তার শ্বাস-রোধ হয়ে আসবার মতন হয়···এত কাছাকাছি এই কষাই-এর মতন লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তার শরীর যেন ঘিন্ ঘিন্ করে।

মুন্নুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই গণপত আবার চীৎকার ক'রে ওঠে, এই শূয়োরের বাচ্ছা, দাঁড়িয়ে রইলি যে? আরো দুটো যে উনুন পড়ে রয়েছে, তা থেকে ছাই তুলবে কে?

লাচী এগিয়ে এসে ঝংকার দিয়ে ওঠে, রাতদিন ওদের পেছনে লেগে আছিস কেনরে হারামী? ওঠ্···কোথায় আপেল আছে, গুণে দিবি চল্ নইলে এখুনি তো বলবি যে আমি চুরি করেছি!

হুঁকো হাতে গণপত নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটা কুঠুরীতে ঢোকে।

মুন্নু নিঃশব্দে উনুনের ধারে গিয়ে ছাই তুলতে থ'কে! সেই অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মন যেন অচল হয়ে আসে···সে কিছুই ভাবতে পারে না।

কারখানার কাজ সুরু হয়ে যায়।

ভিজে অন্ধকারের সঙ্গে স্যাৎসেঁতে মাটীর গন্ধ···ধোঁয়া·· পচা ফলের দুর্গন্ধ···সর্ষের তেল···নানান রকমের মসলার ঝাঁজ···সব শুদ্ধ মিলে একটা বিচিত্র বিস্বাদ বাতাস তার নাকে এসে লাগে···ভাবে, অসম্ভব জায়গা···হয়ত' কয়েকদিন পরেই সব স'য়ে যাবে···এই তো এরা সবাই কাজ ক'রছে··· এরাও তো তার মত একদিন পাহাড় থেকে এসেছিল···

হঠাৎ জলন্ত উনুনের দিক থেকে চাপা গরম হাওয়ার ঝলক তার চোখে মুখে এসে লাগে···ভেঙ্গে যায় দিবা-স্বপ্ন—

সেই সঙ্গে সামনের কুঠুরী থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এসে সোজা তার নাকের ভেতর ঢোকে নাকের ভেতর দিয়ে গলায় গিয়ে কুটকুট ক'রতে

থাকে…বহু চেষ্টা ক'রেও সে কাশি দমন ক'রতে পারে না…কাশতে সুরু করে। কাশতে কাশতে তার নিজের কানে তালা লেগে যায়। সেই অবস্থায় সে শুনতে পায় কাশতে কাশতে আর একজন কার যেন দম আটকে যাচ্ছে, অথচ সেই অবস্থায় চীৎকার ক'রে গালাগাল দিচ্ছে…কথায় আর কাশিতে মিশে জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে

—শূয়োরের বাচ্চা…হারামজাদার দল ..এই প্রভু দয়াল! এই বেজন্মা…

মুন্নু কান খাড়া ক'রে শোনে। সেই কাশি আর আওয়াজ থামার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে…গলার আঁওয়াজ থেকে মুন্নু আন্দাজ করে, নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের গলা…

—মরণ হয় না তোদের? অখাদ্য অলপ্পেয়ে নেমক-হারামের দল! যত সব পাহাড়ী চাষা? আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল…মর্ না মর্…ওরে বাবা…মরে গেলাম…ধোঁয়া…ধোঁয়া…ঐ ধোঁয়ায় কবে পুড়ে মরবি তোরা? ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিলো…এই সেদিন বাড়ীঘর-দোর চুণকাম ক'রেছি গো…ধোঁয়ায় সব জ্বালিয়ে দিলো…জ্বালিয়ে দিলো গো…সেই সঙ্গে জ্বলে মর্ না তোরা…

হঠাৎ মুন্নুর মনে হল, একি তার ভূতপূর্ব মনিবাণীর কণ্ঠস্বর? সে কি স্বপ্ন দেখছে? ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে গিয়ে ধোঁয়ায় সে কিছুই দেখতে পায় না। ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে তুলসীর আবছা চেহারা চোখে পড়ে। মনে হলো জিজ্ঞাসা করে, কে চীৎকার ক'রছে।

তুলসী যেন বুঝতে পেরে তার কাছে এসে কানের কাছে চুপি চুপি বলে চুপ্! বাইরে তখন রায় বাহাদুর, স্যার টোডরমল বি-এ, এল-এল-বি, উকিল, সিটি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য চীৎকার ক'রছেন, বলি কোথায় রে প্রভু-দয়াল? গণপত?

তাঁর কণ্ঠস্বর থামতে না থামতে আবার গর্জে ওঠে সেই নারী-কণ্ঠ…লেডী টোডরমল,—কোথায় তারা? কোথায় গেল নেমক-হারামেরা?

এবার আর একটি নতুন কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো…স্যার টোডরমলের যুবক-পুত্র মিঃ রামনাথ…

—বলি সাড়া দিচ্ছিস্ না কেন হারামজাদারা ? এদিকে বেরিয়ে আয়… রায় বাহাদুর যে ডাকছেন, খেয়ালই নেই ! হয় আজ এর একটা বিহিত করবো, নয় কালই এখান থেকে তোদের তুলবো !

সমস্ত কারখানা নীরব নিস্তব্ধ। শুধু আধ-অন্ধকারে ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, নামছে, ঘুরছে।

এইবার সুরু হয় প্রত্যুত্তর।

গণপত পাঁচিলের কাছে এগিয়ে এসে চীৎকার ক'রে বলে, যাও… যাও ‥ রায় বাহাদুর আছ ত' নিজের বাড়ীতে আছ…যা পারো কোরো…

মিঃ রামনাথ গর্জন ক'রে ওঠে, বটে ! ভাল কথা মনে ধরলো না ? ওখান থেকে চেঁচাচ্ছিস্ কেন শূয়রের বাচ্ছা ? বাপের বেটা হ'স তো বাইরে বেরিয়ে আয়…দেখিয়ে দিচ্ছি কি করতে পারি…

পুত্রকে শান্ত ক'রে লেডী টোডরমল বলেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে নিজের মান নষ্ট করবার কি দরকার ! সত্যই তো, ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলাই আমাদের ভুল হয়েছে !

এইখানেই ব্যাপারটা সেদিনকার মত শেষ হয়ে যেতো…কারণ স্যার টোডরমল তখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন…টোঙ্গা অপেক্ষা ক'রছিল। কিন্তু শেষ হতে দিল না গণপত।

সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে, রামনাথ যেই টোঙ্গায় উঠতে যাবে অমনি তাকে টেনে ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

পতনোন্মুখ পুত্রকে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রতে ক'রতে স্যার টোডরমল চীৎকার ক'রে উঠলেন, এত বড় আস্পর্ধা ! বটে ?

লেডী টোডরমল আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

মিঃ রামনাথ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে গণপতের গলার জামা মুঠো ক'রে ধ'রে তাকে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিল যে পয়সা খরচ ক'রে দিনের পর দিন বিদ্যা হিসাবে সে বক্সিং শিক্ষা করেছিল।

কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে মুন্নু, তুলসী, বোঙ্গা সকলে বাইরে ছুটে এলো।

গণপত মুখ গুঁজে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নেবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে রামনাথকে আক্রমণ করলো, কিন্তু ঘুষি পেরিয়ে সে তার কাছে পৌঁছতেই পারলো না। হঠাৎ একটা ঘুষি সোজা তার নাকের ওপর লাগাতে নাক ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো।

স্যার টোডরমল তখন বাড়ীর দরজার ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, রাগে এবং উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপছে। রক্ত দেখে তিনি বলে উঠলেন, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রামনাথ।

এধারে আশে পাশের বাড়ীর জানালায় পুর-মহিলারা পর্দা সরিয়ে আতঙ্কিত বিস্ময়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

হঠাৎ মুন্নু তুলসী আর বোঙ্গাকে ঠেলে প্রভুদয়াল সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো…দু'হাত দিয়ে গণপতকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে সে একেবারে রামনাথের সামনা-সামনি গিয়ে বলে উঠলো, আপনি আমাকে মারতে পারেন, যা খুসী ক'রতে পারেন, করুন বাবুজী। কিন্তু ওকে কেন? ওকি মানুষ। একটা অজ-মুখ্খু।

অবস্থা বুঝে লেডী টোডরমল পুত্রকে ডেকে নেবার জন্যে বলে উঠলেন, চলে আয়। কি দরকার ওদের গায়ে হাত তুলে হাত ময়লা করার। ছোট লোক—দু'টো পয়সার মুখ দেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে গণপতকে টানতে টানতে কারখানার ভেতর নিয়ে এসে প্রভুদয়াল বলে, এভাবে লড়াই করা চলে না, বুঝলে গনপত …ওদের সঙ্গে যুঝতে হয় যুঝবে, আমাদের বাড়ীর মালিক…আমরা নই… উত্তম-মধ্যম খেলে তো ঘা কতক…

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ঘোড়ামুখোর মুখ দিয়ে তখন কোন কথা বেরুচ্ছে না। দু'হাত দিয়ে কুলীদের ঝটকা মেরে সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। অপমানের জ্বালাটা কুলীদের ওপরই প্রথম ধাক্কায় গিয়ে পড়ে।

হেসে প্রভুদয়াল বলে, ঠাণ্ডা হও। ঠাণ্ডা হও। ও ভাবে রাগের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে নেই।

ঝগড়ার সময় গণ্ডগোলে মুন্নু দুটো পিপের মাঝখানে কাদায় পড়ে যায়… তুলসীর হাঁটু ছিড়ে যায়… বোঙ্গা গর্তের মধ্যে পা পিছলে পড়ে।

কারখানায় ফিরে যে-যার কাজে আবার লেগে যায়…

মুন্নুকে ডেকে প্রভুদয়াল বলে, তুই একবার বাড়ীর ভেতর যা…তোকে ডাকছে

হঠাৎ তাকে কেন ডাকা হচ্ছে, বুঝতে না পেরে মুন্নু শেঠজীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে…শেঠজী ডান হাতটি মুখের কাছে এনে ইঙ্গিত ক'রে জানায় বাড়ীর ভেতর তার জন্যে কিছু সু-খাদ্যের বন্দোবস্ত আছে।

মুন্নু আনন্দে সব ভুলে যায়!

গণপতের সঙ্গে স্যার টোডরমলের পুত্র মিঃ রামনাথের এই যে একটা ছোট-খাটো যুদ্ধ হয়ে গেল, প্রভুদয়াল তার স্বাভাবিক শান্তি-প্রিয়তার দরুণ ভেবেছিল, রায় বাহাদুরের কাছে পরে হাত ধরে মিটমাট ক'রে নিলেই চুকে যাবে, কিন্তু স্যার টোডরমল ব্যাপারটাকে অত সহজে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। ভারত সরকারের অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর রীতিমত খাতির এবং প্রতিপত্তি আছে। তিনি এত সহজে ছেড়ে দেবেন কেন?

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল ধরে স্যার টোডরমল দৌলতপুর আদালতে বিপুল বিক্রমে আধিপত্য ক'রে এসে সরকারের সুনজর অর্জন করেন। আদালতে তাঁর কেরামতিকে ভারত-সরকার স্বীকার করলেন, দৌলতপুরের সরকারী উকিলের পদে তাঁকে নিযুক্ত ক'রে। সে পদ থেকে যদিও বহুদিন হলো তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন, তবুও সরকার মহলে তাঁর খাতির বিন্দুমাত্র কমে নি, কারণ যুদ্ধের সময় তিনি বহুভাবে সরকারের বহু সাহায্য করেন এবং বড়লাটের ফাণ্ডে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণের দুরূহ কর্তব্য-পালনে তিনি একনিষ্ঠ সাধকের মত যে-ভাবে সরকারের অনুজ্ঞা

পালন ক'রে এসেছেন, তার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত-সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে। যুদ্ধের সময় সরকারের কাজে তিনি যে-ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ ভারত-সরকার তাঁকে ভারত সাম্রাজ্যের নাইট-কমাণ্ডারদের সুনির্বাচিত দলে স্থান ক'রে দেয়। আর তাঁর নাগরিক কর্তব্য-বোধের দরুণ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটীর মনোনীত সভ্যের আসন তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং এহেন উপাধি-ধারী ব্যক্তিকে দৌলতপুরের নিরীহ জনসাধারণ যে একজন মহাপুরুষ বলে মেনে নেবে তাতে আর সন্দেহ কি? যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই জানে না মিউনিসিপ্যাল কমিটীই বা কি আর নাইট-কমাণ্ডারই বা কাদের বলে।

গত রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় স্যার টোডরমল সপরিবারে দৌলতপুর দুর্গের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেন, তার ফলে অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে গালাগাল দিয়েছে। কিন্তু ভক্তি করুক আর নাই করুক, সকলেই তাঁকে ভয় করতো এবং যখন তিনি তাঁর মান্ধাতা আমলের টোঙ্গা খানিতে মক্ষিকা-উপদ্রুত অতি-বৃদ্ধ পক্ষীরাজকে জুরে শহরের মধ্যে দিয়ে হাওয়া খেতে বেরুতেন, তখন লোকের মনের ভেতর যাই থাকুক না কেন, তারা সামনাসামনি পড়লে হাত জোড় ক'রে "নমস্তে রায় বাহাদুর" জানাতে ভুল করতো না। স্যার টোডরমল তাদের সেই ভক্তি-প্রদর্শনের আড়ালে তাদের আসল মনোভাবের পরিচয় যে জানতেন না তা নয়, এবং তবুও যে তিনি তাদের মধ্যে বাস করতেন, তার একমাত্র কারণ হলো, তাঁর যে তিনখানি বাংলো শহরের বাইরে সাহেব-পাড়ায় ছিল, সে তিনখানিই তিনি সরকারী-মহলের বড় সাহেবদের ভাড়া দিয়েছিলেন এবং তা থেকে মাস গেলে বেশ মোটা টাকাই পেতেন। তা ছাড়া লেডী টোডরমল লেখাপড়া জানতেন না···সেইজন্যে সাহেব-পাড়ায় সাহেব প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস কররার সম্ভাবনায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন। এবং রায়বাহাদুরের গৃহিণী হিসাবে এখানে পাড়ার মেয়েদের ওপর যে অধিপত্য তিনি চালাতেন, সেখানে তা সম্ভব হবার আশা খুবই কম ছিল। তবে এক বিশেষ অসুবিধার

কারণ হয়ে উঠলো, প্রভুদয়ালের এই চাটনীর কারখানা। কিন্তু যখনি উঠে যাবার চেষ্টা করেছেন, তখনই পাড়ার লোকেরা হুজুরের হাতে পায়ে ধরাধরি করেছে—এতবড় একজন লোকের আওতায় তারা বাস করবার সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন? তাই আর সে-পাড়া ছেড়ে তাঁদের ওঠা হয় নি। কারখানা তুলে দেবার জন্যে কারখানার বাড়ীর মালিক দত্তদের তিনি বারবার অনুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু দত্তরা সে-অনুরোধ রাখতে পারে নি। একটা পোড়া এঁদো বাড়ী থেকে মাসে মাসে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তা তারাই বা ছেড়ে দেবে কেন? তাই যখনি সুযোগ পান স্যার টোডরমল চেষ্টা করেন ভয় দেখিয়ে, হুমকী দিয়ে কারখানা ওয়ালাদের বিতাড়িত ক'রতে। তারই এক চেষ্টার ফলে সেদিন সেই খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল। অথচ একটা চিমনী তৈরী ক'রে নিলেই যে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তা কোন পক্ষেরই মগজে আসে না।

তাই সেদিনকার ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্যার টোডরমল স্থির করলেন ব্যাপারটা সেখানেই নিষ্পত্তি করলে চলবে না—পাবলিক হেল্‌থ অফিসর ডাঃ এডোয়ার্ড মার্জরিব্যাঙ্কস্ যেহেতু তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটীতে তাঁর সহকর্মী—তিনি ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি গোচর করবেন এবং তাঁর সহায়তায় ছোট লোকদের এবার রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেবেন।

ভাল ক'রে মুসাবিদা ক'রে তিনি ইংরেজী ভাষায় বন্ধুকে একখানি পত্র লিখলেন:

পত্রখানি অনুবাদ ক'রলে, এই রকম দাঁড়ায়—

ডাঃ এডোয়ার্ড মার্জরিব্যাঙ্কস্ এসকোয়ার, এম-এ, ডি-পি-এইচ, এল-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এণ্ড এফ (অক্সোন্) সমীপেষু,

নিবেদক রায় বাহাদুর স্যার টোডরমল বি-এ, এল-এল-বি, কে-সি-আই-ই, এ্যাডভোকেট; হাইকোর্ট, পাঞ্জাব; অবসর প্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, দৌলতপুর।

মান্যবরেষু,

পত্র-বিনিময়ের দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরের আত্মীয়তা রক্ষা করিবার এবং অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার যে রীতি বন্ধু-সমাজে প্রচলিত আছে, আমি জানি সে-রীতি যথাযুক্তভাবে পালন না করিয়া আমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছি এবং সে অন্যায়ের মাত্রা এমন গুরুতর যে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকার পর্যন্ত আমার নাই। সেই জন্য, অদ্য এই পত্র-যোগে পুনরায় আপনার মহৎ-সকাশে উপস্থিত হইতে আমি বিশেষ লজ্জাই অনুভব করিতেছি। তথাপি একান্ত আন্তরিকতার সহিত আপনার সমীপে নিবেদন করিতেছি যে,মিউনিসিপ্যাল কমিটীর ভেতরে কিম্বা বাহিরে যেখানেই আপনি অবস্থান করুন না কেন, আমার অন্তরের অন্তরতমস্থলে আপনার নাম ও স্মৃতি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।

অতঃপর আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি, আমি আপনার মহানুভবতায় যদি একবার আমাদের এই বিড়াল-খাগী নামে পরিচিত গলিতে পদার্পন করেন, তাহা হইলে স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন, আমার বাড়ীর সংলগ্ন এক চাটনীর কারখানা হইতে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া এতদঞ্চলে কি অনর্থই না সৃষ্টি করিতেছে।

গত ২৬শে তারিখের সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই আমার পুত্র যখন উক্ত কারখানার মালিককে এই ধোঁয়ার উৎপাত সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যায় সেই সময় কে একজন গণপত কারখানার ভেতর হইতে আসিয়া শ্রীমানকে আক্রমণ করে। যদিও আমার বীরপুত্র মুষ্ঠাঘাতে উক্ত গণপতের নাসিকা-গ্রভাগ নিম্নমুখী করিয়া দিয়াছে, তথাপি সংঘর্ষের দরুণ শ্রীমানও গুরুতররূপে জখম হইয়াছে, শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে এবং আঙুল এখনও আরষ্ট রহিয়াছে।

সরকারের খেদামতে অধীনের সেবার কথা আপনার অবিদিত নাই। মহামান্যবর বড়লাটের সময় তহবিলে আমি এককালীন বিশ সহস্র মুদ্রা দান করি—এবং তাহার বিনিময়ে আমি মহা-গৌরবান্বিত নাইট উপাধি লাভ

করিয়াছি। অশেষ মঙ্গলময় ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া আশা করি আপনি আমাকে এই ধূম্র-উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। জানিবেন, ইহা আমার ও আমাদের বিশেষ দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং বেদনার কারণ হইয়াছে।

মিসেস মার্জরিব্যাঙ্কসকে আমার স্ত্রীর বিনীত সালাম জানাইবেন।

ইতি

আপনার একান্ত চির-অনুগত ভৃত্য

টোডরমল

[তিন]

কিন্তু এ হেন চিঠি হেলথ অফিসার সাহেব গ্রাহ্যই করলেন না।

স্যার টোডরমল যখন দেখলেন ডাক্তার মার্জরিব্যাঙ্কস তাঁর পত্রের উত্তরও দিলেন না, গলি-পরিদর্শনেও এলেন না, তখন আহত-অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সামনের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিসিপ্যাল কমিটীর যে সাধারণ অধিবেশন বসবার কথা আছে, তার জন্যে স্যার টোডরমল উৎসুক অপেক্ষায় রইলেন।

সেদিন প্রাতঃকালেই তিনি তাঁর সহিসকে পাশে নিয়ে বড় গাড়ীটা হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। টোঙ্গা ছাড়া রায় বাহাদুরের আর একটা গাড়ী ছিল, সেটা বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করতেন। সরকারী বাগানে একটু হাওয়া খেয়ে তিনি টাউন হলের দিকে রওনা হলেন। কারণ সেই খানেই সাধারণ অধিবেশন বসবে।

পাছে সভায় পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় তিনি টাউন হলে পৌঁছে দেখলেন সভা বসবার একঘণ্টা আগে এসে গিয়েছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে তখন সকাল থেকেই সূর্যের তেজ রীতিমত প্রখর। তার ওপর ভেতরে তিনি রাগে জ্বলছেন। ভেতরের আর বাইরের গরমে

রীতিমত ঘর্মাক্ত হয়ে তি টাউন হলের বারাণ্ডায় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই তিনি সভা-গৃহে প্রবেশ ক'রলেন।

ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘর শূন্য...তিনি একাই উপস্থিত। আধ ঘণ্টা ধরে সেই একা ঘরে তিনি বসে রইলেন। তবুও কেউ আসে না। এক ঘণ্টা একা বসে থাকার পর দেখেন, ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী প্রবেশ করছে, কমিটীর পিয়ন। ঘরে ঢুকে সে চেয়ার-টেবিলের ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

তারও আধঘণ্টা পরে প্রবেশ করলো কমিটির সেক্রেটারী, মিঃ হেমচাঁদ বি-এ (ক্যান্টাব)—তরুণ যুবা, চোখে পাতলা চশমা। ঘরে ঢুকে রায় বাহাদুরকে দেখেই সে মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালো। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দেখলেই তার মাথা আপনা থেকে নীচু হয়ে যেতো কারণ সে জানতো কমিশনারদের কৃপার ওপরেই তার চাকরী নির্ভর করছে।

পকেট থেকে রূপোর চেনে বাঁধা সোনার ঘড়িটা বের ক'রে একবার দেখে নিয়ে স্যার টোডরমল বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, সারে এগারোটা বাজে... অথচ কারুর দেখা নেই।

হেমচাঁদ তখন তার ছোট্ট টেবিলের কাছে বসে গত সভার বিবরণী তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করতে লেগে গিয়েছে। স্যার টোডরমলের উত্তরে ঘাড় তুলে জানায়, আপনি তো জানেন লালাদের রকম-সকম। সময়ের জ্ঞান যাদের নেই, তারা কি ক'রে শিখবে স্বায়ত্ত-শাসন, বলুন?

মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে কমিশনার হয়ে যারা আসে, তাদের স্যার টোডরমল বেশ ভাল করেই জানেন...অধিকাংশ হলো দোকানদার...ব্যবসা ক'রে কিছু পয়সা করেছে...কিন্তু নাম-সই করবার বিদ্যা তাদের কারুরি নেই ...দরকারি কাগজ-পত্রে সই করতে হলে, তারা বুড়ো আঙুলের ছাপই ব্যবহার করে এবং সভায় যে সব জিনিস আলোচনা করা হয়, তার বিন্দু-বিসর্গও তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না। সেই সূত্রে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ স্যার টোডরমল আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন, দত্তদের বিরুদ্ধে তিনি যে

অভিযোগ নিয়ে আসবেন, তার গুরুত্ব তারা কি তাহলে বুঝতে পারবে? শুধু দত্তদের বিরুদ্ধে নয়, আজ তিনি স্বয়ং হেল্‌থ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন…বাড়ীতে তিনি রীতিমত মুসাবিদা ক'রে এক কড়া বক্তৃতা মুখস্থ ক'রে এসেছেন…বর্তমান হেলথ অফিসারকে সরিয়ে নতুন একজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে আনতে হবে…এই পাঞ্জাবী লালারা কি তাঁর সব যুক্তি বুঝতে পারবে? তার ওপর, তাঁর বক্তৃতা তিনি তৈরী ক'রেছেন হিন্দুস্থানীতে… তারা কি তা ভাল বুঝতে পারবে? রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েন স্যার টোডরমল।

এমন সময় হঠাৎ হেমচাঁদ তাঁকে ডেকে নিয়ে বলে, দেখুন, ডাঃ মার্জরি-ব্যাঙ্কস্ আমাকে আপনার চিঠিটা দেখিয়েছেন…ঐ যে আপনাদের পাড়ায় চাটনীর কারখানার ধোঁয়ার উৎপাৎ সম্বন্ধে…তার অবশ্য সময় বড় কম…আর এ-ধরণের তদারকে তিনি একদমই যান না…তবে তিনি বলেছেন, আপনার খাতিরে আপনার সঙ্গে একবার যেতে পারেন। অবিশ্যি, আমি দেখছি, স্বায়ত্ত-শাসন-বিধির ৩১৭ ধারার ১০নং উপধারায়…

স্যার টোডরমল হেমচাঁদকে শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠেন, দেখুন, আজকের সভায় আমি একটা প্রস্তাব আনবো…আপনি আজকের কর্মসূচীতে সেটা লিখে নিন…বর্তমান হেল্‌থ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ…

—শুনুন ··শুনুন…রায় বাহাদুর! এসব ব্যাপার এই মিউনিসিপ্যাল সভায় আলোচনা করা, আপনি তো জানেন স্যার, যাকে বলে অসম্ভব। অধিকাংশ সদস্য হলো সরকারের ধামা-ধরা, তারা আইনই বলুন…আর নাগরিক বিজ্ঞানই বলুন…তার কিছুই ধার ধারে না। লালা চিরঞ্জীবলাল তিন ঘণ্টা ধরে আবোল-তাবোল বকবেন…শেখ ইফতিখারউদ্দীন দাড়ি নেড়ে নেড়ে এক ঘণ্টা ধরে যা তা গালাগাল দেবেন…সর্দার খড়গ সিং বাকি সময়টা উচ্ছ্বাস করবেন…আপনার প্রস্তাব ভোটে দেবার সময়ই পাবেন না। আসল কথা কি জানেন, একজন ইংরেজ হেল্‌থ অফিসর, তাকে সরাতে কেউ চাইবে না…আর সরকার স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থাই তুলে দেবে যদি দেখে তার

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটছে। তাই আমি যা বলছি, শুনুন...ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কস্‌কে আমি অনুরোধ করবো, সভা হয়ে গেলে তিনি আপনার সঙ্গে গিয়ে একবার তদারক ক'রে আসবেন। আপনিও সরকারের একজন বন্ধু লোক...বুড়ো বয়সে একজন ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি আপনার কোন সুবিধা হবে?

সেক্রেটারীর যুক্তি স্যার টোডরমলের অন্তরে গিয়ে লাগলো...সত্যিই তো, প্রকাশ্যভাবে এইসব অপ্রিয় ব্যাপার আলোচনা ক'রেই বা কি লাভ; সেক্ষেত্রে যদি ভালয়-ভালয় মিটে যায়, মন্দ কি! তাই হেমচাঁদের উপদেশের উত্তরে তিনি জানালেন, বেশ, ভাল কথা...

একজন ইংরেজের পাশে বসে, মাথা উঁচু ক'রে তিনি পাড়ায় ঢুকছেন ...পাড়ার লোকেরা চোখ বড় ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে ...এক নিমিষের মধ্যে স্যার টোডরমল সেই মহাদৃশ্য কল্পনা ক'রে নিলেন। মনে মনে, ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতে চাইলে কি হবে, ইংরেজের পাশে দাঁড়াতে পেলে, আজও পর্যন্ত আমাদের অনেকের দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরণ জেগে ওঠে...

স্যার টোডরমল প্রীত হয়েই বল্লেন, বেশ, তাই হোক! তখন হেমচাঁদ গিয়ে ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কস্‌কে ডেকে নিয়ে এলো।

—গুড মর্ণিং স্যার টোডরমল। আপনার চিঠির উত্তর দিতে সময় পাইনি বলে বড়ই দুঃখিত...লাহোরে চলে গিয়েছিলাম জিমখানার হয়ে পোলো খেলবার জন্যে।

নিজের আভিজাত্যের কথা ভুলে গিয়ে স্যার টোডরমল বেয়ারাদের মতন ঘাড় হেঁট ক'রে সাহেবকে প্রত্যভিনন্দন জানান।

—আসুন, আমার গাড়ীতে...আন্‌কোরা নতুন ফোর্ড...আমার স্ত্রী হোম থেকে এই সবে মাত্র আনিয়েছেন...নিশ্চয়ই আপনার পছন্দ হবে...

ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কস্‌ স্যার টোডরমলকে আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণের পেছনে অবশ্য সাহেবের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চান না স্যার টোডরমলের

ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁর পাশে বসে যান, আর যত সব 'নিগার' তাঁর দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে থাকে।

নিজের গাড়ীতে সাহেবকে পাশে নিয়ে বীর-গর্বে পাড়ায় ঢুকবেন বলে যে আশার ফানুস মনে মনে উড়াচ্ছিলেন, এক নিমেষে তা ফেটে চুপসে গেল। কি আর করা যাবে? স্যার টোডরমল সাহেবের মোটরে গিয়ে ঢুকলেন। সাহেব তাঁর পাশে এসে বসলেন।

ড্রাইভার সাচ্ছা সিং জিজ্ঞাসা করলো, রায় সাহেবের বাড়ী হুজুর?...হাঁ।

কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সাহেব বুঝলো যে, এই গাড়ী নিয়ে তো সে-গলির ভেতর ঢোকা যাবে না। অগত্যা একান্ত বিমর্ষ অন্তরে গলির মুখেই তাঁকে নেমে পড়তে হলো। সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে তাঁদের পিছু পিছু চলতে সুরু ক'রে দিল। কেউ কেউ আবার কাছে এসে ভিক্ষা চায়। চাপা রাগে সাহেবের লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে।

গলিতে ঢুকতেই দু'ধারে রয়েছে যত রাজ্যের ময়লা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা কলসী, পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাবার, পচা ইঁদুর, গোবর...সাহেবের পা ফেলে চলতে যেন কাঁটা ফুটছিল।

তার ওপর আবার স্যার টোডরমল সেদিকেই সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলে উঠলেন, দেখুন স্যার, মিউনিসিপ্যালিটীর ঝাড়ুদাররা কি রকম কাজের গাফেলতি করে!

ঠিক সেই সময় সামনের এক বাড়ী থেকে চুড়ি-পরা দুটী হাত একরাশ নোংরা জিনিস ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল...একেবারে সাহেবের গা ঘেঁষে গিয়ে পড়লো। সাহেব রাগে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চলতে লাগলেন।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতে আর এক বিপত্তি ঘটলো। সামনের এক বাড়ীতে দোতলার পাইপ ফেটে গিয়েছিল...সেই ফাটা পাইপ থেকে ঝরনার মত জল রাস্তায় নির্বিবাদে এসে পড়ছে...সাহেব কোন রকমে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন...

মনে মনে তখন অভিশাপ দিচ্ছিলেন, এই ভারতবর্ষ...এই নরক...

—এই স্যার, আমার বাড়ী···আর এই সেই কারখানা···

বাড়ীর সামনে এসে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েন।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাহেব বলেন, আই সী!

লেডী টোডরমল বাড়ীর ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে আসেন। মুখে ওড়নাটা টেনে দিয়ে শেঠজীর বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে তিনি চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, কই···কোথায় গেলি···এবার আয়, বেরিয়ে আয়!

ডাঃ ম্যার্জরিব্যাঙ্কস্ কারখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন।

দরজার গোড়াতে ভেতর দিকে মুন্নু বসেছিল। হঠাৎ একজন সাহেবকে আসতে দেখে, সে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, গুড্ নুন!

এইটুকু ইংরেজী শ্যামনগরে সে ছোটবাবুর কাছে শিখেছিল···সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে কি ক'রে সাহেবদের অভিবাদন জানাতে হয়! সুযোগ বুঝে সে কাজে লাগিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা অর্ধ-নগ্ন নেটিভ ছেলের মুখ থেকে সেই বিচিত্র অভিবাদন শুনে সাহেব প্রথমে একটু অবাক হয়েই গিয়েছিলেন। তবে অভ্যাসবশতঃ উত্তরে জানালেন, গুড্ মর্ণিং।

উঠোনের চারদিকে বিক্ষিপ্ত পিপে, ফলের ঝুড়ি···বড় বড় লোহার কড়া ···সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব দেখলেন···ঘামে তাঁর ভেতরের জামা ভিজে উঠছিল···রুমাল বার ক'রে ঘন ঘন মুখ মোছেন···কিন্তু একবারও রুমাল চোখের ওপর নিয়ে যান না···ছেলেবেলায় তিনি পেনী-সিরিজের রোমাঞ্চকর সব ডিটেকটিভ কাহিনীতে ভারতবর্ষের এই সব নিগার ছেলেদের কথা পড়েছিলেন···যে-কোন সময় তারা ছোরা বের ক'রে তোমাকে পেছন দিক থেকে খুন ক'রে ফেলতে পারে···তাই পেছনের জনতার ভয়ে সাহেব চোখের ওপর রুমাল নিয়ে যেতে পারছিলেন না···যদি ঐ ডার্টি নিগারদের মধ্যে থেকে কেউ ছোরা বসিয়ে দেয়।

হঠাৎ পাশ থেকে কিসের শব্দ হতে সাহেব ঘুরে দাঁড়ান।

প্রভুদয়াল সাহেবের সামনে এগিয়ে আসে। তাকে দেখে সাহেব বহু তাল্লিমে-শেখা ভুল হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি···মাষ্টার···এখানকার ?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রভুদয়াল বলে, হাঁ জনাব।

তারপর স্যার টোডরমলের দিকে চেয়ে সাহেব বলেন, অল রাইট রায় বাহাদুর ! আমি দেখবো···আমি কি ক'রতে পারি···এই সব ডার্টি লোক··· আমি চাই না···পথ আটক ক'রে থাকে···পারেন না তাড়িয়ে দিতে ?

স্যার টোরডমল জনতার দিকে চেয়ে গর্জন ক'রে ওঠেন, যাও···যাও···

তারপর নিজের হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে সাহেবের পথ ক'রে দিয়ে তিনি সাহেবকে আগিয়ে নিয়ে চলেন।

সাহেব পেছন ফিরতেই, মুন্নু দুষ্টুমী ক'রে বলে ওঠে, গুড্ আফটার-নুন্ সাহেব !

হঠাৎ সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সাহেব ভ্রূকুটী ক'রে ফিরে তাকান কিন্তু মুন্নুকে ইংরেজীতে বলতে দেখে সাহেব হেসে ফেলেন।

ধূলো উড়িয়ে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায়।

[চার]

প্রভুদয়াল ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই সাহেব জেল দিয়ে দেবে। তাড়াতাড়ি কারখানার ভেতরে গিয়ে দুটো ভাল বোতলে সে নিজের হাতে চাটনী পুরে মুন্নুর হাতে দেয়। তারপর মুন্নুকে সঙ্গে নিয়ে নিজে চলে লেডী টোডরমলের কাছে। বেশীদূর যেতে হয় না, লেডী টোডরমল তখন দরজার সামনেই বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলেন, এইবার দেখ কি করতে পারি ! বড় বাড় বেড়েছিলে·· এখন এমন নাচন নাচাবো যে···

প্রভুদয়াল কোন ভূমিকা না ক'রে, নত হয়ে লেডী টোডরমলের চরণে মাথা রেখে ব'লে ওঠে, মাপ করুন মা···এবারটীর মত আমাদের মাপ করুন ! আপনার জন্যে এইটুকু এনেছি···দয়া ক'রে গ্রহণ করুন !

এই বলে চাটনীর বোতল ছুটো তাঁর পায়ের কাছে রেখে দেয়।

ঠিক সেই সময় স্যার টোডরমল সাহেবকে আগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিলেন···পাড়ার সকলকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি যে-সে লোক নন্···বড় বড় সাহেব তাঁর হাত-ধরা···সেই গর্বে তাঁর বৃদ্ধ দেহে যেন নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে···

ঘরে ঢুকেই প্রভুদয়ালকে দেখে রাগে জ্বলে ওঠেন, এই যে পাজী, বদমায়েস! এখানে এসেছ কি জন্যে? আদালতে সবাইকে দেবো ঝুলিয়ে, তারপর···

লেডী টোডরমল বাধা দিয়ে বলেন, যাক্ গে, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে! হাজার হোক্, একটা মানুষকে জেলে পাঠিয়ে আমাদের আর কি লাভ হবে!

প্রভুদয়াল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে···তার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, স্যার টোডরমলের কথায় সাহেব নিশ্চয়ই তাকে জেলে পুরে ফেলবে!

সকলের চেয়ে খুসী হলো মুন্নু···তুলসী, বোঙ্গা, মহারাজকে সে বুক ফুলিয়ে জানায়···সাহেবদের সঙ্গে তার যে শুধু জানাশোনা আছে তাই নয়, তাদের ভাষাও সে জানে! সকলের সামনে সে তা' দেখিয়ে দিয়েছে আজ!

কাল-ক্রমে কারখানার জীবন-ধারার সঙ্গে মুন্নু নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

কিন্তু সে-জীবন, অন্ধকারময়···অবাঞ্ছিত···ভাল লাগে না তার।

তখনও ঘুম জড়িয়ে থাকে চোখের পাতায়, ভোর না হতেই, বিছানা ছেড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে উঠে পড়তে হয়। শোয়, গভীর রাত্রিতে··· সম্পূর্ণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে।

তবে সে এখন কাজের লোক। ভোর থাকতে কারখানায় ঢুকে সে প্রথমে উনুনগুলো পরিষ্কার করে, তারপর তুলসী এলে ছু'জনে মিলে উনুন জ্বালায়। রোজ উনুন জ্বালবার সময়, তারা উৎকর্ণ হয়ে থাকে প্রতিবেশীরা কেউ চীৎকার ক'রে উঠছে কি না শোনবার জন্যে। চাটনী, মোরব্বা, এসেন্স

ঘুষ দিয়ে প্রভুদয়াল তাদের ঠাণ্ডা ক'রে রাখে বটে কিন্তু কে জানে, কখন আবার সে-সব ভুলে গিয়ে তারা চীৎকার ক'রে ওঠে!

ঘোড়া-মুখো তেমনি সকাল থেকে সকলকে উৎব্যস্ত ক'রে তোলে, তবে রামনাথের ঘুষিতে ইদানীং তার আর সে রুদ্র প্রতাপ নেই। অনেক ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। এমন কি মাঝে মাঝে সকাল বেলা প্রভুদয়ালের সঙ্গে সে মন্দিরেও যায়। মন্দির থেকে পূজা সেরে ফিরতে বেলা হয়ে যায়, তারপর সে বেরোয় অর্ডার সংগ্রহের জন্যে। সেই জন্যে কারখানাতে তাকে আর বেশীক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে যে কোন মুহূর্ত্তে সে এসে পড়তে পারে এবং তখন যদি কাউকে দেখে, গল্প করছে বা বসে আছে, তার আর রক্ষা নেই। সেই জন্যে মুন্নু সর্বদাই সতর্ক হয়ে থাকে। ঘোড়ামুখোকে সে রীতিমত ভয় করে।

তবে ইদানীং সে যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। হাসি-ঠাট্টা বা গল্প সে কারুর সঙ্গেই করে না। সকাল বেলা যখন সে ঘুম থেকে ওঠে, তার মনে হয় কি একটা যেন দুঃখ, পাষাণের মত তার বুকে চেপে আছে। তখন মনিব বা মনিবাণী, কারুর সঙ্গেই দেখা ক'রতে মন চায় না। তার ভয় হয়, যদি তাঁরা আদর করেন, দুটো স্নেহের কথা বলেন, তাহলে সে হয়ত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না, হয়ত সেই পাষাণের ভারে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।

সন্ধ্যাবেলাতেও ঠিক এমনি কি এক অজানা অনির্দেশ্য দুঃখভার তাকে পেয়ে বসতো। সে চঞ্চল হয়ে উঠতো। অন্তরের সেই চাঞ্চল্য লুকোতে গিয়ে সে আরো ম্লান হয়ে পড়তো।

শুধু একটী ব্যাপারে তার মনের এই পাষাণ-ভার যেন মন থেকে নেমে যেতো···অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যখন সে অনুভব করতো, এই সব কারখানার কুলি-মজুর···এদের সঙ্গে কোথায় যেন নিঃশব্দে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় আত্মীয়তা···

এই ভাবে গ্রীষ্ম চলে গিয়ে এলো শীত। মুন্নু এখন কারখানার সেই আধ-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় কোথায় কি আছে···আজ আর তার চোখে

সে অন্ধকারে ধাঁধাঁ লাগে না। গ্রীষ্ম ফুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার ভেতরকার আবহাওয়া বদলে গেল। সেই বায়ুহীন বদ্ধ গহ্বরে বাতাস আজ আর তপ্ত অগ্নির কণা নয়…শীতের দিনে উনুনের আঁচে ভালই লাগে তাত পোয়াতে…উনুনের ধারে মুন্নু চুপটী ক'রে বসে বসে দেখে, আগুনের খেলা…রক্ত আলো তার গায়ে পড়ে সারা গা লালচে ক'রে দেয়। দেখতে দেখতে তার মনে হয়, সেই আগুনের সঙ্গে যেন তার অন্তরের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে… দিনের আলোয় বিবর্ণ তার দেহকে আগুন যেন ভালবেসে রাঙিয়ে দিয়েছে… তার ভাবতে ভাল লাগে, সে রঙ বুঝি আগুনের নয়, তার নিজের দেহেরই… পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের বহিপ্রকাশ,…সে আঁচ যেন তার দেহ ভেদ ক'রে মনের ভেতর গিয়ে লাগে…বড় দরকার তার সেই আগুনের আঁচের…তপ্ত স্পর্শের…

শীতান্তে এলো বসন্ত। মুন্নুর মন যেন আনন্দে সজীব হয়ে উঠলো। ভোর না হতেই ঝুড়ি ঝুড়ি সব আম আসতে থাকে…কাঁচা, পাকা, ডাসা… মনে করিয়ে দেয় তার গাঁয়ের কথা…দুপুর বেলা অপরের বাগান থেকে আম চুরি-করার ধুম। সকাল থেকে কুলিরা বস্তা বস্তা আম নিয়ে এসে জড় করে, লাচী আর তার দলের বুড়ীরা বসে যায় ছাড়াতে।

মুন্নু ভাবে, ঘোড়ামুখো কখন কারখানা থেকে বাইরে যাবে…সে একটু প্রাণ খুলে ঘুরতে ফিরতে পাবে, আমের ঘরে গিয়ে একবার ঢুকবে। মুন্নু কেন, কারখানার সবাই সেই এক চিন্তাই করতো, কখন গণপত বাইরে বেরুবে।

আম দেখে মুন্নুর মনে দুরন্ত লোভ জেগে ওঠে…এ লোভ তার ছেলেবেলা থেকেই আছে। সে কি জানতো, তার জন্যে তাকে বিষম বিপদে পড়তে হবে একদিন…

যেই গণপত বেরিয়ে যেতো মুন্নু আমের ঘরে গিয়ে আম বাছতে আরম্ভ ক'রে দিতো…কিন্তু পাকা আম তখনও আসেনি…তাই তারই মধ্যে বেছে যেগুলোতে একটু রং ধরেছে বোধ হতো সেগুলো সরিয়ে খেয়ে ফেলতো একটার পর একটা। এক হাতে আম…আর এক হাতে কাজ…

কাঁচা আমের রসে দাঁত টকে যায়···শির্ শির্ করতে থাকে···তবুও ঐগুলি আমের লোভ, মুন্নু থাকতে পারে না। ক্রমে সর্দি লেগে যায়·· চোখ ফুলে ওঠে।

ঘোড়া-মুখোর বুঝতে দেরী হয় না, কাঁচা আম চুরি ক'রে খাওয়ার ফলেই সর্দিতে চোখ ফুলে উঠেছে।

একদিন ঘুম থেকে উঠে মুন্নু দেখে কিছুতেই যেন চোখ খুলতে চায় না এমন ভারী হয়ে আছে। এমন সময় ঘোড়া-মুখো কোথা থেকে এসে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। কি হলো বোঝবার আগেই, গণপত গুণে গুণে আরো চারটী ভারী ওজনের চড় দু'গালে মেপে বসিয়ে দিল।

মুন্নু চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। সে-কান্না শুনে প্রভুদয়াল তাড়াতাড়ি নেমে এলো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গণপতের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্যে হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে, মুখ্‌খু। কাঁচা আমগুলো ওভাবে না খেয়ে, দু'একদিন খড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে খেলেই তো পারতে···তাহ'লে আর শরীর খারাপ হতো না ?

মুন্নু ফুঁপিয়ে কাঁদে।

গণপত চীৎকার ক'রে ওঠে, এই ভাবে তুমি ছেলেটার মাথা খেয়েছ··· চোর ক'রে তুলেছ।

মুন্নুকে সেখান থেকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রভুদয়াল বলে, এখন চল ডাক্তারের বাড়ী···চোখে একটা কিছু ওষুধ তো দিতে হবে।

গণপত আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে।

—এই ক'রেই তুমি ব্যবসা চালাবে। যত সব রাস্তার কুকুর, তাদের নিয়ে মাথায় ক'রে নাচো ! সারাদিনে একটা কুটো নেড়ে উপকার ক'রবে না পাজী ···ওধারে এক ঝুড়ি আম উড়িয়ে দেবে শোর-পেটে ! বেত না খেলে কাজে ওদের হাত ওঠে না। এখন এই কাজের সময়···একজন লোক যদি চোখে অসুখ ক'রে বসে থাকে···তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করবে কে ? আমাকে এখন

টাকার জোগাড়ে দিন কতক বাইরে যেতে হবে···খুব, খুব মজা হবে কারখানায়···

প্রভুদয়াল তখন মুন্নুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

গণপত যে ক'দিন কারখানা থেকে অনুপস্থিত ছিল, সে ক'দিন মানুষ এবং ভগবান, দু'পক্ষই শান্তিতে ছিল।

চোখের তাড়সে মুন্নুর জ্বর দেখা দিল এবং বিছানা নিতে হলো। কিন্তু এ অসুখের মধ্যে মুন্নুর মনে এক পরম পরিতৃপ্তি এলো···তার মনিবাণী রাত দিন নিজের ছেলের মতন ক'রে তাকে সেবা করছেন।

মুন্নুর বিছানায় ব'সে কোমল কর-সঞ্চালনে পার্বতী তার মাথা টিপে দেয় ·· যন্ত্রণা বোধ হ'লে সারা গায়ে ধীরে, অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দেয়·· আদর ক'রে বুকে টেনে নেয়···জ্বর ছেড়ে যাওয়ার সময় সারা গা ঘেমে উঠলে··· নিজের আঁচল দিয়ে মাতৃ-স্নেহে মুছিয়ে দেয় · কত আদর ক'রে বলে, বাছারে ···তোর কেন জ্বর হলো? আমার তো হলে পারতো? আহা···বড় কষ্ট হচ্ছে না? আমার হ'য়ে যদি তোর ভাল হয়ে যায় ··

অন্তর নিঃসৃত সেই স্নেহ-বাণী, স্নিগ্ধ অদৃশ্য বায়ুর মত অন্তরে প্রবেশ ক'রে, ভেতর থেকে যেন দেহের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দেয়···দিব্য-সঙ্গীতের সম্মোহনের মত অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। যুগযুগান্ত ধ'রে মাতৃত্বের বেদনার মধ্যে দিয়ে নারী পেয়েছে এই অপরূপ বাণীর সহজ অধিকার। সারা জীবন ধ'রে কৈশোরের সমস্ত সুখে-দুঃখে চির-বন্ধুর স্মৃতির মধ্যে, স্নেহময়ী নারীর সেই মাতৃ-দুগ্ধ-শুভ্র কথাগুলি মুন্নু অন্তরের সর্বোত্তম আনন্দের, তীব্রতম বেদনার স্মৃতিস্বরূপ সঞ্চয় ক'রে রাখে।

যন্ত্রণায় যখন বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, পার্বতী তখন তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে···সে তপ্ত আলিঙ্গনে যেন অবশ হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কি এক অপরূপ দেহ-গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, সে-গন্ধের স্নিগ্ধতার মধ্যে হারিয়ে যায় বেদনার উগ্রতা। অক্ষয় হয়ে থাকে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে এই ক্ষণিক স্পর্শের স্মৃতি···চির-উত্তপ্ত, চির-স্নিগ্ধ···ঠিক তার মায়ের

আলিঙ্গনের মত…অথচ যেন তা থেকে পৃথক…কি আছে তার মধ্যে যা টেনে নিয়ে যায় মনকে জানা-অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে দুর্জ্ঞেয় অনুভূতির রহস্য-লোক…

কবিরাজী মোড়কের জোরে ক্রমশ জ্বর ছেড়ে এলো…পার্বতীর তৈরী কাজলে চোখের জ্বালাও ক্রমশ দূর হয়ে গেল…সুস্থ হয়ে মুন্নু আবার নামলো সেই কারখানার গহ্বরে।

কারখানার লোকেরা তাকে ভালবাসতো। তাই দুর্বল দেহে তাকে বেশী কাজ করতে হতো না। তার হয়ে তারা কাজ ক'রে দিত।

গণপতের ফিরতে দেরী হচ্ছিল, অবশ্য তাতে কারখানার লোকেরা খুশীই ছিল, কিন্তু প্রভুদয়ালের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছিল, কেন না গণপত টাকা না নিয়ে এলে তার আর চলছিল না। অগত্যা প্রভুদয়ালকে স্যার টোডরমলের কাছ থেকে ধার নিয়ে কাজ চালাতে হলো। স্যার টোডরমল পাড়ার লোক-দের কাছে শুধুই যে মহাপুরুষ ছিলেন, তা' নয়…তিনি রীতিমত মহাজনও ছিলেন। প্রভুদয়াল নিজে একদিন কারখানার কুলি ছিল…তারপর ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে নিজেকে বিত্তশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত ক'রে তোলে…তাই স্যার টোডরমলের কাছে হাত পাততে তার কোন কুণ্ঠাই ছিল না। তবে স্যার টোডরমল শুধু হাতে কাউকে ঋণ দিতেন না…প্রভুদয়ালকে এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ ক'রে দেবার কড়ারে তিনি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে শতকরা পঁয়তাল্লিশ টাকার হিসাবে পাঁচশো টাকা ধার দেন। এই ভাবে পাড়ায় আরো দু'এক জায়গায় প্রভুদয়ালকে হ্যাণ্ডনোট কেটে টাকা নিতে হয়। তবে তার ভরসা ছিল, গণপত ফিরে এলেই সে সকলের টাকা শোধ ক'রে দিতে পারবে।

পাড়ার লোকেরা যে তার পেছনে আর লাগতো না, এটাও তার একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল! প্রভুদয়ালকে দিয়ে তাদের টাকার বংশ-বৃদ্ধি হবার একটা প্রশস্ত সুযোগ ছিল। তবে প্রভুদয়াল মনে করতো, পাড়ার লোকেরা সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবাসে। ইত্যবসরে স্যার টোডরমলের সঙ্গেও তার

প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবার আর একটা কারণ ঘটে গেল। গোলাপী মোরব্বা করবার জন্য সে একটা নতুন চেষ্টা করছিল। তার জন্য কতকগুলো বাড়তি কুলিকামিন তাকে নিতে হলো। কিন্তু তাদের বসতে দেবার মত জায়গা তার কারখানায় আর ছিল না! তাই স্যার টোডরমলের বাড়ীর নীচে একটা ছোট্ট ঘর পড়েছিল, সেটা ভাড়া নেবার প্রস্তাব করতে স্যার টোডরমল রাজী হয়ে গেলেন। একটা পোড়ো ঘর থেকে যদি মাসে মাসে কিছু আসে, সে-সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

তাই আজকাল প্রভুদয়ালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লেডী টোডরমল নিজের আভিজাত্য ভুলে প্রশ্ন ক'রে ফেলেন, একি প্রভু, তুমি এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন বল দেখি?

প্রভুদয়াল বুঝতে পারে না, লেডী টোডরমলের এই প্রশ্নের পেছনে আন্তরিকতা আছে কি না, জেনে লাভই বা কি? তারা ধনী, মানী, তাদের মান্য ক'রে চলাই ভাল। তবে গণপত ফিরে এলেই আগে স্যার টোডরমলের ধারটা শোধ দিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু গণপতের আসবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

অবশেষে গণপত ফিরে এলো।

কিন্তু এলো যেন জিভে শাণ দিয়ে। একে তো দুর্মুখ, তার ওপর এমন আরম্ভ করলো যে তার মুখের সামনে দাঁড়ায়, কার সাধ্য!

ছেলেবেলা থেকেই মুন্নুর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল, লোকের মন-মেজাজ বোঝবার। যেদিন ঘোড়ামুখো ফিরে এলো, সেইদিনই তার মুখের দিকে চেয়ে মুন্নুর মনে হলো, ঘোড়ামুখোর মনে যেন কি একটা নতুন জিনিস খেলা করছে। সেটা যে কি তা সে বুঝতে পারে না। তবে গণপতের সব কাজে, সব কথায় মুন্নু লক্ষ্য করে, কি একটা জিনিস যেন সে চাপা দিতে চাইছে। তাইতে সে যেন আরো রূঢ় হয়ে উঠছে।

সেদিন চার বার মুন্নু ধরা পড়ে গেল...গণপতের দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। প্রথমবার চোখাচোখি হওয়াতে গণপত শুধু একটা ক্রুদ্ধ

দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ ক'রে চলে গেল। দ্বিতীয়বার সে অকারণে চীৎকার ক'রে উঠলো। তৃতীয়বার চোখাচোখি হওয়াতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে চলে গেল। কিন্তু চতুর্থবার সে সগর্বে গর্জন ক'রে উঠলো, হাঁ ক'রে দেখছিস কিরে বেজম্মা···কাজ নেই?

তারপর আর গণপতের দিকে চেয়ে থাকতে মুন্নুর সাহসে কুলায় নি। তবে সে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে, কেন হঠাৎ ঘোড়ামুখোর লম্বা মুখ আরো লম্বা হয়ে গেল? কিন্তু কাজের মধ্যে ভুলে গেল গণপতের কথা।

কিন্তু মুন্নু যে তার দিকে, একবার নয়. চার-চারবার কটমট ক'রে চেয়েছিল, সে-কথা গণপত ভুললো না। সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো, তার এই পরের ব্যাপারে নাক গোঁজবার প্রবৃত্তির জন্যে কি ক'রে তাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারা যায়।

শীঘ্রই সে সুযোগ এসে গেল।

প্রভুদয়াল মুন্নুর হাতে নতুন-তৈরী গোলাপী মোরব্বা এক শিশি দিয়েছিল, লেডী টোডরমলকে দিয়ে আসবার জন্যে। হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ সাতদিন হলো কাবার হয়ে গিয়েছে সুতরাং কিছু ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখা দরকার। মোরব্বার শিশি নিয়ে মুন্নু বড় বড় পা ফেলে চলছিল···কারণ স্যার টোডর-মলের বাড়ীর ভেতরটা তার কাছে এক মহা-আকর্ষণের বস্তু ছিল···সেখানকার ইংরেজী আসবাব-পত্র···ছবি···সাজানো-গোছানো তার কৌতূহলী মনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতো। যাবার সময় সে লক্ষ্য করে নি, অন্ধকারে এক-কোণে গণপত বসে হুকো টানছিল। হঠাৎ তার সামনে দিয়ে মুন্নুকে মোরব্বার শিশি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে, কৌতূহলী হয়ে গণপত তার অজ্ঞাতে পিছু-পিছু বেরিয়ে এলো। দেখলো, কি আশ্চর্য, মুন্নু স্যার টোডরমলের বাড়ীতে ঢুকছে! দরজার গোড়াতেই লেডী টোডরমল দাঁড়িয়ে একজন ঝি-র সঙ্গে কথা বলছিলেন। গণপত দেখলো, মুন্নু হেসে মোরব্বার শিশিটা তাঁর হাতে দিল। রাগে গণপতের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। তাহলে তার অসাক্ষাতে প্রভুদয়াল লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছে···

এমন ভাব ক'রে নিয়েছে যে, উপহার দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে! যার ছেলে তাকে মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছে, তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে হেল্‌থ অফিসারকে ডেকে আনিয়েছিল, যেচে তাকে মোরব্বার শিশি উপহার দেওয়া!

মুন্নুকে ফিরে আসতে দেখে সে ইচ্ছে করেই ঘুরে দাঁড়ালো·· মুন্নু কাছে আসতেই সে তার গলা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, কার হুকুমে তুই মোরব্বা দিতে গিয়েছিলি?

ভয়ে মুন্নু বলে, শেঠজীর হুকুমে। তিনি আমাকে দিয়ে আসতে বল্লেন, তাইতো গিয়েছিলাম। তা'ছাড়া তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন, উনি যখনি যা চাইবেন, তা যেন.আমরা দিই।

দাঁতে দাঁত চেপে গণপত বলে ওঠে, চুপ রও, হারামজাদা···মজা পেয়ে গিয়েছ না, এখানে ভালমানুষটী সেজে থাকবে, আর আমাদের যারা শত্তুর তাদের কাছেও মজা মারবে···

এই বলে মুন্নুর গালে সে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

আত্মরক্ষার জন্যে মুন্নু হাত তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু গণপত তখন রাগে দিক-বিদিকশূন্য। মারতে মারতে সে মুন্নুকে রাস্তার কাদার মধ্যে ফেলে দিল। অসহায় ভাবে মুন্নু চীৎকার ক'রে উঠলো।

তার আসল রাগ হয়েছিল উপহার যে দিয়েছে এবং উপহার যে নিয়েছে, তাদের দু'জনের ওপর, কিন্তু তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করবার কোন সুযোগ না পেয়ে, তার সব রাগ সেই হতভাগ্য বালকের ওপরেই সে প্রয়োগ করে···

—কাজ ফেলে, এখানে-সেখানে ছুটোছুটী! ফের যদি দেখি কাজের সময় কারখানা থেকে বেরিয়েছিস, তাহলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো শূয়োরের বাচ্চা!

প্রভুদয়াল তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসে দেখে, মুন্নু কাদায় পড়ে কাঁদছে। গণপত চোখ লাল ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে। সেখান থেকে বাইরে দেখে, পাশের দরজার কাছে, পাথরের মূর্তির মত লেডী টোডরমল দাঁড়িয়ে

আছেন। লেডী টোডরমলের বুঝতে এতটুকু দেরী হয় নি, গণপতের এই বিক্রমের লক্ষ্য কোথায়।

প্রভুদয়ালকে দেখে সেখান থেকেই লেডী টোডরমল চীৎকার করে ওঠেন, আরে নেমকহারাম ছোটলোক! একটা মোরব্বার শিশির জন্যে এত আক্রোশ! আর আমরা যে তোদের এত দয়া করলুম…তোদের সব উৎপাৎ মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে আছি—যখনি টাকার দরকার হচ্ছে তখনি টাকা দিচ্ছি…আর তার এই প্রতিদান? ছোটলোক আর কত ভাল হবে!

উত্তেজিত হয়ে গণপত উত্তর দেয়, আপনার সঙ্গে কে কথা বলেছে? আপনি যান! আমার চাকরকে আমি শাসন করছি, তাতে আপনার কি?

লেডী টোডরমলের গায়ে যেন কে বিষ ছড়িয়ে দিল। তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—,

—দূর হ, দূর হ, নেমকহারাম…বজ্জাত…পাজি…তোর জন্যেই তো প্রভুদয়ালের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া…নইলে সে তো ভদ্রলোক…তুই হ'লি আঁস্তাকুড়ের কুকুর…বদমায়েস…কেমন বাপের ছেলে…তা' আর কত ভাল হবে? তোদের কথা জানতে আমার বাকী নেই…নিজের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে একটা মুসলমানী নিয়ে ঘর করতো তোর বাপ—জানি না আমরা? তোর বাপ পরকে ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছিল…তুইও তোর অংশীদারকে ঠকাচ্ছিস…উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত ছেলে! তোর মত লোচ্চা বদমায়েস মাতালকে ভদ্দরলোকের পাড়ায় ঢুকতে দিতে নেই!

লেডী টোডরমলের মুখ থেকে গণপতের কুলজী শুনতে শুনতে মুন্নর কান্না আপনা থেকেই থেমে গিয়েছিল। এমনি খারা কেউ যে ঘোড়ামুখোকে অপমান করতে পারে, ভেবেও সে মনে সান্ত্বনা পায়। পাছে কাঁদতে গেলে সে শুনতে না পায়, সেই জন্যে জোর ক'রে তার কান্না থামিয়ে রাখে।

উত্তেজিত রায় বাহাদুর গৃহিণীকে শান্ত করবার জন্য প্রভুদয়াল হাত জোর ক'রে বলে, দোহাই মা…দোহাই তোমার, ক্ষমা করো…এই দেখ হাত জোড় ক'রে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—যদি বল, নাক খৎ দেবো… যে শাস্তি

দিতে চাও, নেব···শুধু তুমি রাগ করো না···আমি জানি, ও অন্যায় করেছে ···ওর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই···বল···তুমি ক্ষমা করলে মা ? আমি তোমার ছেলের মতন···ছেলেকে ক্ষমা করবে না মা ?

কিন্তু এত কাতর মিনতিতেও লেডী টোডরমলের রাগ পড়লো না !

—না, না···এবার আর তোমাদের ক্ষমা করছি না। সেবার আমার ছেলের সঙ্গে মারামারি করলো, তবুও আমি ক্ষমা করেছিলাম···কিন্তু এবার আর নয়···আমার বাড়ী থেকে এই মুহূর্তে তোমার লোকজন জিনিস-পত্তর বের ক'রে নাও···তোমাদের চিনেছি আমি···এ সব তোমাদের চালাকি··· এই মুহূর্তে আমার টাকা শোধ ক'রে দাও !

প্রভুদয়াল বুঝলো ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে। একে তো স্বভাবতই সে ভীরু, ভীতু···তার উপর আজ সে প্যাঁচে পড়ে গিয়েছে।

হাত জোড় ক'রে তবু বলে, এ লোকটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমি জানি মা···কিন্তু তা'বলে আপনি তো···

লেডী টোডরমল গর্জন ক'রে ওঠেন, না, না···ও ভাবে তুমি আর তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারবে না···ভাল চাও তো আমার টাকা দিয়ে দাও···

প্রভুদয়াল অসহায় ভাবে, তার কণ্ঠস্বরে যতখানি মিনতি আনা সম্ভব তা এনে ব'লে ওঠে, তবু মা ক্ষমা চাইছি।

মুন্নর কান্না একেবারে থেমে গিয়েছিল। মনিবের বিপদের আশঙ্কায় তার মন ভয়ে কাঁপতে থাকে।

কারখানার কুলিরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপটি ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আছে, জানালায় জানালায় প্রতিবেশিনীরা নীরবে মুখ বাড়িয়ে শুনছে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সব চুপচাপ।

হঠাৎ লেডী টোডরমলের মনে পড়লো, আশে পাশে চারিদিকে পাড়ার লোকজন জমা হয়েছে। এই তো উপযুক্ত সময়, নিজের মনের ঝাল মেটাবার। সজোরে মাটিতে পা ঠুকে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে তিনি চীৎকার ক'রে বলে ওঠেন,

—মেয়ে মানুষের মত ওখানে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে আছিস্ কেন? বেরিয়ে আয়...

বাড়ীর ভেতরে অপরাহ্ন-ভ্রমণের জন্যে স্যার টোডরমল তখন বেশ পরিবর্তন করছিলেন। সেই অবস্থাতেই গোলমাল শুনে তিনি নীচে নেমে ব্যাপার দেখে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? উঁহ...হুহ...হু

পুরানো হাঁফানীটা বেড়ে ওঠায় স্যার টোডরমলের কথা বলতে গেলেই কাশী এসে যাচ্ছিল।

—উঁহ...হুহ...হু...কি ব্যাপার?

ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে লেডী টোডরমল হুংকার দিয়ে বলে ওঠেন, নেমকহারামের দল...ওঁরা ধোঁয়া দিয়ে আমাদের ঘর-দোর নষ্ট করবেন...আমরা উল্‌টে তার বদলে ওঁদের ঘর ছেড়ে দেব—দরকার হলে টাকা ধার দেব...আর একটা সামান্য মোরব্বার শিশি...তার জন্যে কি কাণ্ড, ছিঃ!

স্যার টোডরমল স্ত্রীকে ভৎর্সনা ক'রে বলে ওঠেন, বলি, বাজার থেকে এক শিশি...উঁহ...হুহ...হু...মোরব্বা কেনবার...ঘহুঁ...হুঁ...হু...

হাঁফানির জন্যে স্যার টোডরমল আর কিছু বলতে পাবেন না।

এবার প্রভুদয়াল স্যার টোডরমলের শরণাপন্ন হয়,

—ক্ষমা করুণ আমাকে রায় বাহাদুর! গণপত বুদ্ধিশুদ্ধিহীন...ও জানতো না যে লেডী টোডরমলের জন্যে আমি ঐ শিশি পাঠিয়েছি...কত লোক আসে যায় কারখানায়...কারখানার লোকেরা...

—মিথ্যে কথা...তুমি এখনো ঐ পাজীটাকে ঢাকতে চাইছো?

গর্জন ক'রে ওঠেন লেডী টোডরমল।

প্রভুদয়াল হাত জোড় ক'রে বলে ওঠে, আপনি আমাদের মা-বাপ...তার কাতরতা স্যার টোডরমলের অন্তর স্পর্শ করে।

—বেশ...এবারের মতন ক্ষমা করলুম...কিন্তু তোমার বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিও...ফের যেন আর কোনদিন ও-রকম না করে...

এমন কোমল পরিসমাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবেশিনীরা জানালা থেকে সরে যায়।

প্রভুদয়াল কাদা থেকে মুন্নুকে টেনে তোলে।

—যা তো মহারাজ…জল দিয়ে ওর গায়ের কাদাগুলো ধুয়ে দে!

আড়ালে গণপতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রভুদয়াল বলে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে এ-ভাবে ঝগড়া করা ঠিক নয় গণপত…বিশেষ ক'রে, তুমি যখন ছিলে না, ওঁদের কাছ থেকেই টাকা ধার নিয়ে আমি কাজ চালাই।

গণপত সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলে ওঠে, যাও, যাও, কচি ছেলের মতন আমাকে উপদেশ দিতে এসো না…বসে বসে দাতব্যি ক'রে ব্যবসাটা উচ্ছন্নে দিতে বসেছ তুমি…নিশ্চয়ই খুব চড়া সুদে ধার নিয়েছ?

—কি করি বল? মহাজন মাত্রই তো এমনি ধারা সুদ নেবে। তুমি দু'এক দিনের মধ্যে টাকা নিয়ে ফিরবে বলে গেলে…কিন্তু যে-সব টাকা আদায় করলে তার কিছুই পাঠালে না তুমি। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে ধার করতে হলো! টাকা শোধ দেবার দিনও গিয়েছে। তাই বলছি, ওসব কথা এখন থাক—টাকা-কড়ি কি আদায় ক'রে এনেছ, তাই বল! যা যা ধার আছে সে গুলো আগে শোধ ক'রে দেই…তারপর যা হয় হবে…হাঁ…কত আদায় হলো? কাজের ভিড়ের মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি…তুমিও বলো নি!

মাথা নীচু ক'রে ঘোড়ামুখো মুখ বেজার ক'রে বলে, কত আর আদায় হবে। পঞ্চাশ টাকা।

প্রভুদয়াল লাফিয়ে ওঠে।

—বল কি, মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এধারে যে ধার হয়ে গিয়েছে প্রায় দু'হাজার টাকা।

—তা আমি কি করবো বল! তবে আমি বলছি আসলে আদায় করেছি তিনশো। আমার গত বছরের লাভের টাকাটা আমি তো সব এখনো পাইনি—তাই তা' থেকে আড়াই শো আমি নিয়ে নিয়েছি, বাকি পঞ্চাশ টাকা আছে।

—তাই বলো। পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়েছে শুনে, আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দু'জনে মুখোমুখী বসে•••কিন্তু দু'জনেই চুপচাপ।

হঠাৎ গণপত বলে উঠলো, আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি এই রকম ভাবে আমায় অপমান করবে।

প্রভুদয়াল বন্ধুর মুখের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে তার জীবনে প্রথম গণপতের দিকে চেয়ে সে বুঝলো, লোকটা সত্যিই ঘৃণ্য। অপরাধী যতই চেষ্টা করুক, এক সময় না এক সময় অজ্ঞাতে তার মুখে ফুটে ওঠে সে-অপরাধের চিহ্ন। জ্ঞানপাপী গণপত নিজের মুখের ম্লান বিকৃতি লুকোবার জন্যে চেষ্টা ক'রে হাসতে যায়···সেই একটী মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের পরিবর্তন অতি স্পষ্টভাবে প্রভুদয়ালকে জানিয়ে দেয় যে, সে অপরাধী।

সেই একটুখানি দৃষ্টি এক নিমিষের মধ্যে প্রভুদয়ালের মনে যেন কি ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলে দিল। এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন একটা কথা, একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা চোখের চাউনী, একটুখানি দেহের ভঙ্গী এক নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে যায় জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস, চিরদিনের বদ্ধ ধারণা। সেই মুহূর্তে প্রভুদয়াল সন্দেহাতীত ভাবে বুঝলো কতখানি স্বার্থপর তার লাভ-লোকসানের অংশীদার রূপে যাকে সে গ্রহণ করেছে। এতদিন যে-ধারণাকে সে মনে রেখাপাত করতেই দেয়নি, আজ তা' যেন তাকে পেয়ে বসে। সে বুঝতে পারে, বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায় যে লোককে, সে লোক গণপত নয়। যদিও তাকে বুঝবার তার আর কিছু বাকি রইলো না, তবুও তার স্বভাব-ভদ্রতায় সে তখনও তার মঙ্গলই কামনা করে···মনে মনে বলে, কিছুতেই যেন তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না হয়।

তাই একান্ত সহজ ভাবেই সে বলে, আমার কথা শোন। তুমি নিজের জন্যে যে আড়াই শো টাকা নিয়েছ, তা' থেকে আপাতত তুমি কোম্পানীকে দুশো টাকা ধার দাও···সেই দুশো টাকা দিয়ে অন্তত ছোট খাটো দেনা গুলো শোধ ক'রে দি। তারপর সামনের সপ্তাহে আমি লাহোরে গিয়ে

সেখানে যে আমাদের পাঁচশো টাকা পড়ে আছে, নিয়ে এসে তোমার টাকা শোধ ক'রে দেয়।

গণপত ম্লান বিবর্ণ মুখে উত্তর দেয়, টাকা আমার হাতে নেই।

গণপত আগাগোড়াই মিথ্যা কথা বলেছিল। সে সব-শুদ্ধ আটশো টাকা আদায় করেছিল এবং লাহোর থেকেও সে পাঁচশো টাকা নিয়ে নিয়েছে। সমস্ত টাকাই সে লাহোরের এক বারবনিতার পেছনে খরচ ক'রে এসেছে।

তাই কি বলবে ঠিক করতে না পেরে সে ব'লে ওঠে, আমার টাকা আমি সমস্তই খরচ ক'রে ফেলেছি, আর লাহোরের টাকার কথা যা তুমি বলছো, সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই···আমি বহু চেষ্টা ক'রেও সেখানে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারি নি।

প্রভুদয়ালের সন্দেহ বেড়ে যায়।

বড় ভায়ের মত সে মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলে, তোমার মনে যা আছে স্পষ্ট ক'রে এখনো খুলে বল। খাতাপত্র দেখে ভাল ক'রে হিসাব ক'রে দেখি কোথা থেকে কি বার করা যায়।

এই বলে সে মুন্নু কে ডাকে।

—মুন্নু, এখানে ব'সে খাতা পেনসিল নিয়ে যোগ দে'তো···গণপত যা যা বলছে একটা হিসেব জোড় তো···

মুন্নু উনুনের ওপর কড়া নাড়তে নাড়তে কান খাড়া ক'রে তাদের কথা-বার্তা শুনছিল···হুকুম পাওয়া মাত্রই সে ছুটে হাত ধুতে গেল···কারণ সে জানতো নোংরা হাতে হিসেবের খাতা-পত্র ছুঁতে নেই।

মুন্নুকে খাতা কাঁখে আসতে দেখে, গণপত রাগে মস্ মস্ ক'রতে ক'রতে ব'লে উঠলো, এই সব ছোটলোক কুলির সামনে আমাকে হিসেব দাখিল ক'রতে হবে নাকি? কখ্খনো না···আর ঐ অজাত-কুজাতের একটা রাস্তার ছোঁড়া, সে ছোঁবে ব্যবসার খাতা-পত্র···। এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না···আমি অনেক স'য়েছি···রাস্তার এঁটো পাতা তাকে কি না মাথায় তুলে নাচা!

তার কথায় বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে প্রভুদয়াল বলে, দেখ, ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে···ছেলেটার মা-বাপ নেই···অনাথ···তাকে পালন করা এমন খারাপ কাজ তো কিছু নয়! ও-র দেহ যে রকম তাতে ও-কে দিয়ে কুলির কাজ করানো চলবে না। সেইজন্যে হিসেবের কাজ ওকে একটু-একটু শেখাতে হবে···বুদ্ধি আছে, মাথা আছে···ঠিক পারবে···আর তা' ছাড়া, ওকে যদি আমার সংসারের একজন ব'লেই মনে করা যায়, তাহলে তো ওর সামনে হিসেব করতে তোমার আপত্তি থাকতে পারে না? কেমন? আর বাকি যে-সব কুলি কারখানায় রয়েছে···তারা হিসেব-পত্রের কিছুই বোঝে না।

ঘোড়ামুখো কিন্তু তেমনি আপত্তির সুরে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, হিসেব-পত্রের ব্যাপার···তোমার ঐ অনাথ বালকও বোঝে না! দু'দিন কোথায় স্কুলে পড়েছে কি না-পড়েছে···সে হিসেবের কি বুঝবে? বড়জোর হয়ত এক আর একে গুনে দুই বলতে পারে! আমার ত্রিসীমানায় যদি ও আসে, তাহলে ওকে আমি খুনই ক'রে ফেলবো বলে দিচ্ছি!

প্রভুদয়াল কোন উত্তর না দিয়ে মুনুর হাত থেকে হিসেবের খাতাগুলো নিয়ে নেয়।

মুনু ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···সামনে এগিয়ে যেতে তার আর সাহসে কুলোয় না।

গণপতের মনের ভেতর তখন ঝড় বইছিল। অন্য কেউ জানুক আর নাই জানুক, সে তো জানে, কি ক'রে দিনের পর দিন মিথ্যা অজুহাতে সে হিসেবের খাতা সব গোলমাল ক'রে রেখেছে। আজ যদি প্রভুদয়াল খাতা খুলে হিসেব মিলিয়ে দেখে? তাই টাকার কথা থেকে প্রভুদয়ালের মন সরিয়ে ফেলবার জন্যে গণপত প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে।

—কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি···জানা নেই, শোনা নেই, রাস্তা থেকে একটা কোথাকার বেজন্মা ছেলে ধরে নিয়ে এসে, তাকে সকলের থেকে আলাদা ক'রে দেখবার মানেটা কি?

আস্তে আস্তে হিসাবের খাতা খুলতে খুলতে প্রভুদয়াল বলে, কৈ, ওকে তো তেমন আলাদা ক'রে কিছুই দেখিনা আমি!

প্রভুদয়াল পাতার পর পাতা উল্টে চলে।

গণপতের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হ'য়ে ওঠে। যা করবার এখনি করতে হবে। তার এখনো ধারণা আজকের বিপদ সে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

—আজ এতো যে কেলেঙ্কারী হলো···তার মূলে তো ঐ ছোঁড়াটাই! যদি ও হারামজাদা ঐ মাগীটাকে মোরব্বার শিশি দিতে না যেতো···

গণপতকে বাধা দিয়ে প্রভুদয়াল বলে, অকারণে লোককে গালাগাল দেও কেন? ছিঃ! এই মাত্র তোমার সামনে, তোমার ব্যবহারের জন্যে আমাকে ও'দের কাছে হাত-জোড় ক'রে ক্ষমা চাইতে হলো! সে কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আর তা ছাড়া, মুন্নুকেই বা দোষ দিচ্ছ কেন? মুন্নু তো নিজের ইচ্ছায় মোরব্বা দিতে যায় নি, আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম বলেই না সে গিয়েছিল, আর আমি যে পাঠিয়েছিলাম, তা-ও এমনি-এমনি নয়···ওদের টাকা শোধ-দেবার দিন কবে চলে গিয়েছে···সেটা ভুল্লে চলবে কেন!

এদিক দিয়ে কোন সুবিধা হলো না দেখে গণপত অন্য পথ ধরলো।

—এই ভাবে হাণ্ড-নোট লিখে টাকা ধার ক'রে ব্যবসা চালানো আমার আদৌ ইচ্ছে নয়···টাকা যদি ধারই নিতে হয়···ও সব লেখালেখি কেন? যদি না-ই দিতে পারি, তখন তো আর কেউ আমাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না!

প্রভুদয়াল গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, তুমি যা বলছো, সে তো ব্যবসার ধার নয়···সে তো জোচ্চুরী!

গণপত দেখলো, এই ত সুযোগ! এই সুযোগে প্রভুদয়ালের সঙ্গে তার ঝগড়া করতেই হবে।

সে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, কি বল্লে, জোচ্চুরী! আমি জোচ্চোর! ফের যদি ও-কথা মুখে আনবে তা'হলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো বলে দিচ্ছি!

কিন্তু তাতেও প্রভুদয়াল উত্তপ্ত হয় না।

শান্ত ভাবেই বলে, তোমাকে জোচ্চোর আমি বলি নি। অকারণে উত্তেজিত হচ্ছো কেন? আজ আর তোমার সঙ্গে আমি কোন আলোচনাই করছি না...তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর।

গণপত উদগ্রীব হ'য়েছিল, এবার প্রভুদয়াল রেগে যাবে, দুটো কড়া কথা বলবে...তাহলেই ঝগড়া ক'রে তার বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হবে...কিন্তু প্রভু-দয়াল সে-ধরণের কিছুই করলো না...একটা কথাও উত্তেজিত হয়ে বল্লো না। প্রভুদয়ালের সেই শান্ত-ভাবে গণপত যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

তাই যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না-যায়, সেই জন্যে সে তেমনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, জোচ্চোর বল্লে না তো কি? মুখের ওপর সোজা না বল্লেই কি বলা হয় না! আমাকে কচি খোকা পেয়েছ? ঐ মাগী আমাকে যে অপমান করেছে...আমি এখন বুঝছি...তার মধ্যে তুমি...তুমিও আছ...নইলে ও মাগী ও-সব জানবে কোত্থেকে? বেশ...আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি...আমি আটশো টাকা আদায় ক'রেছিলাম...এবং পঞ্চাশ টাকা ছাড়া তার সবই খরচ ক'রে দিয়েছি.. এ থেকে আমার ওপর চোখ রাঙাতে এসো না...আমি যা খরচ করেছি, তা খরচ করবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে...তার জন্যে যদি আমাকে জেরা ক'রে জ্বালাতন করতে চাও...ভাল হবে না...মনে রেখো-আমি তোমার মাইনে-করা কুলি নই! আমাকে চোখ রাঙাতে এসো না!

রাগে প্রভুদয়ালের সর্ব-শরীর কাঁপতে থাকে, কিন্তু তবুও অসাধারণ বেদনায় সেই রাগ দমন করে বলে,

—আমি তোমাকে চোখ রাঙাতে বা ভয় দেখাতে কখনও চাইনি...চাইও না...যা করেছ ভালই করেছ...ঠিকই করেছ। তুমি বিয়ে করোনি, তোমার বয়স অল্প...মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফুর্তি করবে না-ই বা কেন? টাকাটা যে খরচ হয়ে গিয়েছে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কষ্ট নেই...অন্তত সে-কথা যে তুমি আমাকে এমনি খোলাখুলি ভাবে বল্লে, তাতে সত্যিই আমি খুব খুশী হয়েছি। আমাদের হাণ্ডনোটে যা ধার আছে, চেষ্টা ক'রে অন্য জায়গা থেকে ধার নিয়ে শোধ দিলেই চুকে যাবে সব গণ্ডগোল, কেমন?

গণপত মহাবিপদে পড়লো। এতেও যখন লোকটা উত্তেজিত হলো না, তখন সে আরো ক্ষেপে বলে উঠলো, ও সব ভালমানুষী ভান রেখে দাও! ভেবেছ, তোমার ঐ ভালমানুষীর চাল দিয়ে আমাকে দাবিয়ে রাখবে? সেটী হবে না! তোমার মত মিনি-মুখো লোকের মিষ্টি কথায় আমি ভুলি না··· তুমি ভেবেছ, তুমি নিজে খুব সাধু, না?

এতক্ষণ পরে যেন প্রভুদয়ালের গা একটু ঘামলো। কণ্ঠস্বরের মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তন দেখা দিল—

—দোহাই তোমার গণপত, আমার সঙ্গে তুমি ও-ভাবে কথা বলো না! ওটা ঠিক নয়! আমি তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নি ···কারণ আমি জানি, তোমার মত অবস্থায় পড়লে, হয়ত তোমারই মতন কাজ আমিও ক'রতাম···তুমি আমার চরিত্র সম্বন্ধে যা খুশী তাই ভাবতে পার কিন্তু আমি তোমার চরিত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিনি···করবোও না···তবে টাকা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে—তার জন্য সত্যিই আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছিল···হয়ত রাগও হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস কর, এখন আমার মনে ও সব কিছুই আর নাই!

গণপত তারস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে, তুমি বদমায়েস···তোমার মুখে মধু···বুকে গরল···ভণ্ড···

তবুও প্রভুদয়াল মিনতি করে, দোহাই তোমার, আমাকে ভুল বুঝো না··· আমি সোজা গেঁয়ো লোক···তুমি যা সব বলছো, তার কিছুই জানি না··· সারা জীবন আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে এসেছি···তবে তোমাদের শহরে লোকেরা যে-ভাবে কথা বলে, কাজ করে, আমি হয়ত তা' পারি না, বা করি না·· সত্যিই আমার এক এক সময় ইচ্ছে হয়, আমি কেন কুলিই রইলুম না·· কেন মরতে ব্যবসা করতে এলুম?

—আহা···ভাজা মাছটী উল্‌টে খেতে জানেন না! তোমার এ সব চালাকী বুঝতে আমার এক মুহূর্ত দেরী লাগে না···মুখে যত তোমার সাধুতার বুলি···

অন্তরে তত তোমার জিলিপীর প্যাঁচ…তোমার মত ধূর্ত…তোমার মত শয়তানি আর দুটী নেই…জাত—পাহাড়ী কুত্তা!

প্রভুদয়াল যদিও বুঝেছিল যে, অতঃপর গণপতের সঙ্গে তার কোন ব্যবসা-গত সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়…তবুও সে তার সব গর্ব ত্যাগ ক'রে শেষবারের মতন চেষ্টা করলো লোকটাকে কাজের কথার মধ্যে আনবার জন্যে…

—তোমার যা খুশী তুমি তাই বল। আমি তো জানি, সত্যিই ভাল হবার এত চেষ্টা করেও, আমি ভাল হতে পারি না…আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছে হাজার দোষ-ত্রুটী…

এত গালাগালের পর এই বিনয়…গণপতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো…

—যা যা…ঢের হয়েছে…আর ন্যাকামো করতে হবে না… ন্যাকা বদমায়েস কোথাকার!

প্রভুদয়াল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, গণপতের হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে পাগলামী করো না…মাথা ঠাণ্ডা কর… তুমি আর আমি এক ব্যবসায়ের সমান অংশীদার…ভুলে যেয়ো না, আমাদের ব্যবসার সব কাগজ পত্রে দু'জনের সই পাশাপাশি আছে!

ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে গণপত বলে, আজ সকালে তুমি যে অপমান আমাকে করেছ, তার পরও আশা কর যে আমি তোমার অংশীদার হয়ে থাকবো? আমি এই মুহূর্তেই তা ভেঙ্গে দিচ্ছি…দেখবো তোমার তেজ কোথায় থাকে? ঐ নর্দমায় লুটোবে…আমাকে ঠকানোর ফল হাতে হাতে বুঝতে পারবে! রাস্তার কুলি ছিলে… রাস্তার কুলিই থাকবে!

এই ব'লে হিসাবের খাতা-পত্র কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাবার জন্যে জুতোর দিকে পা বাড়ালো।

প্রভুদয়াল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সর্ব-অভিমান ত্যাগ ক'রে ছুটে গিয়ে গণপতের পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে অসহায়ের মত বলে উঠলো, এই আমার মাথা আর তোমার জুতো…যত খুশী, আমার মাথায় মার…আমাকে এভাবে ছেড়ে যেয়ো না…আজ দু'বছর একসঙ্গে থেকে এই ব্যবসা গড়ে তুলেছি…আজ

এই দেনার মুখে আমাকে ফেলে যদি চলে যাও, তাহলে সত্যিই এই বুড়ো বয়সে আমাকে আবার কুলিগিরি ক'রে মরতে হবে! দোহাই তোমার!

—তুমি মর বাঁচ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না! যার জন্মের ঠিক নেই, তার আবার মান-অপমান! তোমার বাপ ছিল কুলি...তুমিও কুলি... তুমি পারো যার তার কাছে হাঁটু গেড়ে হাত-জোড় ক'রে পা চাটতে...আমি তা পারি না...বিশেষ ক'রে তোমার মত একজন কুলির কাছে আমি পারবো না হাত-জোড় ক'রে থাকতে।

—যা খুশী আমাকে বলো—শুধু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না...একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবো...সব ঠিক হয়ে যাবে!

গণপত সে-আবেদনে কোন দৃকপাত না ক'রে ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল...দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো,—দূর হও...রাস্তার কুকুর।

মুন্নু এতক্ষণ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিল...এক অজানা ভয়ে তার সর্ব-শরীর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। গণপতকে চলে যেতে দেখে, কি মনে ক'রে ছুটে গিয়ে তার জামা টেনে ধরে বলে উঠলো, দোহাই হুজুর! চলে যাবেন না, চলে যাবেন না...এটা উচিত হচ্ছে না!

তুলসী, বোক্সা আর মহারাজ কোথা থেকে ছুটে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায়।

ধাক্কা মেরে মুন্নুকে সরিয়ে দিয়ে গণপত চীৎকার ক'রে ওঠে, দূর হ ফ্যান-চাটার দল!

মাথায় হাত দিয়ে প্রভুদয়াল বসে পড়লো। তার অজ্ঞাতে তার দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো, সর্বনাশ! সর্বনাশ হবে!

গণপত ততক্ষণ দরজার বাইরে পা দিয়েছে। প্রভুদয়াল ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে। ধাক্কা মেরে গণপত চলে যায়। সে-ধাক্কা সামলতে না পেরে প্রভুদয়াল টলে পড়ে যায়!

গণপত তার পরের দিনই নিজে আর একটা চাট্‌নীর কারখানা খুলে বসলো। তার হাতে যে পঞ্চাশটা টাকা ছিল, তাই দিয়ে একটা সেড্ ভাড়া

নিল এবং কিছু কিছু আসবাব-পত্র জোগার করলো। দু'বছর ধরে ব্যবসা চালানোর দরুণ বাজারের লেন-দেনের কারবার ছিল। তারি সুযোগে কাঁচামাল যা কিছু তা' সে ধারে সংগ্রহ করলো। যে-সব পুরানো খরিদ্দার ছিল, নিজে তাদের দোকানে দোকানে গিয়ে প্রভুদয়ালের নামে যা খুশী তাই দোষারোপ ক'রে তাদের সহানুভূতি আদায় করলো। এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে এলো যে তারা আর প্রভুদয়ালের সঙ্গে কাররার করবে না। সেই সঙ্গে অতি চতুর ভাবে সে এই খবরটাও প্রচারিত ক'রে দিল যে, দেনার দায়ে প্রভুদয়াল ডুবে আছে···শিগ্‌গিরই হয়ত পাত্‌তাড়ি গুটোবে···

যে-সব লোক ধারে মাল-পত্র দিয়েছিল, তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো··· বুঝি তাদের টাকা সব মারা যায়! সন্ত্রস্ত হয়ে তারা সবাই প্রভুদয়ালের দরজায় তাগাদা লাগালো।

প্রভুদয়াল পাগলের মতো হয়ে উঠলো।

একদিন একজন পাওনাদার অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে গালাগাল দিতে সুরু ক'রে দিল।

—ধারে জিনিস নিয়ে এখন মাগের পেটে লুকিয়ে রইলে নাকি? কইরে···সাড়া নেই কেন?

নিজের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা কল্পনা ক'রে প্রভুদয়াল এতদূর চঞ্চল হয়ে ওঠে যে, জ্বরে তাকে শয্যা নিতে হলো। পাওনাদাররা ভাবলো গণপতের কথাই ঠিক···প্রভুদয়াল তা'হলে তাদের ফাঁকি দেবার জন্যেই গা ঢাকা দিয়েছে। কারখানার কুলিরাও কি করবে ভেবে না পেয়ে, কারখানায় আসা বন্ধ ক'রে দিল। পাওনাদারদের মনে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দরজায় একজন চলে যায়, আর একজন আসে।

গালাগালে কানপাতা যায় না।

বাড়ীর ভেতর থেকে প্রভুদয়াল সে-সব কুৎসিৎ গালাগাল শুনতে পায় না কিন্তু পার্বতীকে শুনতে হয়।

অসহ্য বোধ হওয়ায় একদিন পার্বতী তুলসীকে ডেকে বল্লো, বাবা, তুমি বেরিয়ে লালাজীকে বলো, ওঁর জ্বর হয়েছে···জ্বর সেরে গেলেই উনি দেখা করবেন!

অভ্যাস মত তুলসী সে আদেশ মুন্নুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, যা মুন্নু, তুই বলে আয়!

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুন্নু বলে,—লালাজী, কর্তার জ্বর হয়েছে···

কথা শেষ হতে না হতে লালাজী চীৎকার ক'রে ওঠেন,—তা' আমরা জানি! জ্বর হবেই তো এখন! এত লোকের খেলে আর জ্বর হবে না! ও সব বুজরুকী ছেড়ে দিতে বল্ তোর মনিবকে। ভাল চায় তো বেরিয়ে এসে দেখা করুক···না হ'লে হারামজাদাকে বাড়ীর ভেতর থেকে টেনে বের ক'রে আনবো।

সব দায়িত্ব যেন মুন্নুর। হাত জোড় ক'রে কম্পিতকণ্ঠে মুন্নু বলে, বিশ্বাস করুন লালাজী, তাঁর সত্যি জ্বর হয়েছে! দয়া ক'রে আজ যান···কাল আসবেন ···কাল নিশ্চয়ই উনি দেখা করবেন।

—আরে যা যা নেড়ীকুত্তার বাচ্চা!

মুন্নু ভয়ে মুখ সরিয়ে নেয়।

ঠিক সেই সময় লেডী টোডরমল তাঁর তেতালার ছাদ থেকে এক ঘটী নোংরা জল নীচে রাস্তায় ফেলছিলেন। যখনি প্রয়োজন বোধ করেন, নিরঙ্কুশ ভাবে তিনি এমনি রাস্তাতেই সব নোংরা ছুরে ফেলে থাকেন। প্রভুদয়ালের দুর্ভাগ্য যে সেদিন তার পাওনাদারদের মাথা আর লেডী টোডরমলের হস্ত-নিক্ষিপ্ত সুমলিন-জলধারা ঠিক একই লাইনের মধ্যে এসে পড়ে।

লেডী টোডরমল একটু বিস্মিত হয়েই কান খাড়া ক'রে শোনেন, তাঁর বাড়ীর নীচে কারা যেন চীৎকার ক'রে কি সব বলছে। তিনি মুখ বাড়াতেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

—লজ্জা নেই···নির্লজ্জ···বেহায়া···মাথার ওপর নোংরা জল ঢেলে দিল?

লেডী টোডরমলকে দেখতে পেয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, আমাদের জামাকাপড় সব নোংরা করে দিলেন কেন?

একটু লজ্জিত হয়েই লেডী টোডরমল বলেন, তোমরা যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছো, তা' জানবো কি ক'রে ? কে তোমরা ? কি করছো ওখানে ?

একজন বলে উঠলো, আমরা এসেছি দেউলে প্রভুদয়ালের খোঁজে।

দেউলে ! লেডী টোডরমলের যেন মাথা ঘুরে গেল। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, দেউলে হয়েছে ? নেমকহারাম সত্যি সত্যি দেউলে হয়েছে।

—তাই তো দেখছি…নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা করে না কেন ?

সমবেত পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গে এবার নারী-কণ্ঠ সংযুক্ত হলো। একা লেডী টোডরমল তাদের সকলের অন্তরের জ্বালাকে ফুটিয়ে তুল্লেন…স্থানকালপাত্র ভুলে নিজের অর্থনাশের সম্ভাবনায় তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন,…

—বলি ও মড়া…সত্যি সত্যি মরেছিস নাকি রে ? আমার সোয়ামীর পাঁচ পাঁচশো টাকা গো…বলি…সর্ব-অঙ্গে গরল হবে…কুট হবে…

পাওনাদারদের দলের মধ্যে লম্বা মুখো একজন সমবেদনায় বলে উঠলো, তা'হলে আপনাদের পাঁচশো গিয়েছে !

আগুনে যেন ঘি পড়লো।

—পাঁচ পাঁচশো গো ! কেমন মাথা হেঁট ক'রে এসে আমার সোয়ামীর পা ধরে কেঁদে পড়লো…তাঁর নরম মন, গলে গেলেন…

পাওনাদারদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রভুদয়ালের বাড়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শব্দঘাতী বাণ ছড়তে থাকেন,

—এই নেমকহারাম…সারা দিচ্ছিস্ না যে বড় ? লোকের সর্বনাশ ক'রে গর্ত্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা ! ধর্ম্মে সইবে না…পচে পচে মরবি…এখনো ভাল চাস্ তো বেরিয়ে আয় ! আয় [illegible]ছি !

কিন্তু প্রভুদয়ালের বাড়ীর দিক [illegible]ক কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। শুধু [illegible] যেন অস্ফুট কান্না শোনা যাচ্ছিল…

প্রভুদয়ালের শয্যার পাশে বসে পার্বতীর সঙ্গে মুন্নু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কে একজন ব'লে ওঠে, পুলিশে খবর দাও···আসুক পুলিশ !

তাদের আশ্বাস দিয়ে লেডী টোডরমল বলেন, পুলিশ ডাকতে হবে কেন ? আমার ছেলে কি বৃথাই থানাদার হয়েছে ? সে ওপরেই আছে···দাঁড়াও, তাকে আমি ডেকে আনছি !

তর্ তর্ ক'রে তিনি ভেতরে চলে যান।

পার্বতী আর মুন্নুর চাপা কান্নায় প্রভুদয়ালের নিদ্রা ভেঙ্গে যায়।

জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ?

বহু কষ্টে অশ্রু রোধ ক'রে মুন্নু বলে, দরজায় পাওনাদাররা চেঁচামিচি করছে। তারা আপনাকে ডাকছে।

তৎক্ষণাৎ প্রভুদয়াল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে নীচে দেখলো। জ্বরে, উত্তেজনায় তার দেহ কাঁপছিল। মুখ বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যেই যাবে, অমনি তারা নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠলো,

—ঐ যে···ঐ যে হারামজাদা মুখ বাড়িয়েছে !

—পাজী নচ্ছার · বেরিয়ে আয়·· বেরিয়ে আয়···বের কর আমাদের টাকা···

হাত জোড় ক'রে প্রভুদয়াল বলে, আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা··· আপনাদের কষ্ট দিলাম···তবে বিশ্বাস করুন, আপনারা আমার কাছ থেকে যে যা পান, আমি পাই-পয়সা তা শোধ ক'রে দেবো···তার জন্যে যদি আমাকে জীবন দিতেও হয়, জানবেন, তাতেও আমি দ্বিধা করবো না··· অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এরকম ক'রে গালাগালি দেবেন না।

—এতক্ষণ ধরে যে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেল্লাম আমরা, সাড়া দিচ্ছিলে না কেন ? ওখান থেকেই বা জবাব দিচ্ছো কেন ? নীচে এসে সামনাসামনি জবাব দিতে পারো না ?

—জ্বরে আমি শয্যাশায়ী···আমি শুনতে পাই নি ! প্রভুদয়াল হাত জোড় ক'রে বলে।

এমন সময় ভিড় ঠেলে কে একজন এগিয়ে এলেন।

—আরে ! বাবু দেবদত্ত যে !

—বাবু দেবদত্ত ওপরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি…পালাবার আগে আমার বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যাও!

—আমি পালাবো না! বিশ্বাস করুন…

—তোমাকে আবার কি বিশ্বাস! আমার ভাড়া এখুনি চুকিয়ে দাও!

হঠাৎ প্রভুদয়াল জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিলো…ভাবলো, স্ত্রীর গায়ে সামান্য যা গয়না আছে, তাই দিয়ে বাড়ীওয়ালার ভাড়াটা চুকিয়ে দেবে!

এমন সময় গলির মোড়ে মহাসোরগোল পড়ে গেল।

সকলে পেছন ফিরে দেখে, লেডী টোডরমলের থানাদার পুত্র এবং পুলিশ ইনস্‌পেক্টর সাহেব পাহাড়াওয়ালা সমেত বীর-দর্পে এগিয়ে আসছেন।

থানাদার গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো, কোথায় প্রভু?

—এই জানালায় মুখ বাড়িয়েছিল…তোমাদের আসতে দেখে উবে গেছে!

লেডী টোডরমল্ল কোমরে হাত দিয়ে সগৌরবে দাঁড়ান।

থানাদার আদেশ করে, তেজ সিং! ইয়ার মোহম্মদ! যাও…বাড়ীর ভেতর থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে এসো ব্যাটাকে!

এমন সময় কারখানার দরজা খুলে গেল। প্রভুদয়াল আর তার পেছনে কারখানার জনকয়েক কুলি।

একজন পাহাড়াওয়ালা এগিয়ে গিয়ে প্রভুদয়ালের ঘাড় ধরে টেনে আনতে আনতে বলে, নিকালো শূয়ার!

মুন্নু প্রভুদয়ালকে জড়িয়ে ধরে।

দু'জন পাহাড়াওয়ালা জোড় ক'রে টেনে মুন্নুকে ছাড়িয়ে দেয়… পেছন থেকে লাথী মারতে মারতে প্রভুদয়ালকে একেবারে ভিড়ের মধ্যে এনে ফেলে।

পাওনাদাররা উল্লাসে চীৎকার ক'রে ওঠে,

—মার লাথী,…জোরে…হারামজাদা…পাহাড়ী চাষা…চোর…

একবার আপাদমস্তক চক্ষু দিয়ে প্রভুদয়ালকে মেপে নিয়ে ইনস্‌পেক্টর সাহেব হুকুম দেন…জলদি থানামে লে যাও! শয়তান মালুম্ হোতা।

সাহেবকে সমর্থন ক'রে থানাদার বলে ওঠে, পয়লা নম্বরের শয়তান…

তারপর নিজের জননীর দিকে চেয়ে বলে, যতক্ষণ আমি না ফিরি তুমি কারখানায় তালা লাগিয়ে রেখে দাও!

পাওনাদারদের ওপর হুকুম হলো, আপনারা কাল কতোয়ালীতে আসবেন… সকলে…আপনাদের এজাহার নেওয়া হবে…এখন আপনারা যে যার ঘরে ফিরে যান, যা করবার আমরাই করছি!

—জী! জো হুকুম, থানাদার সাব! হাতজোড় ক'রে তারা সকলে আংরেজী সরকারের সেই মূর্ত বিগ্রহকে অভিবাদন জানায়·· জগতে তারা আর কোন জীবকে এতখানি ভয় করে না!

ছোট্ট গলি…দু'পাশের জানালায় কৌতূহলী সব মুখ…আশে পাশে চারদিকে ফিস-ফাস আওয়াজ…দু'ধারে জনতা…এতক্ষণ মজা দেখছিল… ভাল লাগছিল তাদের দেখতে শক্তির দাপট…তেজ সিং আর ইয়ার মোহম্মদ, একজন শিখ আর একজন মুসলমান…প্রভুদয়ালকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে…তার দুই গণ্ড বেয়ে নীরবে অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে…মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চেয়ে দেখে…অশ্রুজলে ঝাপসা চোখে পড়ে, জানালায় ম্লান প্রস্তরমূর্তি… পার্বতী…পাথরের কি অশ্রু আছে?

থানাদার গর্জন ক'রে ওঠে, পেছন ফিরে কি দেখছিস শূয়ার! সামনে দেখ…কতোয়ালী…

কতোয়ালীর বারাণ্ডায় এক চারপায়ার ওপর বসে গৌরবর্ণ এক মুসলমান ইনস্‌পেক্টর গড়গড়ার নলে মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিলেন।

থানাদার তার সামনে গিয়ে জানালো, আসামীকে যেমন ক'রে পার কবুল করাও, পাণ্ডে খাঁ! ধার ক'রে লোকদের ফাঁকি দিয়েছে…

চারপায়া ছেড়ে ইনস্‌পেক্টর ওপরিওয়ালাকে সম্মান দেখাবার জন্যে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর ভেতর থেকে একটা বেত নিয়ে আসে।

তেজ সিং আর ইয়ার মোহম্মদ দুদিক থেকে দু'জনে প্রভুদয়ালকে ভাল ক'রে ধরে।

বেত্ত আস্ফালন করতে করতে পাণ্ডে খাঁ হুংকার দিয়ে বলে ওঠে, ভাল-মানুষের মত বলে ফেলো তো···টাকাকড়ি সব কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? শিগ্‌গির···

হাত জোড় ক'রে প্রভুদয়াল বলে, হুজুর টাকা···আমার নেই···কোথোও লুকিয়ে রাখিনি! নেই তো লুকিয়ে রাখবো কি? কিন্তু আমার কারখানায় আমার মাল-পত্র আছে···আমি বলছি আমার পাওনাদারদের পাই পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেবো!

পাণ্ডে খাঁ গর্জন ক'রে ওঠে, খবরদার! কুত্তার মত কেঁউ কেঁউ ক'রে মিথ্যে বলবি না হারামজাদা!

প্রভুদয়াল আর্তনাদ ক'রে উঠলো, আমি সত্যি কথাই বলেছি হুজুর!

সোজা মুখের ওপর জোরে এক ঘা বেত বসিয়ে দিয়ে পাণ্ডে খাঁ ব্যঙ্গ ক'রে উঠলো, বেহেস্তের ফেরাস্তা আমার···সত্যি ছাড়া মিথ্যে জানেন না।

বদ্ধ হাত ওপরের দিকে তুলে প্রভুদয়াল চীৎকার ক'রে ওঠে, সত্যি··· সত্যিই বলেছি আমি।

—তাহলে বলতে চাস্ যে থানাদার সাহেব মিথ্যে বলছেন? পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর সাহেবও মিথ্যে বলছেন? দেরী করিস্ নি···শিগ্‌গির বল··· বল্ শিগ্‌গির···

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতের আঘাত তাল দিতে থাকে···প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে ওঠে···উত্তেজনা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মুন্নু আর তুলসী সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। তারা দু'জনেই আর থাকতে না পেরে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, দোহাই হুজুর···আর মারবেন না···আর মারবেন না···ওঁর দোষ নেই···দোষ যদি কারুর হয়ে থাকে তা গণপতজীর···

পাণ্ডে খাঁ নিশ্বাস নেবার জন্যে হাত থামায়।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সাহেব পাণ্ডে খাঁর গায়ে আঘাত ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলে, এই ভাবে জোরে মারো তবে না কাজ হবে!

তারপর কৌতুহলী জনতার দিকে ফিরে গর্জন ক'রে ওঠে, যাও···

সাহেবের কণ্ঠস্বরের রেশ থামতে না থামতে থানাদার হেঁকে ওঠে, এখানে কি চাস্ তোরা ? পালা···পালা এখান থেকে···মেলা বসেছে ? মেলা দেখতে এসেছিস বেটারা ? পালা বলছি !

বলতে বলতে থানাদার হাতের লাঠি দিয়ে মুন্নু আর তুলসীর ওপর দু'ঘা বসিয়ে দেয়।

প্রভুদয়াল বলে ওঠে, দোহাই হুজুর, মারতে হয় আমাকে মারুন নিরীহ ওরা—ওদের মারছেন কেন ?

পাণ্ডে খাঁ বেত উচিয়ে বলে, চুপ কর শূয়োরের বাচ্চা। নিজের পিঠ আগে সামলা···তোর ওপর দয়া করতে গিয়ে সাহেবের মার খেতে হলো আমাকে—তার শোধ আমি নেবো তবে ছাড়বো···

কথার সঙ্গে সঙ্গে বেত পড়তে থাকে···ক্রমে বেত আর দেখা যায় না··· বাতাসে শুধু বেত যাওয়া-আসার একটা ক্রমান্বয় শব্দ শোনা যায়···

জ্ঞানহারা প্রভুদয়াল যেন স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করে, ভগবান। ভগবান। ভগবান। তুমি কোথায় ভগবান।

দূরে সরে গিয়ে মুন্নু, তুলসী আর বোঙ্গা শুধু চেয়ে থাকে···একবার প্রভুদয়ালের দিকে···আর একবার নির্মম নির্মেঘ শূন্যের দিকে···অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন তাদের কে লৌহশলাকা বিদ্ধ ক'রেছে···কিন্তু চোখে তাদের অশ্রু নেই! যে যন্ত্রণায় বুক ভেঙ্গে পড়েছে···তারা জানে না কেমন ক'রে তাকে সহ্য ক'রে থাকা যায়···কেমন ক'রেই বা তাকে প্রকাশ করা যায়, তাও ভেবে পায় না তারা।

সেই অবস্থায় তারা তিনজনে বাড়ী ফিরে এলো···তাদের চেহারা দেখলে মনে হয়, যেন শ্মশান থেকে এই মাত্র কাউকে দাহ করে ফিরেছে···

উঠান পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো···তাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই—সমস্ত চুপ চাপ···থম্ থম্ ক'রছে···পার্বতীর চোখের জলে ঘর-দোর সব ভিজে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে মুন্নু দেখে, জানালার ধারে, মাটীতে পার্বতী পড়ে আছে···মনে হচ্ছে যেন তাঁর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাল পাকিয়ে গিয়েছে···অসাড় কি একটা যেন তাল পাকিয়ে পড়ে আছে। অন্তরের সহজ প্রেরণায় মুন্নু তাড়াতাড়ি তার দিকে ছুটে যেতেই ঘরের মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ছেলে বেলায় মাঠ থেকে কাজ সেরে কিম্বা খেলা শেষ ক'রে যখন সে বাড়ী ফিরত, তখন এমনি ধারা মাকে দেখলেই মার কাছে আগে ছুটে যেতে তার ইচ্ছা করতো···তেমনি সে আজও ছুটে এসেছিল কিন্তু আজ আর সে শিশু নয়··· তার মনের মধ্যে সে সহসা অনুভব করে, কিসের যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে···কিসে যেন আজ তার পা-কে আটকে ধরে···সে তেমন ক'রে পার্বতীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।

তুলসী ডেকে বলে, মুন্নু, বরঞ্চ একটু বাইরে ব'স···একটু বিশ্রাম কর্···

পার্বতীর অশ্রু-রুদ্ধ চাপা কান্না মুন্নুকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে···আশেপাশে সে কিছুই যেন দেখতে পায় না···কিছুই শুনতে পায় না।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ···বেদনা-বিদ্ধ অপরূপ নিস্তব্ধতা···কান্নার জোয়ার ভেঙ্গে পড়বার ঠিক পূর্ব-মুহূর্ত··সেখানে কোন শব্দ করা···এমন কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা···একটু নড়াচড়া···মুন্নুর মনে হলো যেন ঘোরতর অন্যায় হবে!

সেই সঙ্গে তার চিন্তার গতি পর্যন্ত যেন থেমে যায়···ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে সে ঘরের চারদিকে চেয়ে থাকে···মাজা বাসনগুলোর ওপর আলো পড়ে ঝিকমিক করছে···মাটীর কলসী দুটোর গায়ে হাতে-আঁকা ফুল-লতা-পাতা ···দড়িতে-ঝোলান বিছানার চাদরের গায়ে ছাপানো সব আমের ছবি···সব যেন তার চোখে এসে বিঁধতে থাকে···তাকে উত্যক্ত ক'রে তোলে···

ভেঙ্গে পড়লো জোয়ার চাপা-কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে। পার্বতী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। মুন্নু পারলো না আর চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে।

পার্বতীর পাশে ছুটে গিয়ে সে-ও কেঁদে ওঠে, আপনি উঠুন···উঠুন আপনি!

পাশে বসে নতজানু হয়ে পার্বতীর হাত ধরে সে টানে, উঠুন···পায়ে পড়ছি উঠুন!

পার্বতীর কান্না আরো তীব্র হয়ে ওঠে :

—ওরে, আমি কোথায় যাব···কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না রে !

আস্তে আস্তে মাথা তুলে মুন্নুর কাঁধের ওপর রাখে।

মুন্নুর মনে হয় পার্বতীর সেই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, তার অশ্রু-ধৌত গণ্ডের সেই সজল সুকোমলতা যেন তার চামড়া ফুঁড়ে ভেতরে গিয়ে লাগছে। সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

কান্না-ভাঙ্গা দু'টী ঠোঁটের মৃদু কম্পন ভুলে-যাওয়া কোন অস্পষ্ট স্মৃতিকে সহসা জাগিয়ে তোলে···একদা কবে বিস্মৃত-শৈশবের ঘুমে-ভরা রাত্রিতে এমনি ধারা স্নেহে-ভরা দু'টী ঠোঁটের মৃদু কম্পন তার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে মনের অবচেতনার অন্ধকারে ছিল সঞ্চিত হয়ে···আজ সহসা সেই অবচেতনার অন্ধকার তল থেকে তা' যেন ভেসে উঠলো সব চেতনার ওপরে।

মুন্নু আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরে পার্বতীকে···স্পষ্ট অনুভব করে কান্নায় কাঁপছে তার সারা দেহ···ছুঁড়ে ফেলে দেয় আত্ম-চেতনার নিগ্রহের বোঝা—হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সেই উত্তপ্ত স্পর্শের অন্তরঙ্গতার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের মত সে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে। চারদিকে তার অন্ধকার, ঘন অন্ধকার সে-অন্ধকার-সমুদ্রে যেন সহসা সে যায় তলিয়ে। এক দুরন্ত আবেগ বিপুল বেদনায় তার রক্তে তোলে ঢেউ···চোখ ফেটে সে ঢেউ তপ্ত অশ্রুতে পড়ে গড়িয়ে। অভূতপূর্ব বেদনার সুতীব্র পীড়নে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় দেহ মন।

চীৎকার ক'রে কেঁদে সে বলে ওঠে, কেঁদো না, তোমার পায়ে পড়ি, কোঁদো না মা।

কাঁদতে কাঁদতে পার্বতী বলে, তুই কাঁদিস না, বাছা···কাঁদতে নাই ওরে···

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ সিঁড়ির দিক থেকে যেন কার পায়ের শব্দ এলো···কে যেন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে···ক্লান্ত পদে···

কান্নার মধ্যে দিয়ে সে-শব্দ শুনতে পায় না পার্বতী আর মুন্নু।

হঠাৎ বাইরে থেকে তুলসী চীৎকার ক'রে উঠলো, মুন্নু···মুন্নু·· কত্তা ফিরে এসেছে···ওরে কত্তা ফিরে এসেছে!

টলতে টলতে প্রভুদয়াল ঘরে ঢুকেই একটা খাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এঁকি! তোমরা দু'জনে করছো কি? কাঁদছো? কেন আমি কি মরে গিয়েছি?

ম্লান···পাংশু···মুখ। সারা দেহ ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

মুন্নু ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে, তা'হলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা?

মুন্নুর দিকে চেয়ে নির্বাক পার্বতীকে শুনিয়ে প্রভুদয়াল বলে, হাঁ···ছেড়ে দেবে না তো কি? মিছি মিছি···উঃ···কোন ওয়ারেন্ট নেই···কোন প্রমান নেই! দেউলে আমি···কিন্তু কারুর পাই-পয়সা আমি মারবো না···উঃ ···অকারণে পুলিসের লোকেরা আমাকে মারলো···আমার হাড় যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে গো—একটা লেপ,···কাঁথা···যা হোক কিছু দাও ··ভয়ানক শীত করছে···উঃ···

প্রভুদয়াল কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়াতে লুটিয়ে পড়ে···বিকারের ঝোঁকে অস্পষ্ট কি সব বকতে থাকে···

অবশেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ে···ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে কাল-শিরার দাগগুলো ফুলে উঠেছে···চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে···

ডাক্তার আনবার জন্য তুলসী, মহারাজ আর বোম্বাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।

পার্বতী সজোরে কান্না রোধ ক'রে লেপ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দেয়···তারপর ···স্বামীকে জড়িয়ে ধ'রে বিছানার পাশেই লুটিয়ে পড়ে।

[পাঁচ]

গভীর রাত্রিতে তুলসী আর মুন্নু নীরবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। এতদিন যার অন্ন খেয়ে এসেছে, আজ যদি তার দুর্দিনে, তাকে তারা একটুও সাহায্য করতে পারে!

পথ চলতে চলতে তুলসী বলে, যেমন ক'রেই হোক, কিছু রোজগার করতে হবে কত্তার জন্যে···

মুন্নু বলে, আমিও তাই ভাবছি···কিন্তু কি করতে পারি?

—মোট বইবো। ভোর না হতেই গমের বাজারে মুটের দরকার হয়। মোট পেতে হলে, রাত্তির বেলা বাজারের কাছেই কোথাও বাইরে শুয়ে থাকতে হবে···

তাদের পাড়ার গলি ছাড়িয়ে, পাপাদ্রুম্ বাজার পেরিয়ে, তারা চলে গমের বাজারের দিকে। কারুর মুখে আর কোন কথা নেই।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নাম-মাত্র চাঁদ আছে। তেমনি গরম, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। সারাদিনের উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে দেহ আর চলে না। পথ চলতে যেন ভেঙ্গে পড়ে। একমাত্র চিন্তা, কোনরকমে কোথাও যদি দেহটাকে এলিয়ে দেওয়া যায়···বিশ্রাম···শান্তি।

গমের বাজারে পৌঁছে দেখে, শোবার জায়গা বলতে কোথাও কিছু নেই। চারদিকে গমের সব আড়ৎ, মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে তাদের আগে থাকতেই মানুষে আর জন্তুতে মিলে জায়গাটা দখল ক'রে নিয়ে আছে। গরুর গাড়ী, বিচুলি, শুকনো ঘাস···সারাদিনের আবর্জনা···তারই মধ্যে সারাদিনের খাটুনির পর, যে যেখানে পেরেছে মাটীতে শুয়ে প'ড়েছে··· গরু, মোষ, মানুষ···সব এক সঙ্গে। বদ্ধ-হাওয়ায় পচা খোলা ড্রেণের দুর্গন্ধের সঙ্গে, গোবর, চোণা, গম-পচানি, কুলিদের গায়ের ঘেমো-গন্ধ, আর তার সঙ্গে পুরুষ-মোষের গায়ের বোটকা গন্ধ মিশে এমন এক অপরূপ সুবাসের সৃষ্টি করেছে যে মুন্নুর দম আটকে আসতে লাগলো।

তবুও কোথাও এতটুকু স্থান পড়ে নেই।

হঠাৎ মুন্নুর মনে হলো, সারা গায়ে একসঙ্গে কে যেন হাজারটা পিন্ ফুটিয়ে দিল। দু'হাত তুলে সে চীৎকার ক'রে উঠতে গিয়ে দেখে, তুলসীরও সেই অবস্থা!

—ওঃ, বাবারে! কি মশা! শালা...

অন্ধকারে কে একজন কুলি বলে উঠলো, শালা বলে কোন্ শালারে?

তুলসী আর মুন্নু দেখে, তাদের পায়ের কাছেই একজন কুলি শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি তুলসী বুঝিয়ে বলে, আরে ভাই, তোমাকে বলবো কেন? এই মশাকে বলছিলাম···উঃ কি মশা!

এমন সময় পেছন থেকে আর একজন জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো, কে হে?

তুলসীর গায়ে একটা ফরসা জামা ছিল, তাই মুন্নুর ভয় হলো, সে যদি কুলি ব'লে পরিচয় দেয়, হয়ত তারা বিশ্বাস ক'রবে না। তাই নিজের খালি গায়ের দিকে চেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত ভাবেই মুন্নু বলে উঠলো, আমরা কুলি!

—এখানে আর কারুর জায়গা হবে না···ভাগো ··

এবার যে লোকটী কথা বলে উঠলো, মুন্নু চেয়ে দেখে, তার সর্বাঙ্গ অন্ধকারে চিকমিক্ করছে। মশার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য লোকটা সারা গায়ে তেল মেখে শুয়ে আছে।

সত্যিই সেখানে কোথায় জায়গা? কোন রকমে লোকের গা বাঁচিয়ে সেই জ্যান্ত গোলক-ধাঁধার মধ্যে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে।

—কৌন্ রে?

হঠাৎ অন্ধকার চিরে একটা গম্ভীর আওয়াজ আসে। একধারে এক খাটিয়ার ওপর চৌকিদার সাহেব লাঠি পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন।

মুন্নু আর তুলসী থমকে দাঁড়ায়।

চৌকিদার হাঁকে, চোর নাকি রে?

—না, আমরা কুলি! মুন্নু জবাব দেয়।

—আরে, এখান থেকে সরে পড়্…এক্ষুণি সরে পড়্…এ দোকানের সামনে কেউ শুতে পারবি না…লালা তোতারাম দোকানের আশে-পাশে কাউকে থাকতে দেয় না…দোকানে তহবিল থাকে কিনা !

—জো হুকুম মহারাজ !

চৌকিদার সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে তুলসী, মুন্নুর হাত ধরে উত্তর-মুখো খানিকটা খোলা জায়গা দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায়। কাছে যেতেই মনে হলো অন্ধকারে মাটীতে, কারা যেন নড়ে উঠলো। কত লোক যে পাশা-পাশি গড়াগড়ি দিচ্ছে…তার কোন আন্দাজই তারা করতে পারে না। তবে ঘুমোবার প্রাণান্ত চেষ্টায় তারা কেউই ঘুমোতে পারছে না। এ-পাশ, আব ও-পাশ ফিরছে…কাশছে…থুতু ফেলছে…আর সেই অনড় অচল দুর্দান্ত গরমকে অভিশাপ দিয়ে যে যার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করছে…রাম-রাম, হরি-হরি…মহাদেও…

ঠাকুর-দেবতার নাম শোনবার মত মনের অবস্থা তখন মুন্নুর ছিল না। বিশেষ ক'রে, আজ একটু আগেই প্রভুদয়ালের দুর্দশা দেখে তার মনে ঘোরতর সন্দেহ এসে গিয়েছিল, সত্যি সত্যি ভগবান বলে মাথার ওপরে কেউ আছে কিনা…আর থাকলেও, লোকে কেন তাকে দয়াময় বলে !

তুলসীকে সেখান থেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে মুন্নু দেখলো এক জায়গায় রাশীকৃত ভর্তি বস্তি থাকের পর থাক উঁচু হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর একটা মস্ত বড় তেরপলিন ঢাকা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ মুন্নুর মাথায় একটা মতলব এসে গেল…এর ওপর তো দিব্য শুয়ে থাকতে পারা যায়! বনবিড়ালের মত সে বস্তার ওপর পা রেখে রেখে ওপরে গিয়ে উঠলো এবং হাত বাড়িয়ে তুলসীকেও তুলে নিল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখলো, না, চৌকীদার দেখতে পায়নি।

সেইখানেই শ্রান্ত দেহ কোন রকমে বেঁকিয়ে এলিয়ে দিল।

রাত্রির গুমোট কেটে কখন ধীরে ধীরে উঠেছে উষার মৃদু-মন্দ বাতাস…

ঘুমের মধ্যে তা লক্ষ্য না করলেও, সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম নিবিড় হয়ে ওঠে…মুন্নু আরামে গমে-ভর্তি বস্তাকেই জড়িয়ে ধরে, যেন বস্তা নয়, নিদ্রা-তপ্ত নারীর কোল। বাইরে তখন পাশের তাঁতি-পাড়ায় মোরগেরা নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী প্রভাতী-বন্দনার ডাক তুলছে, দোকানের চালে, গাছের ডালে চড়ুই পাখীরা সুরু করেছে কিচিরমিচির, প্রভাতের এই প্রাথমিক ঐক্যতান-বাসরে কাকেরাও হয়েছে জমায়েৎ। অভ্যাসবশে কুলিরা সেই শব্দে যে-যার মাটীর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে…সেই সঙ্গে পাড়ার খোঁড়া কুকুরটা, গরুর গাড়ীর গরুগুলো এবং স্থানীয় ভক্তিমান্ সব হিন্দু আড়ৎদাররাও জেগে যে-যার কাজ সুরু ক'রে দিয়েছে। জাগতে পারেনি শুধু তুলসী আর মুন্নু।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূঁচের মত সকালের তাজা রোদ তাদের দেহে এসে বিঁধতেই, মুন্নু ধড়মড় করে উঠে বসলো…গলা শুকিয়ে কাঠ…ঠাণ্ডায় চোখ গিয়েছে জুড়ে…সারা অঙ্গ ব্যথায় ভারী। কোন রকমে হাত দিয়ে সে তুলসীকে ঠেলে তোলে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে তুলসী উঠে বসে।

মুন্নু চারদিকে চেয়ে দেখে, ভাবে, এখন কি ক'রে সুরু করা যায় কাজ।

আড়তে তখন দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিস্মিত হয়ে মুন্নু দেখে, এমন বিচিত্র মানুষের সংমিশ্রণ সে এর আগে আর কখনও দেখে নি! হিন্দু কুলি সে অনেক দেখেছে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন ধর্মের এত লোক, এত কাছাকাছি এমনি ভাবে সব এক সঙ্গে উঠছে, বসছে, খাচ্ছে, শুচ্ছে সে ধারণাই করতে পারে না। সকলের চেয়ে তার আশ্চর্য লাগলো, কৈ কেউ তো জাত গেল বলে কোন প্রতিবাদ করছে না! প্রতিবাদ যে করছে না, তাতে মুন্নু মনে মনে খুশীই হয়। এই খুশী হবার পেছনে, একটা ব্যক্তিগত কারণ লুকিয়ে ছিল। রোজ বাজারের পথ দিয়ে যেতে সে দেখতো, মুসলমান সরাইওয়ালার দোকানে গোস-রুটি দেখে দেখে তার জিভে জল আসতো! সেই ফুলো ফুলো মোটা মোটা রুটিগুলো যেন তাকে ডাকতো। একদিন সে লুকিয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ে এবং

আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত ক'রে যখন বেরিয়ে আসে, তখন সে নিজের মনে আত্ম বিচার ক'রে দেখেছিল...বিশেষ কোন একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল বলে তার মনে কোন বৈলক্ষণ দেখা গেল না...শুধু একটা নতুন অভিজ্ঞতা তার হলো, মাংসটা হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরাই রাঁধে ভাল। তাই আজ যখন সে চোখের সামনে দেখলো, একজন রাজপুত হিন্দু-কুলি বিনা দ্বিধায় একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান কুলির মুখের হুকো টেনে নিয়ে আরামে ধোয়া বার করছে, তার স্পষ্টই মনে হলো, জাত গেল বলে এদের মনে তো কোন দুশ্চিন্তাই নেই!

হঠাৎ সে চিন্তা-স্রোত ব্যাহত হয়। নিজের ভাবধাটাই বড় হয়ে ওঠে... কি ক'রে কাজ আদায় করা যায়?

তুলসীকে ঠেলে সে বলে ওঠে, আরে, চল্, চল্, তুলসী! ঐ দেখ...ঐ দোকানটা খুলছে...দলে দলে কুলি ছুটছে...আমরাও যাই...

সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে তারা সেই দোকানের দিকে ছুটে চলে।

দোকানের সামনে এসে দেখে, এমন ভিড় লেগে গিয়েছে যে দরজার কাছে পৌঁছবার কোন উপায়ই নেই। সবাই পাগলের মত চেষ্টা করছে আগে গিয়ে ঢুকবে বলে। ঢোকবার জন্যে পেছন থেকে মুন্নু নানা রকম কসরৎ করে কিন্তু বলিষ্ঠতর কুলিদের ধাক্কায় সে বারবার ছিটকে বাইরে গিয়েই পড়ে। হঠাৎ তার মাথায় এক ফন্দী এলো। পায়ের তলা দিয়ে যদি গলে যাওয়া যায়! কিন্তু দু'এক পা এড়িয়ে যাওয়ার পরেই সে বুঝলো, আর চেষ্টা করলে তাকে কুলিদের পায়ের তলাতেই থেকে যেতে হবে। অগত্যা তাকে ফিরে আবার পেছনেই আসতে হলো। দরজার সামনে তখন কুলিরা চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছে।

দরজার ওপারে লাঠি হাতে আড়ৎদার গালাগাল দিয়ে উঠছে, পিছু হট্ যাও...হট্ যাও...শূয়ার কা বাচ্চা...

কে একজন চীৎকার ক'রে আবেদন জানায়, লালাজী আমি ঝণ্টু কাল আমিই হুজুরের মোট বয়েছিলাম...ও লালাজী...

লালাজী তাদের সকলকে একসঙ্গে উত্তর দেয়, হট্ যাও…হট্ যাও হারামজাদা!

আরে লালাজী…ওরা কি মোট নেবে, আমি একা দু'মন একেবারে নেবো—ও লালাজী…

—এমনি হুড়োহুড়ি করলে কোন শালাই পাবে না…হটো…হটো বদমাস…

—লালা—আরে লালা…এক আনায় এক মোট…যেখানে যেতে বলবি যাবো…আরে লালা…

—ফের্…চিল্লাও মত… হটো…হটো শূয়ার কা বাচ্চা

—লালাজী…আরে লালাজী…

পেছন থেকে মুন্নু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে…

কয়েক সেকেণ্ড পরে, সেই সঙ্গে কানে আসে খালি পিঠে…শুকনো হাড়ে লাঠির আওয়াজ।

এমন সময় কে একজন বলে ওঠে, আরে, লালা ঠাকুরদাসের আড়ৎ খুলছে, কথা শেষ হতে না হতে সেই দঙ্গল উল্‌টে ঠাকুরদাসের দোকানের দিকে ছুটতে আরম্ভ করে।

তুলসী বলে, চল্…আমরাও যাই।

মুন্নু বলে, চুপ্…ওরা যাক্ না…ভিড় কমে যাবে…তখন আমরা এখানেই কাজ পাবো। মুন্নুর কথাই ঠিক হয়। ভিড় কমে আসে—মাত্র জনা সাতেক কুলি থাকে।

লাঠিটা একপাশে রেখে দিয়ে, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আড়ৎদার বলে ওঠে, ব্যাটাদের জ্বালায় সকাল বেলা গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেল…আয়… ঐ রহমতের মোষের গাড়ীতে মোট তোল্…ষ্টেশনে যাবে…

আড়তের ভেতরে স্তূপীকৃত বস্তার সামনে দাঁড়িয়ে মুন্নু দেখে প্রত্যেক বস্তার গায়ে লেখা, র‍্যাল্লি ব্রাদার্স এক্‌স্‌পোর্টার…করাচী…প্রেরক—গোকুলচাঁদ মেহেরলাল।

মুন্নু মনে মনে বৃথাই চেষ্টা করে কথাগুলির সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে… ভারতবর্ষ থেকে কোন্ অর্থনীতির নিগূঢ় নির্দেশে ইংলণ্ডে চালান যায় গম… তা বোঝবার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি তার ছিল না। শুধু "র‍্যালি" কথাটা সে বার বার নিজের মনে আওড়াতে থাকে…কথাটার যেন একটা নিজস্ব সুর আছে …বলতে ভাল লাগে…

একে একে কুলিরা বস্তায় কাঁধ লাগায়। তুলসী ও মুন্নু দাঁড়িয়ে দেখে, কি ক'রে মোট তুলতে হয়। দেখে, বস্তা তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ যেন কেমন বিচিত্রভাবে ভেঙ্গে গেল…কারুর দেহ কেঁপে উঠলো…তবু কাঁপতে কাঁপতে তারা কেমন এগিয়ে চল্লো…

মুন্নু তাদের দেখাদেখি প্রথমে থুতু দিয়ে হাতের তেলোটা ভিজিয়ে নিল …তারপর ঠিক তাদের মতন, জোরে একটা দম নিয়ে নীচু হয়ে বস্তার কাছে কাঁধ নিয়ে গেলো কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখে, যেখানকার বস্তা সেইখানেই থেকে যাচ্ছে। কিছুতেই তার কাঁধে আর উঠছে না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর মুন্নুর মনে হলো, বোধ হয় কুলিরা একটা কিছু গোপন কায়দা জানে, সেটা সে ঠিক লক্ষ্য করেনি, যার জন্যে সে কিছুতেই তুলতে পারছে না। নিজেই সে চেষ্টা করে, চেষ্টা করতে করতে যদি সে-কায়দাটা বেরিয়ে পড়ে। ঘামে তার সারা দেহ ভিজে উঠলো কিন্তু কিছুতেই সে-কায়দার খোঁজ সে পেলো না। বস্তাও তুলতে পারলো না।

একদফা তুলে দিয়ে কুলিরা তখন দোসরা দফার জন্য এসেছে। মুন্নু তখনও প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

তার দুরবস্থা দেখে একজন কুলি বলে উঠলো,

—আরে…একি তোর কাজ? মারা পড়বি…তার চেয়ে তরিতরকারির বাজারে যা…সেখানে হাল্কা মোট পাবি…বুঝলি?

মুন্নুকে রোজগার করতেই হবে…তার মনিব আর মনিবাণীর আজ বড় অভাব।

তুলসীকে ডেকে বলে, এই, তুই আমার পিঠে বস্তাটা তুলে দেতো একটু!

তুলসী তাই দেয়।

মোট নিয়ে মুন্নু কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। মনে হয়, ওপর থেকে কে যেন দেহটাকে মাটির দিকে টানছে। শরীরের সমস্ত শক্তি জড় ক'রে সে পা বাড়ায়···এক পা···দু পা···তিন পা। তারপর বোঝার ভারে সে আপনা থেকেই খানিকটা এগিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে বাধা পড়ে। দরজাটা ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। ডিঙ্গোতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে যায়। মোট শুদ্ধ মুন্নু মাটিতে ছিটকে গিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ভেতর থেকে আড়ৎদার ক্ষেপে ছুটে আসে, মুন্নুর মা এবং বোনের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক স্থাপন ক'রে সে চীৎকার ক'রে ওঠে, ব্যাটার ছেলে, মার পেট থেকে বেরিয়ে এসেই মোট বইতে এসেছ! কে তোকে বস্তায় হাত দিতে দিলো রে হারামজাদা! বেরো···বেরো এখুনি··· নইলে খুন করে ফেলবো···

কোথায় লাগলো তা' দেখবার কোন চেষ্টাই না ক'রে, কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করে···যার দোকানের সামনে দিয়ে যায়, সে-ই হৈ হৈ ক'রে গালাগাল দিয়ে ওঠে। মুন্নু প্রাণভয়ে ছুটতে আরম্ভ করে।

কিছু দূর চলে আসবার পর পেছন ফিরে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দর দর ধারায় তখন সারা দেহ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। সে স্পষ্ট অনুভব করে সারা দেহ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। একটা বাড়ীর ছায়ায় সে বসে পড়ে।

মনে ভাবে, তুলসীর বরাত ভাল···সে মোট বইছে···চার আনা নিশ্চয়ই সে রোজগার ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবে···আর অমি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না?

নিজের দুর্বলতায় নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হয়। কবে বড় হবো··· দরকার হলে এমনি মোট অনায়াসে বইতে পারবো?

হঠাৎ তার মনে হলো, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারা সবাই যেন তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। লক্ষ্য ক'রে দেখে বুঝলো, এটা বাজার যাবারই পথ। সকাল বেলা লোকে বাজারে চলেছে। মনে পড়লো সেই কুলির কথা —বাজারে হাল্কা মোট ব-গিয়ে যা···

মুন্নু ঠিক করলো, বাজারেই সে যাবে…পয়সা না নিয়ে সে বাড়ী ফিরবে না।

বাজারে ঢুকে সে চারিদিকে চেয়ে দেখে। ফলের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখে, ঝুড়ি ঝুড়ি সব পাকা আম। পাকা আমের মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে। গাছ-পাকা…তাজা…সোনালী হলদে রঙ…মুন্নুর শুক্‌নো জিভ সজল হয়ে আসে…

—আরে…এই…দুটো পয়সা পাবি…এই মোটটা নিয়ে যেতে পারবি?

মুন্নু ফিরে দেখে এক ফলওয়ালা একটা ঝুড়ি নিয়ে তাকে ডাকছে!

কিন্তু তার সাড়া দেবার আগেই কোথা থেকে আর পাঁচ জন মুটে ছুটে গিয়ে দোকানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—আমি যাবো…হুজুর…

—আমি যাবো…রাজা…

মুন্নু সোজা গিয়ে ঝুড়িটাকে আঁকড়ে ধরে। ফলওয়ালার হাত থেকে টেনে নিয়ে মাথায় তুলে নেয়। এতে আর কোন হাঙ্গামা নেই…দিব্যি হাল্কা। কিন্তু মাত্র দুটো পয়সা!

মুন্নু ফলওয়ালাকে অনুসরণ ক'রে চলে। পথ চলতে চলতে তার মনে পড়ে, স্কুলে একটা প্রবাদবাক্য সে পড়েছিল, হায় ভগবান্! তোমার রাজ্যে এক মুঠো অন্ন…সে এমনি দুর্মূল্য…আর মানুষের প্রাণ, সে এতই সস্তা!

প্রতিদিন প্রভাতে মুন্নু ঘুম থেকে উঠেই বাজারে চলে আসে, তুলসী যায় গমের আড়তে। দিনের শেষে তাদের দু'জনের রোজগার মিলিয়ে কোনদিন আট আনার বেশী হয় না। তুলসী ছ'আনা…মুন্নুর দু'আনা। তাই রোজগার করতে চলে যায় তাদের সব মেহনৎ…তাতেও হয় না, যদি না থাকে আবার ভাগ্য!

ছোট্ট বাজারে…নির্দিষ্ট দোকান। সে অনুপাতে মুটের সংখ্যা প্রচুর এবং সে সংখ্যা নিত্যই চলেছে বেড়ে। মোট না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে সারাদিন সারারাত…তাই মোটের দিকে তারা যখন হাত বাড়ায়, পেটে তখন তাদের জ্বলতে থাকে আগুন…সে আগুনের তাড়নায় ভুলে যায় তারা

অপরের কথা···একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আর একজন এগিয়ে যেতে চায় ···পাগলের মত। মোট নয়···অস্ত্র···লাঠিতে পিঠে কাল-শিরা পড়ে···মুন্নু নিজে দেখেছে, একদিন আড়ৎদারের লাঠির আঘাতে একজনের একটা দাঁতই গেল ভেঙে। শুধু এক আনা পয়সা···তাও যদি না জোটে···তারা প্রতিবাদ করে না—নিঃশব্দে মেনে নেয় সে-পরাজয়···ভাগ্যে নেই, তাই জুটলো না। তাদের ভাগ্য থাকে আড়ৎদারের খেয়ালের ওপর। যারা বলিষ্ঠ, সমর্থ, তারাই যে মোট পাবে এমন কিছুর স্থিরতাও নেই। যে কোন লালাজী বা তাঁর বালক-পুত্র, যাকে খুসী তাকে দিতে পারে···বা না দিতে পারে···এক আনার মোট না দিয়েও অবস্থা বুঝে দু'পয়সাতেই এক মোট বয়াতে পারে।

মুন্নু ক্রমশ দেখলো বাজারে এত বেশী মুটে যে মোট পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্যে সে মাথা থেকে একটা নতুন বুদ্ধি বার করলো। বাজারে না ঢুকে, বাজারে আসবার আশে-পাশের ছোট গলিতে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যদি কোন ভদ্র-মহিলাকে দেখে মনে হোত যে বাজার করতে যাচ্ছেন, অমনি তাঁর সামনে বোকা-হাবার মতন মুখ ক'রে গিয়ে দাঁড়াত, যতদূর সম্ভব মিষ্টি ক'রে ছোট গলায় বলতো, বাজার ক'রতে যাচ্ছেন বুঝি মা?

তারপর হাত জোড় ক'রে বলতো, আপনার বাজার আমি বয়ে দেবো, কেমন?

উপযাচক বুঝে কোন কোন মহিলা বলে বসতেন, এক পয়সায় যদি নিয়ে যাস তো দিতে পারি?

—দোহাই গো মা···দুটো পয়সা···দুটো পয়সা মাগো!

মোট আদায় করবার জন্যে সে ইচ্ছে ক'রেই মা ডাকটা ভাল ক'রে আয়ত্ত ক'রেছিল এবং বলবার সময় রীতিমত চেষ্টা ক'রে বারবার সেই একটা কথার উপরেই জোর দিত। অনেক সময় তাতে কাজ হতো!

নাছোড়বান্দা দেখে কেউ কেউ বলে উঠতেন, মর ছোঁড়া···আয়!

তখন মহিলাটীর হাত থেকে বাজারের থলে বা ঝুড়ি সে তখনি ছাড়িয়ে নিত···সেটী সামনে বাড়িয়ে রেখে সে অন্য কুলিদের সগর্বে জানিয়ে দিত যে আজ অন্তত এ-ক্ষেত্রে মোট বইবার তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ এ কায়দাটা অন্য মুটেদের নজরে পড়লো। কয়েকদিন পরেই মুন্নু দেখে, আশেপাশের গলিতে মুটেরা তার মতন মা-মা ক'রে বেড়াচ্ছে।

অন্য উপায় কিছু বের করতে হয়। তীব্র প্রতিযোগীতা।

একদিন হঠাৎ সুযোগ বুঝে সে মুটে-মহলে প্রচার ক'রে দিল, কাল বাজার বন্ধ থাকবে।

পরের দিন ভোর না হতেই বাজারে গিয়ে দেখে যে তার ফন্দী ফলেছে। মুটেরা বিশেষ কেউ আসেনি। কিন্তু দু'একবার এ রকম করতেই সে ধরা পড়ে গেল। মুটেরা বাজারে না এলেও বাজারের আশেপাশেই তারা থাকতো, ঘুরতো ফিরতো আড্ডা দিত। বেলা হতেই তারা জানতে পারতো বাজার রীতিমত বসেছে। এ শুধু সেই ছোঁড়াটার বদমায়েসী। এইভাবে বাজারের মুটে-মহলে বদমায়েস ফন্দীবাজ বলে মুন্নুর নাম রটে গেল।

বাধ্য হয়ে তখন মুন্নুকে রীতিমত মাথা ঘামাতে হয়। একটা জিনিস সে লক্ষ্যও করেছিল। যখনি কোন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলা বা কোন তরুণী বাজার ক'রতে আসতো, মুটেরা তার পিছু পিছু সকলে ছুটতো,—মোট পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও, শুধু তার দিকে চেয়ে থাকবার সৌভাগ্য তো জুটতো! মুন্নু ঠিক করলো, সব চেয়ে কুৎসিৎ যে-সব বুড়ী আসবে, তাদের শরণাপন্ন সে হবে। সেখানে প্রতিযোগীতা কম। তবে কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলো, তাতে অসুবিধা অনেক। সাধারণত এই ধরণের বুড়ীরা আধ ঘণ্টা ধরে দর কষাকষি করবে···তারপর আধ-পয়সায় যদি হয় একটা পয়সা দেবে না···সারাদিন ধরে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরবে···যে-দোকানে যাবে, সেখানেই পয়সা গুণতে আরো আধ-ঘণ্টা লাগিয়ে দেবে···তারপর ঠুক ঠুক ক'রে দু'মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে যখন দেবে তখন আর বাজারে এসে অন্য মোট বইবার সময় থাকবে না।

এই ভাবে সারাদিনের পর তুলসী আর সে যে আনা-আটেক পয়সা রোজগার ক'রে নিয়ে আসতো, তাতে সকলের কোন রকমে নুন-ভাত আর শাক-চচ্চড়ী জুটতো।

প্রভুদয়ালের গায়ের ব্যাথা সারতে এবং জ্বর ছাড়তে কিছু সময় লাগলো কিন্তু জ্বর থেকে উঠেই সে আবার বিছানা নিতে বাধ্য হলো। নীলামে একটা একটা ক'রে তার কারখানার সব জিনিস তার চোখের সামনে বিক্রী হয়ে গেল। তার ফলে তার স্নায়ু একেবারে ভেঙ্গে পড়লো এবং পক্ষাঘাত রোগীর মতন অবশ হয়ে সে শয্যা নিল।

সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে শুয়ে শুয়ে সে যখন ভাবতো, তুলসী আর মুন্নু তার জন্যে কুলিগিরী ক'রে পয়সা নিয়ে আসছে,—সে আরো অবশ হয়ে পড়তো। নিজের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সে জানতো, কুলিগিরী করা মানে কি।

ক্রমশ তার অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগলো। ডাক্তার যাঁরা আসতেন, ভিজিটের অভাবে তাঁরা আসা বন্ধ ক'রে দিলেন। এবং শেষজন যাবার সময় উপদেশ দিয়ে গেলেন, শহর থেকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে বাঁচার আর কোন আশাই নেই।

বহু কষ্টে প্রভুদয়ালকে গাঁয়ের বাড়ীতে যাবার জন্য রাজী করানো হলো। ঠিক হলো তুলসী রেলে পাঠানকোট পর্যন্ত সঙ্গে যাবে···সেখানে গরুর গাড়ীতে তুলে দিয়ে সে ফিরে আসবে। মুন্নুও সেই সঙ্গে যেতো কিন্তু সকলের রেল-ভাড়া যোগাড় হয়ে উঠলো না। পরে সময় মত মুন্নু তাদের কাছে গিয়ে উঠবে।

বিদায়ের দিন এলো অসহ্য বেদনা নিয়ে।

পার্বতী আর প্রভুদয়াল শিশুর মত কেঁদে উঠলো।

মুন্নু এসে প্রভুদয়ালকে একদিনও কাঁদতে দেখেনি। যে-মুখ সর্বদাই তার দিকে চেয়ে হেসেছে, আজ রোগে শোকে সেই মুখ ম্লান, শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে···তাই যখন প্রভুদয়াল বালকের মতন কাঁদতে লাগলো, সে-মুখের বিচিত্র রেখা দেখে মুন্নু স্তম্ভিত হয়ে গেল···তার কাছে পর্যন্ত সে এগুতে পারলো না।

কিন্তু যেই পার্বতী বিদায়ের জন্য তার কাছে এসে দাঁড়ালো, অমনি সে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো…মনে হলো তার বুকের ভেতর যেন একটা ছোট্ট ভীরু পাখী ম্লান মসৃণ অন্ধকারে অসহায় ভাবে ডানা ঝাঁটা দিয়ে মরছে… মনে পড়ল্যো, যেদিন সে প্রথম এই বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছিল, একটি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ শুধু একটুখানি হেসে তার মনের সব ভয় দূর ক'রে দিয়েছিল… বিপুল বিশ্বে সে হাসি-টুকুর মধ্যে নিমিষে সে খুঁজে পেয়েছিল তার নিজের ঘর …আজও সে অনুভব করে তার অসুখের সময়ে সেই উত্তপ্ত স্পর্শ যা…

সহসা সে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে…নিজেকে বাহুর বন্ধন থেকে ছিন্ন ক'রে নেয়। পার্বতী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

তুলসী এসে খবর দেয়, একটা গরুর গাড়ী সে ঠিক করেছে…গাড়ীটা গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে উঠতে হবে।

তুলসী আর মুন্নুর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে, প্রভুদয়াল যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ঘরের বাইরে পা বাড়াবার আগে, পেছন ফিরে সে একবার দেখে নেয় ঘরখানা, তার সৌভাগ্য-দিনের সব মুহূর্তগুলি কেটেছে যেখানে। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখে, সামনে একটা কুলি মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে… মোট বলতে শুধু একটা বাক্স আর বিছানা। ঠিক এমনি একটা বাক্স আর বিছানা নিয়ে একদিন সে এই বাড়ীতে ঢুকেছিল। আর আজ এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সময়ও, তার সঙ্গে তার যথা-সর্বস্ব বলতে সেই দুটী জিনিস। মাঝখানে সে যা কিছু পেয়েছিল, সবই যেন নিরর্থক।

রোগশীর্ণ ম্লান মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে দার্শনিকের মত সে বলে ওঠে, এই ভাল ‥ এমনি ধারাই ঠিক…খালি হাতে পৃথিবীতে আমরা আসি‥ খালি হাতেই সেখান থেকে চলে যেতে হয় একদিন। একটা কুটোও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পাবে না কেউ…পথ চলতে বোঝা যত হাল্কা হয়, ততই ভাল।

মুন্নু আর তুলসীর কাঁধে ভর ক'রে প্রভুদয়াল রাস্তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ায়…ক্লান্ত ‥পরিশ্রান্ত…পরাজিত। ধীরে অতি ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চলে।

মাথায় ঘোমটা দিয়ে পেছনে নত মস্তকে চলে পার্বতী।

পাড়ার ছেলে-মেয়ে সবাই উঠানে নীরবে দাঁড়িয়ে।

—রাম···রাম···প্রভুদয়াল ভাই···

—রাম···রাম···

···সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই! আমরা বলছি তোমার সব আবার ফিরে আসবে···শরীরটা সারিয়েই তুমি চলে এসো···

—দেউলের বদনাম দূর ক'রে যদি ফিরে আসতে পারি···তবেই···বাইরে গাড়োয়ান দেরী দেখে হাঁক দেয়। সে মনে মনে আঁচ করেছিল, নিশ্চয়ই কোন বড় রইস হবে···রীতিমত দু'পয়সা বখ্‌শিস আদায় করতে হবে। কিন্তু যখন দেখলো একদল কুলির সঙ্গে একজন কুলির মতন লোক মাত্র একটা ছোট্ট বাক্‌স নিয়ে গাড়ীতে উঠলো, রাগে তার সর্ব-শরীর জ্বলে উঠলো। প্রভুদয়াল সদলে গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ী হাঁকিয়ে চল্লো·· কোন রকমে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ফেলে দিয়ে নতুন সোওয়ারীর সন্ধান তাকে করতে হবে। চাবুকের তাড়ায় গরু দুটী ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো এবং রাস্তার গুণে গাড়ীতে এমন ঝাকুনি সুরু হলো যে আরোহীদের আসনে বসে থাকা দায় হয়ে উঠলো। একে এসব গাড়ীতে কোন স্প্রিং-এর বন্দোবস্ত থাকে না, তারা ওপর অতিরিক্ত জোরে চালানোর জন্যে ঝাকুনিতে প্রভুদয়াল রীতিমত কাতর হয়ে পড়লো। রোগশয্যার দুর্বলতা তখনও তার বিন্দুমাত্র কাটেনি, মনে হচ্ছিল এই বুঝি 'হার্টফেল্' করে। কিন্তু মুখে সে কোন কিছুই প্রতিবাদ জানালো না। সব প্রতিবাদকে সে আজ স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু মুন্নু স্থির থাকতে পারলো না। গাড়োয়ানকে খুসী করবার জন্যে সে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো, শেখ সাহেব···বলি ও শেখ সাহেব···দয়া ক'রে ভাই একটু আস্তে চালাও!

গাড়োয়ান চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে জবাব দেয়, আরে রাখ্‌ রাখ্‌, আমি তোর বাপের চাকর, না? তোর জন্যে বোম্বে মেলের প্যাসেঞ্জার আমি 'মিস্' করবো, না?

মুন্নুর রাগ হয়। কিন্তু নিষ্ফল রাগ। মনে মনে ভাবে, তার মনিবের মতন এমন ভাল লোকের ওপর লোকে কি ক'রে এমন নিঠুর হতে পারে?

ষ্টেশনে এসে মুন্নু দেখে থার্ড ক্লাশের যাত্রীরা একটা খাঁচার মতন ছোট জায়গায় সবাই গাদাগাদি ক'রে জড় হয়ে আছে। বাক্স, পোঁটলা, মানুষ··· সব এমন ভাবে সেই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে যে দেখে মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি দম আটকে সবাই মারা যাবে। ট্রেন ছাড়ার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে দরজা খোলা হবে। মুন্নু দেখলো সেই ভিড় ঠেলে যদি প্রভুদয়াল আর পার্বতীকে নিয়ে যেতে হয়, তা'হলে প্রভুদয়ালকে আর ট্রেনে চড়াতেই হবে না, সেইখানেই তার এবারকার মত ভবযাত্রা শেষ হয়ে যাবে।

কি ক'রে এই কারাযন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তার সন্ধানে মুন্নু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়—যদি কোথাও কোন ছিদ্র-পথ মিলে যায়।

হঠাৎ দেখে সামনে দিয়ে নিকেলের-বোতামওয়ালা শাদা পোষাক পরা একজন টিকিট কলেক্টর যাচ্ছে···সগর্ব পদক্ষেপে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথা থেকে ঘুষ আদায় করতে পারা যায়। মুন্নুর চোখে চোখ পড়তেই, বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনায়াসেই বুঝে নিলেন এই ছেলেটী তাঁর খদ্দের।

মুন্নুর পাশে এসে কানে কানে বলেন, দু'আনা···দু'আনা পেলেই তোকে গাড়ীতে তুলে দেবো···আর একটা দরজা আছে···

এই কদিনের উপার্জ্জন থেকে মুন্নুর কাছে তখন মাত্র চার আনা পয়সা ছিল। দ্বিরুক্তি না ক'রে মুন্নু দু'আনা লোকটার হাতে গুঁজে দিল, কিন্তু দিয়ে ফেলেই তার মনে ভয় হলো, যদি লোকটা কথা না রাখে!

মুন্নুর বরাত ভাল···লোকটা গরীব···ঘুষ নিল বটে···কিন্তু কথার মানুষ। কথামত পাশের একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে সে মুন্নুর দলকে প্লাটফর্মে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ী তখন দাঁড়িয়েই ছিল।

তাদের দুজনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মুন্নু নীচে জানালার কাছে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে যেন তার ভেতরটা থম্ থম্ করতে থাকে।

এমন সময় প্রভূদয়াল জানালার ভেতর দিয়ে ম্লান পাংশু মুখ বার ক'রে মুন্নুকে ডাকে—তার হাতটা টেনে নিয়ে হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয়। অশ্রুভরাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, এই দিয়ে যতদিন চলে...এ-মাসের বাড়ী ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি...তুই এ'কদিন বাড়ীতেই শুবি!

হাত জোর করে মুন্নু বলে, জয়দেব!

ট্রেন নড়ে ওঠে!

মুন্নুর মাথায় হাত রেখে প্রভূদয়াল বলে, দীর্ঘজীবি হও!

হাত সরে যায়। পার্বতী চোখের জল মুছতে মুছতে আশীর্বাদ করে, সুখী হও বাছা!

ট্রেন চলতে আরম্ভ করে। মুখ বাড়িয়ে তুলসী বলে, ভাবিস্ না মুন্নু, আমি দু'দিন পরেই ফিরে আসছি!

ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়।

মুন্নু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তার স্থির বিশ্বাস, প্রভূদয়ালের মত এ-রকম ধার্মিক লোক সে আর দেখেনি...কি ক'রে সে এত ধার্মিক হলো? রোজ সে দেখেছে প্রভূদয়াল নিয়মিত মন্দিরে যেতো। মন্দিরে গেলে তাহলে মানুষ ধার্মিক হয়...আমিও রোজ সন্ধ্যাবেলায় যাব...ভগৎ হরদাসের মন্দিরে শুনেছি নাকি বিনা পয়সায় খেতেও দেয়...ঠাকুরের প্রসাদ...ভালই হবে পেটও ভরবে...ধর্মও হবে...

ঘুরতে ঘুরতে সে যখন ভগৎ হরদাসের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ক্ষিদেয় পেটের ভেতর জ্বলছে। ধর্মের চেয়ে তখন বেশী টান ধরেছে রুটির—এক টুকরো রুটীর। মন্দিরের সামনে একটা পুষ্করিণী, তার ওপারে সান-বাঁধানো ভগৎ হরদাসের সমাধি-চত্বর। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গরীব দুঃখীদের রুটী আর শাক-চচ্চরী বিতরণ করা হয়। ষ্টেশন থেকে বেরুবার সময় ধর্মের ঐকান্তিক আকর্ষণে সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে, মন্দিরে ঠাকুরের পায়ে ছড়াবার জন্যে দু'এক পয়সার ফুল কিনে নেবে। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে ক্ষুধার আগুনে সে ধর্ম-বোধ ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

পুকুরের ধারে অবসন্ন দেহে সে বসে পড়লো। জলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখে, মন্দিরের চূড়াগুলো যেন-জলে নেমেছে, চাঁদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করতে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সেই বিরাট মন্দিরের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে···চেয়ে থাকতে থাকতে কি এক অজানা আতঙ্ক তার মনকে পেয়ে বসে···মনে হয় যেন, কে এক বিরাট পুরুষ অদৃশ্য ভাবে এই জায়গাটাতে ভর করে রয়েছে···ভয়ে সে উঠে দাঁড়ায়···সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে···সমাগ ভক্তদের ভিড় ঠেলে সে দ্রুত অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। তবে ভিড় কাটিয়ে কি ক'রে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয় সে-বিদ্যা সে দৌলতপুরের বাজারে মুটেগিরি করবার সময় ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছিল।

সেখান থেকে কিছু দূর গিয়ে সে মন্দিরের আর এক উঠানে এসে পড়লো। সেখানে দেখে, এক ধারে একজন ব্রাহ্মণ জল বিতরণ করছে। অবশ্য এই জল বিনা পয়সাতেই দেওয়া হয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুন্নু লক্ষ্য করলো, যারাই জল পান করছে, পান-শেষে তারা একটা ক'রে পয়সা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তৃষ্ণার জল এক পয়সায় বিক্রী হচ্ছে। তৃষ্ণায় তখন মুন্নুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল। সোজা সে ব্রাহ্মণের সামনে গিয়ে জল চাইলো এবং সকলের মত সে-ও জল পেলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন দেখলো যে পয়সা না দিয়ে পথিক চলে যাচ্ছে, মুন্নুর দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গালাগাল দিয়ে উঠলো, দেবস্থানে একটা পয়সাও দিতে পারনা···মরে না বেটারা!

অভিশাপে আর মুন্নু ভয় করেনা। এই অল্প সময়ের মধ্যে অভিশাপ শুনতে শুনতে সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে যে,তার মধ্যে কোন দৈব-শক্তি বা কোন যাদু নেই।

কিন্তু প্রসাদ কোথায় দিচ্ছে? নিশ্চয়ই সেখানে কোন পয়সার বালাই নেই।

এমন সময় দেখে একজন লোক একটা বালতি নিয়ে চলেছে আর তার পেছনে ঝুড়ি নিয়ে চলেছে আর একজন লোক। প্রথম লোকটি হেঁকে চলেছে, ঠাকুরের পেসাদ!

হঠাৎ কোথা থেকে রাজ্যের ভিখারী দেখতে দেখতে লোকটাকে ঘিরে ফেলে।, মুন্নু বুঝলো, এই সেই ব্যক্তি, যাকে সে খুঁজছে।

ছুটে লোকটির কাছে সে হাত পেতে দাঁড়ালো।

—তোর পাতা কৈ ? লোকটী জিজ্ঞাসা করে।

মুন্নু ইচ্ছে করে গলা কাঁপিয়ে বলে, পাতা তো আমার নেই মহারাজ!

ততক্ষণ তার প্রসারিত হাতের ওপর ঝুড়িওয়ালা লোকটী দু'খানি চাপাটী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং বালতীওয়ালা বালতী থেকে খানিকটা শাক দিয়েছে। খাবার নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ক্ষুধার্ত উন্মাদ জনতার ধাক্কায় হাত থেকে তা পড়ে যাবার উপক্রম হলো। বহু কসরৎ ক'রে কোন রকমে মাটীতে পড়তে না দিয়ে সে ভিড় ঠেলে বাইরে এলো।

সেখান থেকে বেরিয়ে বাগানের ধারে একটা ফোয়ারা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে পড়লো। বাগান থেকে তখন সদ্যফোটা চামেলী-চম্পকের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল।

তখন তার একমাত্র দৃষ্টি হাতের সেই দু'খানি চাপাটীর দিকে। ক্ষুধা দূর না হলেও দু'খানি চাপাটীতে পেটের সেই জ্বালানিটা বন্ধ হলো। তখন সে চোখ তুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলো।

দেখলো, যেখানে সে বসে আছে, তার সামনেই একটা ছোট্ট বাগান-বাড়ী, চাঁদের আলোয় তার খানিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর খানিকটা আবছায়া অন্ধকার। সেখানে বসে মণ্ডিত-মস্তক গৈরিকধারী এক যোগী এক দৃষ্টিতে ঝর্ণার দিকে চেয়ে আছেন। পদ্মাসনে বসে তিনি হাটুর ওপর হাতটী অতি সন্তর্পণে রেখেছেন, সামনে নতজানু একজন বৃদ্ধা···বৃদ্ধার পাশে সুসজ্জিতা এক তরুণী। বৃদ্ধা ও তরুণী চুপটী করে বসে আছে, যোগীবরের ধ্যান ভাঙ্গবার অপেক্ষায়। মুন্নু সেখান থেকে গুটি গুটি যোগীর সামনে এগিয়ে আসে।

—কে হে তুমি বালক ? এটা হলো যোগীর আশ্রম···এখানে তোমার কি প্রয়োজন ? যাও, তোমার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করো গে···যাও!

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে উল্টে মুন্নু জিজ্ঞাসা করে, যোগীজী, চোখের পাতা না ফেলে আপনি এ-রকম চুপটী ক'রে বসে থাকেন কেন?

বৃদ্ধা ধমকে উঠলো, পালা, পালা ছোড়া!

যোগীজনসুলভ অমায়িক মাধুর্যে ডান হাতটী তুলে যোগীবর ব'লে উঠলেন, শান্তি! শান্তি! আহা···অতি শুভ-ক্ষণ, অতি শুভ-ক্ষণ···আপনার পুত্র-বধূর যে সন্তান হবে, সেই বালক হলো তার অগ্রদূত···ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন···তাই স্বয়ং বালককে পাঠিয়ে দিয়েছেন···ভগবানের দূত···একে কি তাড়াতে আছে মা?

মুন্নু অধীরভাবে বলে ওঠে, যোগীজী আমিও ভগবানকে খুঁজছি···আপনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন, কি ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া যায়?

যোগীবর বলেন, তুমি এখনও বালক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তবে তোমার অনুরাগ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পারবে·· আমি তোমাকে শিষ্য ক'রে নেবো··· গুরুর কথা যদি যথাযুক্তভাবে পালন কর, আমি বলছি তুমি কালে একজন সাধু পুরুষ হবে।

যোগীবরের পাশে স্তূপীকৃত ফল এবং নানাবিধ খাদ্যসম্ভারের দিকে চেয়ে মুন্নু বলে উঠলো, সত্যি···আমি খুঁজছি একজন গুরু···আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন্!

—বেশ···তাই হবে···এই জিনিস গুলো তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তা'হলে আয়!

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার কানে চুপি চুপি বলেন, আজ পূর্ণিমা ···বীজ বপনের আজ উপযুক্ত লগ্ন। তুমি মা তোমার পুত্র-বধূকে সঙ্গে নিয়ে এই ছেলেটীর পিছু পিছু এসো। আমি একটু এগিয়ে যাব। সামনেই আমার আস্তানা। সাবধান, লোকে যেন বুঝতে না পারে যে আমার সঙ্গে আসছো। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? বুঝলে? একটু দূরে দূরে আসবে···

তারপর মুন্নকে ডেকে আদেশ করেন, তুই আমার পিছু পিছু একশো হাত দূরে দূরে আসবি, বুঝলি? ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আমার বাড়ীর পেছন

দিককার সিঁড়ি দিয়ে উঠবি—আমি দেখিয়ে দেব'খন! খুব সাবধানে আসবি…যেন পথ হারিয়ে ফেলিস্ নি!

যোগীবরের কি উদ্দেশ্য আর কিই বা ঘটছে মুন্নু তার কিছুই বুঝতে পারে না কিন্তু বুঝবার দরকারই বা কি! সে বেরিয়েছে এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে…

তার ওপর তাজা পাকা সব ফল…একেবারে তার হাতের মুঠোর মধ্যে… তীব্র সুগন্ধ নাকে এসে লাগছে…আঙ্গুর, বেদানা, আপেল…তাজা পুরুষ্ট মর্তমান কলা…সুতরাং ভেবে কি লাভ? সাধু বাবার কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেই!

হঠাৎ গলির বাঁকে এসে মুন্নু দেখে, সাধু বাবাকে সে হারিয়ে ফেলেছে… কি সর্বনাশ! এই তো সামনে যাচ্ছিলেন! কোথায় গেলেন? এ-দিক ও-দিক চোখ ঘুরিয়ে দেখতেই দেখতে পেলো, সামনের একটা বাড়ীর এক তলার জানালা থেকে তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকছেন! তখনও অনুসরণকারিণীরা পেছনে পড়েছিল… একটু অপেক্ষা করতেই তারা এসে পড়লো। তাদের সঙ্গে নিয়ে মুন্নু হাতছানি লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হলো।

বাড়ীর সামনে আসতেই মুন্নু দেখে, সাধু বাবা নিজে একটা লণ্ঠন নিয়ে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে নীচে নেমে এসেছেন। আগে আগে লণ্ঠন ধরে তাদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরের চারিদিকে চেয়ে মুন্নুর মনে হলো, যেন কোন বড়লোকের বাড়ীতে সে ঢুকেছে! ধব ধবে শাদা বিছানা…পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গদি-আঁটা চেয়ার… মেজেতে ফরাস পাতা…চারিদিকে লম্বা লম্বা নলওয়ালা আলবোলা।

ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধা সাধুবাবাকে বলে, আমি তা'হলে এখন আসি…ভোর না হতেই এসে বৌমাকে নিয়ে যাব, কেমন মোহন্ত মহারাজ?

উত্তেজিত ভাবে মোহন্ত মহারাজ বলে ওঠেন, হাঁ…হাঁ…

কি বলবে বা কি করবে ঠিক করতে না পেরে মুন্নু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগীবর সেই অবগুণ্ঠিতা তরুণীর কাছে এগিয়ে আসে…দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়…গদগদ কণ্ঠে বলে উঠে, প্রাণেশ্বরী, দয়া ক'রে মুখ থেকে ঘোমটাটা একটু খোলো, দুটো কথা বল…শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হোক…

মুন্নুর মাথায় যেন কে হঠাৎ লাঠি মারে…কাঠ হয়ে সে লোকটার দিকে কট মট ক'রে চায়…এতক্ষণ পরে সে সাধু বাবার আসল রূপ দেখতে পায়… সব তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লজ্জায় তার বুকের কাঁপুনি অতি দ্রুত তালে উঠতে নামতে থাকে।

কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে বাইরে ছুটে বেড়িয়ে পড়ে…বুড়িটাকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে…তাকে জানিয়ে দিতে হবে, সে নিজের চোখে এইমাত্র যা দেখলো…যা শুনলো…

অপাপবিদ্ধ কৈশোরের সহজ বুদ্ধিতে সে মনে করেছিল, এই ঘটনার কথা শুনলে বুড়ি নিশ্চয়ই তারই মতন বিস্ময় ও রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সে তখনও জানতো না, ধনী ব্যবসায়ীর নিঃসন্তান স্ত্রীদের দৈব-পুত্র লাভের ব্যবস্থা এই সব বৃদ্ধাদের যোগাযোগে এই ভাবেই সংঘটিত হয়…

[ছয়]

সেদিন রাত্রিতে মুন্নু তাদের গলির কাছে একটা বন্ধ দোকানের বাইরের পাটাতনের ওপর শুয়ে কাটিয়ে দিল…প্রভুদয়ালের শূন্য বাড়ীতে গিয়ে শুতে তার সাহসে কুলালো না…খালী বাড়ী, যদি ভূত এসে উপদ্রব করে? যদি চোর ব'লে লোকে তাকে সন্দেহ করে?

ভোর হতেই সে রেল ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হয়…যদি মোট পাওয়া যায়।

ষ্টেশনে এসে যখন পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। তক্ষুনি প্লাটফর্মে লাহোর থেকে একখানা যাত্রী-ট্রেন এসে পৌঁছল। দলে দলে লোক ষ্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। ধনীলোকেরা বাইরে এসেই ফিটন

আর টোঙ্গার ওপর বসে পড়ে…মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ লোকেরা শেয়ারে মোষের গাড়ীতে যাবার জন্যে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে… আর যারা দরিদ্র, অধিকাংশই চাষী শ্রেণীর…তারা যে-যার মোট মাথায় তুলে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

মুন্নু উৎসুক উৎকণ্ঠায় জনতার মধ্যে প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—কুলি চাই, লালাজী ?

—মা-জী…কুলি ?

কিন্তু কেউ সারা দেয় না। মনে মনে সে একটা মতলব ঠিক ক'রে নেয়, নিতান্ত কৃপণ যারা, তারাই গাড়ীতে যেতে চাইবে না…অল্প দরের মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে পায়ে হাঁটবে…কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, গাড়ীতে তো জন পিছু শেয়ার মাত্র এক আনা… সেক্ষেত্রে এমন কে কৃপণ আছে যে পায়ে হেঁটে বাড়ী যাবে ?

এমন সময় দেখে, রেলের নীল জামা গায়ে দু'জন কুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, কুলি ! কুলি !

তাদের ডাক শুনে দু'জন লোক তাদের কাছে গিয়ে তাদের ঘাড়ে মোট চাপিয়ে দিল !

দেখাদেখি, মুন্নুও সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো, কুলি ! কুলি !

সামনের গাড়ী-বারান্দার ভেতর থেকে কে একজন ডাকলো, এই… এদিকে আয় !

মুন্নু ছুটে ওপরে উঠতেই খাকি-পোষাকে একজন পাহারাওয়ালা তার ঘাড় ধরে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, এই হারামজাদা, মোট নিতে এসেছিস্… দেখি তোর লাইসেন্স ?

ভয়ে মুন্নুর বুক দ্রুত কাঁপতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

—চুপ ক'রে রইলি যে, শূয়োরকা বাচ্চা ! দেখা লাইসেন্স…

সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠীটা তুলে ধরে।

মুন্নু কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে বলে, সরকার, আমি···আমি···

আইনের রক্ষক গর্জন ক'রে ওঠে, হারামজাদা আমার চোখে ধূলো দিবি? একমাস ধরে দেখছি, তুই দিব্যি মজায় রোজ এখান থেকে মোট বইছিস···

কাঁদ কাঁদ মুখে মুন্নু বলে, না হুজুর···আপনি ভুল দেখেছেন···আমি মাত্তর এই দু'দিন এখানে এসেছি···

হুজুর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন,—বেটাচ্ছেলে···আমি মিথ্যে কথা বলছি··· একমাস ধরে রোজ দেখছি নিজের চোখে···

—নিশ্চয়ই আমার মতন আর কাউকে দেখেছেন হুজুর! কুলিদের দেখতে একরকমই কিনা!

মুন্নুর হাতটা মুচড়ে ধরে হুজুর গর্জন ক'রে ওঠেন, চালাকী পেয়েছিস ব্যাটা··· চল্ ফাঁড়িতে···

ফাঁড়ির নামের সঙ্গে সঙ্গে মুন্নুর মনে জেগে ওঠে কোতয়ালীতে প্রভুদয়ালের সেই শাস্তির দৃশ্য! ভয়ে সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে, না···না···না···

সজোরে হাতের লাঠীর এক ঘা বসিয়ে দিয়ে হুজুর বলে ওঠেন, বেরো বেটা···বেরো এখান থেকে···সরকারী হুকুম···বিনা লাইসেন্সে কেউ মাল ওঠাতে পারবে না···

ছাড়া পেয়েই মুন্নু ছুটতে আরম্ভ করে···একদমে খানিকক্ষণ ছোটার পর সে পিছন ফিরে দেখে··· হুজুর নীল কোর্তাটা টেনে ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করছেন।

এতক্ষণ পুলিশের ভয়ে যা মনের তলায় চাপা পড়েছিল, নিরাপদ দূরত্বে চলে আসার ফলে, আপনা থেকে তা মনে ভেসে উঠলো। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার সমস্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। নিজের মনে মনে ভাবে আর রাগে ফুলে ফেঁপে ওঠে,—ষ্টেশন থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবার ও কে? বদমায়েস পাজী! খাকি জামা গায়ে দিয়েছে ব'লে নিজেকে মনে ক'রেছে যেন লাট সাহেব···আমার চাচাও তো ইংরেজ সরকারের চাকর··· সরকারের কত চাকর··· উনি ভেবেছেন উনিই যেন একমাত্র চাকর···আমি

আমার মনিবের মত নই যে…মুখ বুঁজে ওর হাতের মার খাব…মরে যাব সে-ও ভাল…

নিষ্ফল আক্রোশে যাতনা বেড়েই চলে।

হাঁটতে হাঁটতে মুন্নু দেখে, সে সাহেব পাড়ার মধ্যে কখন চলে এসেছে। তারা শহরের যে অংশে থাকে, তার সঙ্গে শহরের এই অংশের পার্থক্য আপনা থেকেই চোখে পড়ে যায়। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা…পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন …রাস্তায় গাড়ী চলে গেলে এখানে ধূলো ওড়ে না…রাস্তার দু'ধারে চমৎকার ছবির মতন সব বাড়ী…কে যেন লতায় পাতায় আর ফুলে সাজিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ একটা বিলিতী দোকানের সামনে সে দেখে, কাঁচের ভেতর একটা সুন্দর ফটো তারা টাঙ্গিয়ে রেখেছে…একটী ইংরেজ ছেলেমেয়ের ফটো… দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে…কখন দেখতে দেখতে তার মনের মধ্যে এক দুর্বার লোভ জেগে ওঠে, হায় ঐ রকম পোষাক যদি সে পরতে পারতো…ঐ রকম পরিষ্কার জামা…পাৎলুন…মাথায় ঐ রকম টুপি!. হঠাৎ নিজের ছিন্নভিন্ন ময়লা পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এমন সময় মিহি অথচ চড়া-গলায় কে যেন কি বলে উঠলো…পেছন ফিরে দেখে, এক মেম সাহেব…নাক উঁচু ক'রে তাকেই কি যেন বলছে।

মুখের দিকে চেয়ে মুন্নুর বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না, তার অস্তিত্বের সান্নিধ্য মেম-সাহেবর পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে; কিন্তু তাতে সে কোন অপমানই বোধ করলো না। কারণ শ্যামনগরে থাকবার সময়, সে তার নিজের চাচা এবং বাবু নাথুমলকে দেখেছে, সাহেবদের দেখে কি রকম ভয়ে জড়সড় হয়ে যেতো তারা। সেই থেকে শাদা চামড়ার প্রতি একটা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা তারও মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য অপমান বোধ হওয়া দূরে থাক্ সে মনে মনে খুশীই হলো যে মেম-সাহেব তার সঙ্গে কথা বলেছে। যে-রাস্তা দিয়ে মেম-সাহেবরা হেঁটে চলে, সেই রাস্তা দিয়ে তাদের পাশাপাশি একদিন যদি সে হেঁটে যেতে পারে! এই গৌরবময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভরপুর হয়ে সে রেলের পোলের দিকে ছুটে চলে।

পোলের মুখে রাস্তার ওপর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাস্তার দু'ধারে অন্য সব ভিখারীরাও যাত্রীদের পিছু পিছু ছুটে চলেছে, একটা পয়সা মিলে বাবা! তাদের দেখে সহসা মুন্নুর মনে হয়, অন্তত সে এদের দলে নয়...এদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব সে। নিজের এই আত্ম-গরিমাবোধকে নিজের কাছেই সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে সে মনে মনে প্রমাণ সংগ্রহ করে, আমি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি...বাবুদের বাড়ীতে কাজ ক'রেছি...যে-সে বাবু নয়, যাঁর বাড়ীতে সাহেব পর্যন্ত একদিন এসেছিল...

তার সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র এই দুটী গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা, পর্বত-শৃঙ্গের মত জীবনের কুৎসিৎ অভিজ্ঞতার বহুবিস্তৃত প্রান্তরের ওপর মাথা তুলে থাকে...এই দুটী আলকোজ্জ্বল রেখার ওপর হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে জীবনের আর সব বাকি ঘটনার ধুলো-কাদা ..যেন ঢেকে মুছে দিতে চায় সেই দুটী সূক্ষ্ম আলোক রেখাকে। কিন্তু মুন্নু আজ কোন মতেই সে দুটী রেখাকে মলিন হতে দেবে না।

আর কিছু দূর এগুতেই, পুরানো সরাইখানার সামনে যে গাড়ীর আড্ডা ছিল, সেখানে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ে! চারদিক থেকে বিচিত্র কণ্ঠে বিচিত্র সব আওয়াজ আসছে.. যেদিকেই চোখ ফেরায় সেদিকেই বিচিত্র সব মানুষের জনতা...চলন্ত ছবির পর ছবি...

পিঠে বোঁচকা নিয়ে একদল চাষী লরির জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে... রোদে তাদের গায়ের রঙ পুড়ে ঝলসে গিয়েছে...ময়লা এলোমেলো পোষাক, দীর্ঘকায় একদল পাঠান রাস্তায় ছুরি-ছোরা আর গাছ-গাছড়া ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে—ভীমাকৃতি বিরাট চেহারা, দেখলে ভয় করে, মাথায় সযত্নে বাঁধা কাপড়ের পাগড়ী, গায়ে সোণালী-পাড়ওয়ালা লাল ভেলভেটের কোর্তা, পায়ের তলা পর্যন্ত ঝোলানো থলের মত ঝলঝলে পা-জামা...পায়ে ইয়া মোটা কাবলী জুতো; কোথাও তৈল-সুচিক্কণ দেহে হিন্দু মিঠাইওয়ালা থাকে থাকে সাজানো মিষ্টান্নের থালার আড়ালে খদ্দেরের সঙ্গে দর কষাকষি করছে; তার মধ্যে সুগভীর আলস্যে কোথাও অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে দুটো গরু শুয়ে জাবর

কাটছে, চোখে মুখে ফেনা উদগীরণ করতে করতে ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়া ধুকতে ধুকতে এসে দাঁড়াচ্ছে…অতি পরিচিত প্রতিদিনের নিত্য-দেখা সব ছবি। এসব থেকে মুন্নু অতি সহজেই নিজেকে আলাদা ক'রে নেয়। কোন কিছুই বিশেষ ক'রে তার মনে কোন ছাপ ফেলে না। জাত-ভারতবাসীর সেই হলো মনের বিশেষত্ব। সব কিছুই সে সম্ভব বলে স্বীকার ক'রে নেয়। রাস্তার মধ্যে পাগল হাঁ ক'রে সূর্যের দিকে চেয়ে আছে, কিম্বা কল্পিত-শত্রুর উদ্দেশ্যে অকথ্য গালাগাল বর্ষণ করছে…অথবা কোথাও সম্পূর্ণ নগ্নদেহে সাধু-বাবা প্রকাশ্য-পথে বসে ধ্যান ক'রছেন…কিম্বা সযত্নে তৈরী জ্যামিতিক-রেখায় নিখুঁত পোষাকে আদিম নগ্নতাকে সুসভ্য ভাবে ঢেকে ঘাড় উঁচু ক'রে সাহেব চলেছে…কোন কিছুই তার কাছে বিসদৃশ লাগে না! মুন্নুরই বা লাগবে কেন? তবে তার একমাত্র দুঃখ, সে ইংরেজ হয়ে কেন জন্মগ্রহণ করতে পারলো না!

কিন্তু একটী প্রশ্ন ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে ডাল-পালা মেলে বেড়ে উঠতে থাকে। কি ক'রে কাজ পাওয়া যায় এবং কোথায় পাওয়া যায়? বাজারে একপয়সা ক'রে মোট বইতে আর তার ইচ্ছা নেই, প্রভুদয়ালের বাড়ীতেও ফিরে যেতে চায় না, অন্তত যতদিন না তুলসী ফিরে আসে। তুলসী তো চালের মোট বয়ে রোজগার করতে পারে, আমি তাও পারি না। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে? কি করা যায়? শ্যামনগরে চাচার কাছে ফিরে যাব? না…দয়ারামের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক সে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে…তার পৃথিবীতে দয়ারাম নেই…দয়ারামের পৃথিবীতেও সে আর নেই।

ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে চলে এমন সময় হঠাৎ তার কানে এসে লাগে ঢাকের শব্দ…ডুম্…ডুম্…ডুম্…

চেয়ে দেখে, একটা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক হাত মুখ নেড়ে কি বলছে আর তার আশে-পাশে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের গলার ভেতর দিয়ে একটা চৌব্যো ছবির বাক্সের মতন জিনিস ঝোলানো…কাছে এগিয়ে যেতেই দেখে, সাহেবী পোষাকে একটা

মেয়ের ছবি···মেয়েটার বুকের জামার সঙ্গে অনেকগুলো মেডেল ঝোলানো··· আর হাতে একটা মস্ত বড় চাবুক···সেই চাবুক দিয়ে সে এক পাল বাঘ, সিংহ আর হাতীকে যেন ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছে···আর একটা ছবিতে দেখে, সেই মেয়েটাই শুয়ে আছে, আর তার বুকের ওপর একটা মস্ত বড় পাথর ; আর একটা ছবিতে দেখে সেই মেয়েটাই দাঁতে দড়ি দিয়ে মানুষ ভর্তি একটা গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে।

যে লোকটাকে দূর থেকে হাত মুখ নাড়তে সে দেখেছিল, হঠাৎ সে লোকটা চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, মিস তারা বাঈ! মিস তারা বাঈ! মেয়ে নয় দানবী···কলিযুগের দানবী···দৌলতপুরে আজ শেষ খেলা হচ্ছে··· এমন সার্কাসের দল জগতে আর কারুর নেই···এমন কসরৎ সাত-সাত-দুনিয়ায় আর কেউ কখনো দেখায়নি···য়ুরোপের যত রাজা আর রাণী আছে, তাদের সব তাক্ লাগিয়ে দিয়ে সারা গা ভর্তি মেডেল নিয়ে এসেছেন··· বনের বাঘ-সিংহীকে বেড়াল বানিয়েছেন···মিস তারা বাঈ···আর্টিষ্ট মহলের মহারাণী···এই শেষ খেলা···দেখতে হয় তো এইবার দেখে নিন···আজ রাতেই দল বল নিয়ে বোম্বে চলে যাবেন···সেখান থেকে যাবেন বিলেতে··· আর ফিরবেন না বহু বছর···এই শেষ সুযোগ···দেখে আসুন মিস তারা বাঈ···এ দুনিয়ার আশ্চর্য আউরৎ···ডুম্···ডুম্···ডুম্···

বলতে বলতে তারা এগিয়ে চলে। মুন্নুর চোখে মুখে হঠাৎ-খুশীর আলো ঝকমকিয়ে ওঠে!

—যেমন ক'রে হোক যাবো সার্কাসে···সেখান থেকে যাবো বোম্বে···

ছবিওয়ালা লোকগুলো বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি ক'রতে ক'রতে চলেছিল। মুন্নু একটা কাগজ নিয়ে পড়ে দেখে,

"মদনলালের থিয়েটার বাড়ীর বাইরে, হল-গেটের সামনে···

মিস তারা বাঈ—মেয়ে হারকুউলিস্!

আশ্চর্য! অদ্ভুত! বিস্ময়কর! আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন খেলা আর কেউ দেখায় নি!"

মুন্নু পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করে। তার মগজের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডু-লামের দোলানির মত দুলতে থাকে, বোম্বে···বম্···বম্···বে···সেই শব্দের অনুরণনের সঙ্গে তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে বোম্বে সম্বন্ধে যা কিছু সে শুনেছিল। কিছুদিন আগে বাজারে সে যখন মুটেগিরি করতো, সেই সময় এক মুটের কাছে শুনেছিল···বোম্বেতে যে-কোন লোক যে-কোন কারখানা থেকে মাস গেলে হেসে-খেলে পনরো থেকে ত্রিশ টাকা রোজগার ক'রতে পারে। সেই মুটেটাই তাকে বলেছিলো, মরবার আগে প্রত্যেকের অন্তত একবার সেই আশ্চর্য শহরে যাওয়া উচিত। সেখান থেকেই নাকি সব বড় বড় লোক কালাপানি পার হয়ে সাহেবদের দেশে যায়।

বোম্বে—বম্···বম্ ··বে·· মুন্নুর মগজে সমানে বেজে চলে। মনে পড়ে স্কুলে প্রাথমিক ভূগোলের বইতে সে পড়েছিল বোম্বের কথা···বোম্বে হলো একটী দ্বীপ···হাঁ···হাঁ···আজও তার মনে আছে, মালাবারের উপকূলে একটী দ্বীপ···বোম্বে ··বম্···বম্···বে···

সার্কাসের সামনে এসে সে দেখলো, গেটের গায়ে টিকিটের সব দাম লেখা। সব চেয়ে নীচু সীটের দাম হলো আট আনা। তার কাপড়ের খুঁটে তখনও প্রভুদয়ালের দেওয়া সেই একটী টাকা বাঁধা ছিল। হাত দিয়ে একবার সে অনুভব ক'রে নেয়, টাকাটী স্বস্থানে আছে কিনা। কিন্তু আট আনা পয়সা খরচ ক'রে সার্কাস দেখার বিলাসিতা তার মন অনুমোদন করে না। হঠাৎ সে ঠিক ক'রে ফেলে, সামনের দরজা দিয়ে নয়, অন্য কোন পথ দিয়ে সে ভেতরে ঢুকবে।

সদর দরজা পেরিয়ে তাঁবুর আশে-পাশে ঘুরতে ঘুরতে, এক জায়গায় তাঁবুটা একটু আলগা দেখে, তার তলা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ডানদিকে ফিরে দেখে,একটা হাতী সামনের একটা তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতীর ওপর কালো-মতন একজন মাহুৎ বসে···হাতীর কানের আড়ালে তার পা দেখা যাচ্ছে না। হাতীর পেছনে একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে আসছে।

ছেলেগুলো বলাবলি ক'রছে জানিস, এই হাতীটা ঠিক মানুষের মতন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে, নাচতে পারে, মাউথ-অর্গ্যান বাজাতে পারে! সুযোগ বুঝে মুন্নু ছুটে গিয়ে সেই ছেলের দলে ভিড়ে যায়।

এমন সময় হাতীটা কি মনে ক'রে সামনের দুটী পা উঁচু ক'রে তুলতেই ছেলেরা মনে করলো হাতী বোধ হয় রেগে গিয়ে তাদের তাড়া ক'রতে আসছে। হঠাৎ মুন্নু দেখে পাশ থেকে একটা ছেলে তার মাথা থেকে কাপড়ের ফালিটা তুলে নিয়ে হাতীর দিকে ছুঁড়ে দিল। এক টুকরো খড়ের মত হাতীটা পাগড়ীটাকে গিলে খেয়ে ফেলে দিল।

তৎক্ষণাৎ সেই ছেলেটার টুপি তার মাথা থেকে তুলে নিয়ে মুন্নু পাল্টা জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মুন্নু অনুভব করে, পেছন দিক থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে—ঘাড় টিপে ধরেছে!

পাতলা দেহটাকে একবার ঝটকা মেরে নিয়ে মুন্নু ফিরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে আক্রমণকারীকে সজোরে আঘাত করে। লোকটা তাল রাখতে না পেরে সামনের নর্দমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

এক গা কাদা মেখে লোকটা নর্দমা থেকে উঠতেই ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে হেসে উঠলো। হাতীর ওপর থেকে মাহুৎ মুন্নুকে গালাগাল দিয়ে শাসিয়ে ওঠে।

মুন্নু বুঝতে পারে, হঠাৎ ঘোরতর বিপদের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছে। তাই নিজে থেকেই বলে ওঠে,

—ঐ লোকটাই তো আগে শুরু করলো—

ততক্ষণে মাহুৎ হাতীর ওপর থেকে নেমে পড়েছে···কান ধরে মুন্নুকে হাতীর শুঁড়ের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

ভয়ে ছেলেগুলো চীৎকার ক'রে ওঠে।

মুন্নুকে মনে হলো, সে আর বাঁচবে না···ভয়ে আপনা থেকে তার চোখ বুজে এলো।

কিন্তু গজরাজ শুধু সশব্দে তার মাথার ওপর একটা ছোট্ট খাটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিপুল দেহ নিয়ে এগিয়ে চলে গেল।

মুন্নু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, আমার অত ভয় নেই।

মাহুৎ হেসে ওঠে। বলে, বেশ···বেশ···তাহলে এক কাজ কর দেখি, ঐ যে ঘেসেড়াটা যাচ্ছে ওকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে!

মুন্নু মনে মনে খুশীই হয়। সে তো এই সুযোগই খুঁজছিল। সার্কাসের ভেতর ঢোকবার সে যে বায়না করবে, তার একটা কারণ থাকাতো চাই!

ছুটে গিয়ে ঘেসেড়াকে ডেকে নিয়ে আসে। মাহুতের কাছ ঘেঁষে মৃদু হেসে আবদার ক'রে বলে, আমি তামাসা দেখবো!

মাহুৎ সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে বলে ওঠে, যা···এখন বিদেয় হ'! মুন্নু নড়ে না।

—বা রে, আমি যে তোমার হ'য়ে কাজ ক'রে দিলাম?

কোন উত্তর না দিয়ে লোকটা এগিয়ে চলে। মুন্নু তার পিছু ছাড়ে না।

—বা রে আমাকে দিয়ে শুধু-শুধু কাজ করিয়ে নিলে?

—ফের জ্বালাতন করে! দেখতে হয় তো এই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখ্!

লোকটা আর কোন কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে যায়। মুন্নু ঘুরে ফিরে দেখে, কোথাও তাঁবুর ফাঁক আছে কি না। সৌভাগ্যবশত এক জায়গায় তাঁবুর গায়ে একটু ছেঁড়া ছিল। মুন্নু তার ভেতর দিয়ে চোখ বার ক'রে দেয়।

ভেতরে তখন খেলা সুরু হয়ে গিয়েছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে থাকের পর থাক চেয়ার সাজানো। কোথাও একটা আসন খালি পড়ে নেই। তাঁবুর ওপরে এই সবে-মাত্র একদল খেলোয়াড় শূন্যে নানা রকমের লাফালাফির কসরৎ দেখিয়ে মাটীতে নেমে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছিল। উত্তরে দর্শকরা ঘন ঘন করতালি দিয়ে উঠলো। হাততালি থামতে না থামতে সমস্ত দর্শক আবার তুমুল আনন্দ-ধ্বনি ক'রে উঠলো। এবার স্বয়ং মিস্ তারাবাঈ খেলা দেখাবার জন্যে মঞ্চে ঢুকছেন। বিপুল দেহ নিয়ে হেলতে দুলতে মিস্ তারাবাঈ দর্শকদের সামনে এগিয়ে আসছেন। মুন্নুর মনে হলো যে-হাতীটা তার পাগড়ী গিলে খেয়েছিল, তার কথা।

মিস তারাবাঈ মঞ্চের এক জায়গায় এসে শুয়ে পড়লেন। কতকগুলো লোক এসে একটা বিরাট পাথর তার পেটের ওপর চাপিয়ে দিলো। তারপর প্রত্যেকে এক একটা লোহার হাতুড়ি তুলে সেই পাথরের ওপর সজোরে আঘাত করতে লাগলো। মুন্নুর দম বন্ধ হয়ে আসবার মতন হলো। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা পাথরটাকে সরিয়ে ফেলে দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে দর্শকদের অভিবাদন করলো।

বিস্ময়ে মুন্নুর দেহ কাঠ হয়ে আসে।

মিস তারাবাঈ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শাদা ঘোড়া আসরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক এসে তার পিঠে লাফিয়ে উঠে পড়লো। ঘোড়াটা গোল হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো। মুন্নু অবাক হয়ে দেখে, লোকটা লাগাম না ধরে, ঘোড়াটার ওপর যখন খুসী উঠছে, বসছে, দাঁড়াচ্ছে।

উত্তেজিত হয়ে মুন্নু ভাবে, আমাকে যদি কেউ শেখায়, আমি এখনি রাজী আছি...

খেলা চলতে থাকে...মুন্নুর বিস্ময়ও বাড়তে থাকে, এমন সময় দেখে, একটা মস্ত বড় খাঁচার ভেতর একটা সিংহ...

মুন্নুর আর দেখা হয় না। পেছন থেকে টান পড়তেই মুন্নু দেখে, সেই মাহুৎ।

—খুব হয়েছে, আর দেখে না...অনেক দেখেছিস...এবার আমার একটু কাজ ক'রে দে...এই জলের বালতীটা নিয়ে আয় আমার সঙ্গে...

তাঁবুর গায়ে সেই ছিদ্রপথ তার সমস্ত মনকে আকর্ষণ করতে থাকে কিন্তু যার দয়ায় সে আজ এই অদ্ভুত খেলা দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছে, তার আদেশ সে কি ক'রে অগ্রাহ্য করে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে লোকটার পিছু পিছু চলে।

একটা কলের কাছে গিয়ে তারা থামে। সেখান থেকে বালতিতে জল ভরে মুন্ন মাহুৎকে দেয়, মাহুৎ হাতীর গা ধোয়ায়। তিন বালতি জল তোলার পর, মুন্নু মনে মনে ঠিক করে, এই লোকটাকেই সে ধরবে...বিলেত না হোক্ অন্তত বোম্বে পর্যন্ত নিশ্চয়ই এ লোকটা তাকে নিয়ে যেতে পারে।

সাহসে ভর ক'রে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে, তোমার সাকরেৎ ক'রে আমাকে বোম্বে নিয়ে চল না ?

কাজ করতে করতে লোকটি জবাব দেয়, সাকরেৎ! হাতী-চালান কি খেলা-কথা নাকি ? অনেকদিন অনেক মেহনৎ ক'রে তবে শিখতে হয়··· একি যে-সে পারে? আর শেখাবার আমার সময় কই! আমরা তো বোম্বে থেকে কালাপানির ওপারে চলে যাচ্ছি···তবে তুই আমাদের ট্রেনে গা ঢাকা দিয়ে বোম্বে পর্যন্ত যেতে পারিস···তোর মতন বয়সে বিনা টিকিটে আমি বহুৎ ট্রেনে ট্রেনে ঘুরেছি···

—সত্যি বলছো ?

—তা নাতো কি ? তুই এখানে থেকে যা···মালপত্তর বাঁধতে গোছাতে আমার সঙ্গে লেগে যা···তার জন্যে তোকে কিছু দেবো···তারপর ট্রেনে আমি তোকে লুকিয়ে তুলে নেবোখন!

কৃতজ্ঞতায় মুন্নুর অন্তর ভরে আসে। —সত্যিই···কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো ?

—জানাতে হবে না! চুপ কর, কেউ হয়ত এখনি শুনতে পাবে···যা··· ঐখান থেকে কিছু ঘাস নিয়ে আয়!

[সাত]

সার্কাস পার্টির স্পেশাল ট্রেন ষ্টেশন ছাড়বার আগে তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলো একবার···তারপর ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল।

একটা খোলা মাল-গাড়ীতে পার্টির তাঁবু আর নানান সব আসবাবপত্র একটার পর একটা গাদা করা হয়েছে। তার মধ্যে এক কোণে মুন্নু আশ্রয় নিয়েছে গোপনে। ট্রেন অন্ধকারে হু হু ক'রে এগিয়ে চলে, মুন্নু দেখে, মাথার ওপর সেই সঙ্গে নীল আকাশে তারার দলও এগিয়ে চলে। অন্ধকারে মাঝে

মাঝে যখন ট্রেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে মুন্নুর ভয় করে…মনে হয় যেন এ শব্দের সঙ্গে রাতের অধিবাসী অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের বুঝি কোন সংযোগ আছে।

সে চলেছে এক সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবীতে…কত জনের কাছে কত ভাবে সে সেই বিরাট নগরীর কত আশ্চর্য সব কাহিনী শুনেছে… বড় বড় বাড়ী…লম্বা লম্বা রাস্তা…সুন্দর সুন্দর বাগান… মটর গাড়ী…জাহাজ… পথে পথে অলিতে গলিতে কোটিপতি লাখপতি সব ধনীরা আসছে যাচ্ছে…কুলীদের মুঠো মুঠো টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে…

তার মাঝখানে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, যে-জগৎ সে ফেলে চলে যাচ্ছে তার স্মৃতি…যে-জীবন থেকে সে ছুটে চলেছে, তার বেদনাময় শত কুৎসিৎ অভিজ্ঞতার কথা…জোর ক'রে সে-সব কথা সে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় আজ…কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ভেসে ভেসে উঠছে…তাদের এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মুন্নু উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকে… ঘুমোতে চেষ্টা করে…শেষকালে কখন ঘুমিয়ে পড়ে…

সকাল বেলা ঘুম ভাঙলো দিল্লী সেনট্রাল ষ্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে হাত মুখ ধুয়ে সে লুকিয়ে আবার ট্রেনে উঠে বসলো। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করবে সে।

এমন সময় দেখে সেই মাহুৎ তার গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে…কোন রকমে ঘাড় কাৎ ক'রে সে শোনে মাহুৎ বলছে, এই খোলা গাড়ীতে দিনের বেলায় থাকতে পারবি না…রোদে পুড়ে মরে যাবি…একটা বন্ধ গাড়ীতে তোর ব্যবস্থা করেছি…এইনে খাবার…আয়…

মুন্নু লাফিয়ে নেমে পড়ে। একটা মাল গাড়ীর সামনে এসে তারা দাঁড়ায়।

—নে, এই গাড়ীতে উঠে পড়… আমি আবার রাট্লামে এসে তোর খবর নেবো!

খাবার হাতে মুন্নু সেই মালগাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে। রাশীকৃত সব বাঁশ, তার মধ্যে মেঝেতে, সে একটু জায়গা ক'রে নেয়। ট্রেন ছেড়ে দেয়। খেতে খেতে সেই মাহুতের দয়ার কথা ভেবে তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

বিস্মিত হয়ে সে ভাবে, কেন একজন লোক এত ভাল, আর একজন এত খারাপ? প্রভুদয়াল আর এই মাহুৎ, এরাও মানুষ আর গণপত আর সেই পুলিশ ইন্‌সপেক্টর, যে অকারণে তার মনিবকে মেরেছিল, তারাও মানুষ···

হু হু শব্দে ট্রেন এগিয়ে চলে···দিল্লীর উপকণ্ঠে ছবির পর ছবি দ্রুত সরে সরে যায়···অতীতের সাক্ষী ভগ্ন দুর্গ···জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ···ইটের আর পাথরের কঙ্কাল নির্মেঘ আকাশের তলায় নিষ্করুণ সূর্য-করে যেন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে। মুন্নুর মনে শৈশবের স্কুলে-পড়া দিনগুলির টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে ওঠে। ভাবে, ইতিহাসে পড়েছে, রাজপুত-রাজারা সব সূর্যের বংশের লোক···মুসলমানেরা এসে তাদের সিংহাসন কেড়ে নেয়···তাই আজ বুঝি সূর্য তাঁর বংশধরদের ওপর সেই অবিচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাদের প্রাসাদ, দুর্গ সব আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে···

তাজা ছবির মত সরে সরে যায় স্যার এড্‌উইন লুট্‌ইয়েনের গড়া লাল-ইঁটের নয়া-দিল্লী···থাকের পর থাক সাজানো···এদেরও ওপর কি একদিন সূর্য এমনি প্রতিশোধ নেবে? মুন্নুর মনে সন্দেহ জাগে···না, আংরেজ সরকারের তৈরী এই সব বাড়ী সূর্য পোড়াবে না···কারণ, ইতিহাসে তাকে পড়তে হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর সূর্য কখনো অস্ত যায় না।

দৃশ্য বদলে যায়···

তৃণহীন, বৃক্ষহীন, বালুময় সমতল ভূমি···সমানে রৌদ্রকরে পুড়ছে···মাঝে মাঝে কোথাও সামান্য গুল্ম···মরুভূমির মধ্যে যেন ক্ষুদ্র তৃণোদ্যান···

আতপ্ত প্রান্তরে সহসা জেগে ওঠে ঘূর্ণী হাওয়া···রোদ্রে ঝলসানো মাঠের বুক থেকে টেনে তোলে ধুলো আর বালির ঘূর্ণী···ঘুরতে ঘুরতে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় কোন্ গহ্বরে কে জানে?

মুন্নু শুনেছে, মৃত ব্যক্তিদের ব্যথিত আত্মা এমনিধারা বিজন প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় ঘূর্ণীর মূর্তি ধরে···এমনি ঝড়ো হাওয়ায় কেঁদে মরে তাদের অশরীরী আত্মা। তাই সেই ঘূর্ণীর দিকে চেয়ে চেয়ে মুন্নুর মনে হয় যেন, রাজপুত-বীরদের অশরীরী আত্মা আজ তার সামনে দিয়ে এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে···

ভয়ে তার গা ছম্-ছম্ ক'রে ওঠে কিন্তু পরমুহূর্তে সে যখন ভাবে সে যেখানে বসে আছে, সেখানে তারা পৌঁছুতে পারবেনা···তাদের চেয়েও ঢের-জোরে ছুটে চলেছে এই আংরেজ সরকারের রেল-গাড়ী···মাটীকে তুচ্ছ ক'রে আকাশকে তুচ্ছ ক'রে, ঐ সর্বগ্রাসী অনলবর্ষী সূর্যকেও তুচ্ছ ক'রে। মনে মনে সে বলে ওঠে, সত্যি, কি আশ্চর্য জিনিস এই রেলগাড়ী···যদি এই রেলের এঞ্জিন না থাকতো তা'হলে তো আজ এমনি অবলীলাক্রমে সে দৌলতপুর থেকে পালাতে পারতো না···বোম্বেতেও আসতে পারতো না···এতদূর পথ পায়ে হেঁটে আসা কি সম্ভব!

সেই সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, কিন্তু বোম্বে তো যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে করবো কি? সেখানে কাউকেই আমি চিনি না, জানি না। সেই যে বাজারের মুটে বলেছিল মাস গেলে ত্রিশ টাকা যে-সে রোজগার করতে পারে, তারই বা সন্ধান দেবে কে? বোম্বের রাস্তায় গিয়ে ভিখারীদের মত হাত পেতে ভিক্ষে করতে পারবো না যে!

বিকালের দিকে গাড়ী কোঠা জংসনে এসে থামলো। সেই বন্ধ গাড়ীতে সারা দুপুর রোদের তাপে সে একরকম আধ-সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় দেখে, মূর্তিমান দয়ার মত উদ্ধার কর্তা সেই মাহুৎ।

—এই নে, কিছু মিষ্টি আর দুধ নিয়ে এসেছি আর এই থলেটা নে—রাত্রিতে পেতে শুবি, খুব সাবধান, বাইরে বেরুবি না!

পরের দিন ট্রেন বোম্বের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের বাইরের দিককার এক প্লাটফর্মে এসে থামলো। ট্রেনটা যতই বোম্বের কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই এক অনির্দিষ্ট চাঞ্চল্য মুন্নুকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসতে লাগলো···চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য যেন আবছা হয়ে এলো ···মনে হলো যেন তার কথা বলবার শক্তি পর্যন্ত নেই।

এখন সে কি করবে? এমনি চুপটি ক'রে বসে থাকবে যতক্ষণ না তার উদ্ধারকর্তা এসে তার খব'র নেয়? না, সে নিজেই বেরিয়ে পড়বে? মুন্নু অস্থির হয়ে ওঠে।

এমন সময় বাইরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—নেমে পর্ ভাই…এই তোর প্রাণের বোম্বে! আমাদের গাড়ী এখান থেকেই বালার্ড পিয়ার্-এ চলে যাবে…সেখান থেকে আমরা জাহাজে উঠবো …এই নে, কিছু খাবার…কাজে লাগবে…এখন আয় তোকে লুকিয়ে একটা গোপন পথ দিয়ে বার ক'রে দি !

মুন্নু গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে।

নীরবে তার উদ্ধারকর্তার পিছন পিছন চলে।

গাড়ীর তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে তারা একটা গুদামের সামনে এসে পড়ে।

মুন্নুকে উপদেশ দিয়ে মাহৎ বলে, মনে রাখিস্ ভাই, যত ভারী শহর তত কড়া তার মেজাজ…ইঁট কাঠ যেখানে যত বেশী, মানুষের জায়গা সেখানে তত কম…এখানে মানুষ যে নিশ্বাস নেয়, তারও দাম দিতে হয় …আদায় ক'রে নেয়, ছাড়ে না…তবে তুই খুব কড়া ছেলে ! তুই পারবি।

মুন্নু কি বলবে ঠিক করতে পারে না।

—যা…সামনের গুদাম দিয়ে সবাই যেমন যাচ্ছে, তেমনি চলে যা… ভগবান তোর ভাল করুন !

মুন্নু মুখ তুলে লোকটির দিকে চেয়ে দেখে। বসন্তের দাগে ভরা, কালো কুৎসিৎ মুখ। মুন্নুর মনে হলো, সেটা যেন ছদ্মবেশ। ওর আড়ালে নিশ্চয়ই সুন্দর দিব্য মুখ লুকিয়ে আছে। সময় নেই, সে এগিয়ে চলে। চলতে গিয়ে পদে পদে সে অনুভব করে তার বুকের ভেতরটায় কি যেন ভারী হয়ে উঠছে। একদিকে কৃতজ্ঞতা, আর একদিকে ভয়। সে এগিয়ে চলে।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে মুন্নু অবাক হয়ে তার অন্তরের সেই স্বপ্ন-নগরীর দিকে চেয়ে থাকে…সে নড়তে পারে না…

বহুজাতির আশ্রয়দায়িনী বহুরূপময়ী বিচিত্রা নগরী…এক-পা এক-পা ক'রে সে এগিয়ে চলে…কোন ঠিকানা নেই…কোন লক্ষ্য নেই—চোখের সামনে দিয়ে যা চলে যায়, তাই পরম বিস্ময়ের মত তার অন্তরকে দোলা দিয়ে যায়…

ঘুরতে ঘুরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে···

হঠাৎ একটা বড় দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে···কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখে, থাকের পর থাক সোডা আর লেমনেডের বোতল সাজানো··· ভেতরে এক-একটা গোল টেবিলের সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে চেয়ার পাতা··· কোন কোন চেয়ারে লোক বসে খাচ্ছে, গল্প করছে। তার মনে পড়ে যায়, দৌলতপুরে একবার বাজারে কি কাজ করতে গিয়ে একটা সোডার বোতল কিনে মিষ্টি জল খেয়েছিল···হঠাৎ তার ইচ্ছা হলো, সেই মিষ্টি জল এখন একটু খেলে হয় না? দরজার বাইরে থেকে সে দেখলো, ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে যারা খাচ্ছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে তার অঙ্গ-আবরণের বিশেষ কোন সামঞ্জস্য নেই। একটা সোডার বোতলের দাম মাত্র এক আনা, তার কাছে এখনও একটা টাকা আছে। নাই বা থাকলো তার ভাল পোষাক, তা বলে একটা সোডা সে খেতে পারবে না?

নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়ে দোকানের ভেতর ঢুকতে গিয়ে দরজায় হোঁচট লেগে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ভেতরে এগিয়ে চল্লো। তার মনে হতে লাগলো, সবাই যেন তার দিকে চেয়ে আছে। তাই কারুর দিকে না চেয়ে একটা খালি টেবিলের সামনে চেয়ারের ওপর সে বসে পড়লো। বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হতে লাগলো যেন মহাশূন্যে সে ঝুলছে ···কোন অবলম্বন নেই তার···মাথার ভেতর তার যেন ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে··· হঠাৎ এ কি সে ক'রে বসলো? এখন করবে কি সে? হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সুস্থির হবার চেষ্টা করে। মনকে বোঝায়, এমন ভয়ঙ্কর কিছুই সে করেনি, অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সে বসে থাকবে। ঐ তো সামনেই লোকে নির্বিবাদে কেট্‌লী থেকে কাপে গরম চা খাচ্ছে। সুতরাং—

—এই, তুই কে?···কুলি?

মুন্নু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, পাশে এক লম্বা লোক···ধব্‌-ধবে সাদা পোষাক-পরা···মাথার চুল রীতিমত তেল চকচকে এবং পরিপাটী ক'রে মাঝখানে দু'ভাগ করা···তাকেই প্রশ্ন করছে।

মুন্নুর বুকের ধুকধুকানি যেন থেমে যায়। কি উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে সত্য কথাই বলে, হাঁ…আমি কুলি…

রীতিমত বিরক্ত হয়ে তর্জনী আস্ফালন ক'রে লোকটা ব'লে ওঠে. চেয়ারে বসা হয়েছে! নেমে মেঝেতে বোস্…

কোন কথা না বলে মুন্নু আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে সিমেন্টের মেঝের ওপর গিয়ে বসে।

—কি চাই তোর?

—একটা মিষ্টি সোডা!

কাছাকাছি যারা চেয়ারে বসে চা পান করছিলেন, তাঁরা একসঙ্গে সকলে এমন ভাবে মুন্নুর দিকে ফিরে তাকালেন যেন সে কুষ্ঠরোগী! যে-বেয়ারাটা চা পরিবেশন ক'রছিল, ভদ্রলোকদের সেই নীরব অবজ্ঞার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে তার দেরী হয় না… ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে ওঠে, দেখুন না হুজুর, কুলি ব্যাটার আস্পর্দ্ধা!

রাগে মুন্নুর সর্বদেহ জ্বলে ওঠে কিন্তু চিরকাল সে শুনে এসেছে ধোপ-দোস্ত দামী পোষাক-পরা ভদ্রলোকরা উচ্চশ্রেণীর জীব, সুতরাং সর্বদাই তাঁদের মান্য ক'রে চলা উচিত, তাই অসহ্যবোধ হলেও সে মনের রাগ মনেই চেপে রাখে। তার মনে হলো, ঘর শুদ্ধ লোক যেন তার দিকেই চেয়ে আছে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা দিয়ে সে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে!

দরজার বাইরে আসতেই দেখে, বেয়ারাটাও তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসেছে।

—বার কর্ দু'আনা পয়সা সোডা দিচ্ছি!

মুন্নু প্রথমটা চমকে উঠেছিল। তারপর যখনই মনে হলো, লোকগুলো তারদিকে হয়তো এখনও চেয়ে আছে, সে আর কোন কথা না বলে কাপড়ের খুঁট থেকে সেই টাকাটা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে দিল।

লোকটা এক গেলাস মিষ্টি সোডা এবং সেই সঙ্গে চোদ্দ আনা পয়সা ফেরৎ এনে দিল।

তৃষ্ণায় তখন গলা শুকিয়ে এসেছিল। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত মিষ্টি-জলের স্বাদ এক চুমুক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে তার চোখ ফেটে নোণা জল বেরিয়ে আসে। এতদিন পরে আবার সেই মিষ্টি জল খাবার সুযোগ তার ঘটেছে · একটু একটু ক'রে, প্রত্যেক চুমুকের স্বাদ নিয়ে ধীরে সুস্থে বসে সে যদি খেতে পারতো! কিন্তু তার কোন সম্ভাবনাই নেই! তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ভদ্রলোকদের জগতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সে যে ঘোরতর অন্যায় করেছে, তার ধাক্কা সামলাতে সে তখন এত বিব্রত যে, কোন রকমে এক চুমুকে শেষ ক'রে পালাতে পারলে বাঁচে।

গেলাস শেষ ক'রে দরজার এক কোণে ভয়ে ভয়ে নামিয়ে রাখে।

—যা ব্যাটা···যা···

মুন্নু ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, যেন কে তাকে খুন ক'রতে আসছে।

কিছু দূর গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখে সত্যি কেউ পিছু পিছু আসছে কি না। যখন দেখলো কেউ আসছে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু মনে মনে নিদারুণ আফশোষ হতে লাগলো, কি কুক্ষণেই না দোকানে ঢুকেছিল! দু'আনা পয়সা নষ্ট হয়ে গেল। তার ওপর সেই লোকটার কুৎসিৎ ব্যবহার নিম-তেতোর মত তার জিভে যেন বিঁধতে লাগলো।

পথ চলে আর আপনার মনে ভাবে,—কুলি তা' কি হয়েছে? আমি তো বিনা পয়সায় খেতে যাই নি···আর তা ছাড়া আমি তো অস্পৃশ্য নই! আমি হিন্দু ক্ষত্রিয়···রাজপুত···কুলি হলেও আমার মধ্যে আছে ক্ষত্রিয়-রক্ত···

নিজের আহত চিত্তে নিজেই সে প্রলেপ দিতে চেষ্টা করে।

সে যে রাজপুত ক্ষত্রিয়, সে কথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তার আত্মলজ্জা দূর হয়ে যায়। যে জাতে সে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তারা বীর, তারা যোদ্ধা, তারা হাসতে হাসতে যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারে···তবে কেন সে নিজেকে এত ছোট মনে ক'রে কষ্ট পায়? ধীরে ধীরে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে। শ্লথ গতি-ভঙ্গী বদলে যায়···মাথা উঁচু ক'রে সোজা পা ফেলে সে হাঁটতে

আরম্ভ করে। হঠাৎ রাস্তার ধারে সিনেমার একটা বিরাট রঙীন বিজ্ঞাপন দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে…একদৃষ্টিতে সেই বিজ্ঞাপনের ছবির দিকে চেয়ে থাকে…মার্লিন ডিয়াটিচের ছবি…গভীর আরত চোখে কামনা-আতুর আমন্ত্রণ…দুগ্ধ-শুভ্র দেহের নিরঙ্কুশ নগ্নতা শুধু মুক্তাবর্ণ ক্ষীণ কটি-বাসে ঈষৎ অসম্পূর্ণ—মুন্নু দৃষ্টি ফেরাতে পারে না…হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, তার চোখের সামনে এই যে স্বপ্ন-পুরী, হয়ত তার দিকে এই ভাবে চেয়ে থাকা কুলিদের নিষিদ্ধ…জোর ক'রে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়…আড়-চোখে একবার দেখে, অন্য কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রেছে কি না! না, কেউ আর নাই সেখানে। তবুও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভয় করে কিন্তু ছবিটাকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে চলে যেতেও সে পারে না…একটু দূরে সরে গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ায়, যেখান থেকে সে লুকিয়ে ছবিটাকে স্পষ্ট দেখতে পায়…মার্লিন ডিয়াট্রিচের সেই বুভুক্ষিত দৃষ্টি তার দেহ ভেদ ক'রে তার রক্তে তুলেছে ঢেউ…

এমন সময় হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে মোটর গাড়ীর হর্ণ, ট্রামের ঘণ্টা, ফিটনওয়ালাদের গালাগাল…এক সঙ্গে তাকে আক্রমণ ক'রে উঠলো। নিজের তন্ময়তায় সে লক্ষ্যই করেনি যে সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সেই সম্মিলিত শব্দের আক্রমণে যখন সে বুঝতে পারলো যে পথের মাঝখানে রাস্তা আটকে সে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে এক নিমেষের মধ্যে তার যেন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। তার মনে হলো, আর রক্ষা নেই, চাপা যদি এখনও না পড়ে থাকে, তবে পড়তে বেশী দেরীও নেই। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো! ফুটপাতের কাছে এসে ফিরে দেখে, বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তার সামনে ফুটপাতের ওপর হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো…তার সঙ্গে সঙ্গে একটী বালক ও একজন বৃদ্ধও হৈ হৈ ক'রে উঠলো। মুন্নু তাদের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখে রাস্তার মাঝখানে চলন্ত গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে একটী ছোট্ট মেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

গাঁয়ের বুনো দুর্দান্ত যে ছেলেটি এতদিন তার মধ্যে অচেতন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেই মুহূর্তে সে জেগে উঠলো। কোন দৃকপাত না ক'রে মুন্নু সেই চলমান গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েটাকে দু'হাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়ে ছুটে ফুটপাতে চলে এলো।

স্ত্রীলোকটী ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে বুকে তুলে নিয়ে মুক্তকণ্ঠে মুন্নুকে আশীর্বাদ করে, দীর্ঘজীবী হও বাছা···দীর্ঘজীবী হও···

তারপর বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে, ভাল জায়গায় নিয়ে এসেছ আমাদের!

তেমনি ঝংকার দিয়ে বৃদ্ধ উত্তরে বলে, থাম্ মাগী, মেয়েটাকে আর একটু হলে মেরে ফেলেছিলি তো?

—বটে···আমি মেরে ফেলেছিলাম? তুমি নিজে দিব্যি রাস্তা পেরিয়ে এলে···মেয়েটাকে হাত ধরে নিয়ে আসতে পারনি? উল্টে আমার ওপর চাপ! মুন্নু দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্যে মুরুব্বিয়ানা ক'রে বলে ওঠে, থাক গিন্নী মা, থাক···চুপ করুন।

মুন্নুর পিঠ চাপড়ে, কৃতজ্ঞতায় গদগদ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে ওঠে, তোমার জন্যই ভাই···নইলে এ ডাইনী আজ নিশ্চয়ই গাড়ী চাপা পড়তো! তুমিই ওকে বাঁচিয়েছ। মোটর গাড়ী তো নয়···চাকাওয়ালা দৈত্যি!

বুড়োর হাতে একগাদা জিনিস-পত্র দেখে মুন্নু বলে ওঠে, ইস্ এত জিনিস পত্র আপনি বইতে পারবেন কেন? কোথায় যাবেন? দিন্, আমি পৌঁছে দিচ্ছি!

বৃদ্ধ বলে, আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করলে ভাই, তবে শোন! দেশে গিয়েছিলাম···এই এদের নিয়ে আসবার জন্যে···এর আগে স্যারজাবাইট (স্যার জর্জ হোয়াইট) মিলে কাজ করতুম···কাজকর্ম এখন কিছুই নেই, সংসার-পত্র বলতে যা কিছু, সব এই আমাদের সঙ্গেই! বাড়ীঘর দোর তো নেই! এখন চলেছি শহরের মধ্যে কোথাও কোন দোকানের বাইরে কিম্বা ফুটপাতে কোথাও রাত কাটাবার মত একটু জায়গা খুঁজে যদি পাই···তারপর

সকালে উঠে যাবো মিলের দিকে, যদি কাজকর্ম মেলে…গরীব…বুঝতেই তো পারছো ভাই…রাম রাম…তাহলে আসি এখন ?

বৃদ্ধের সহজ আত্মপ্রকাশ মুন্নুর অন্তর স্পর্শ করে। আগ্রহভরে বলে ওঠে, আমিও এই শহরে আজ নতুন এসেছি…আমিও যা হোক একটা কাজ খুঁজছি। আপনি যে মিলের কথা বল্লেন, সেখানে আমার কোন কাজ হতে পারে বলে মনে করেন ? আমরা গাঁয়ের লোক…কুলিগিরি করি।

বৃদ্ধ খুশীই হয়।

—বেশ, বেশ…তা' ভাই রাতটা যদি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পার, তাহলে সকালে দু'জনে মিলেই বেরুতুম কাজের সন্ধানে…হেড্ মিস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তার কাছেই তোমাকে নিয়ে যাব। তারপর যদি কাজ জুটে যায়, মিলের কাছে একটা ঝুঁড়ে ঘর দু'জনে মিলে ভাড়া নেবো, কেমন ?

মুন্নু যতদূর সম্ভব গম্ভীর ভাবে বলে, খুব ভাল কথা…আমিও তাই খুঁজছিলাম ! তারা ক্রমশঃ পা-পা এগিয়ে চলে।

পশ্চিম পাড়ার সাহেবদের বড় বড় আফিসের তলা দিয়ে…রাজনগরীর গগণচুম্বী সব প্রাসাদের ছায়া মাড়িয়ে, একটা মস্ত বড় খেলার মাঠ পেরিয়ে, তারা ক্রমশঃ গিরগাঁওয়ের পাঁচমিশিলী পূর্ব-পাড়ায় এসে ঢোকে।

শহরের সেই জনতার অরণ্যে সহসা এইভাবে মনের মত সঙ্গী পেয়ে মুন্নুর মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে আসে। বুড়ো আগিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছিল। মুন্নু ছুটে বুড়োর পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার নামটা কি দাদা ?

—আমার নাম হরি…লোকে ডাকে হরিহর… বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়ে। মুন্ন বুঝতে পারে ক্লান্তিতে বৃদ্ধ আর চলতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, কতদূর আর যেতে হবে ?

—আর বেশী দূর নেই…এই ভেণ্ডীবাজার হয়ে চৌপাটী যাব…

এমন সময় দেখে, স্ত্রীলোকটী বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। সেও আর চলতে পারছিল না।

—এখানে একটু বসে জিরিয়ে নাও মতির মা !

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়। কোমরে যে ছোট্ট টিনের বাক্সটী ছিল, সেটা কোমর বদলে নে ।

মুন্নু ও বিজ্ঞের মতো বলে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে···ছেলেমেয়ে দুটোও নেতিয়ে পড়ছে···থামা এখন উচিত হবে না।

—তবে ভগবানের নাম নিয়ে এগিয়েই চল···

বৃদ্ধ আবার তাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে থাকে···

মুন্নু যত এগিয়ে চলে, ততই অবাক হয়ে দেখে, এ যেন আর এক বোম্বে শহর···এতো তার স্বপ্ন-নগরী নয় ! পদে পদে ভিখিরী···পদে পদে ব্যাধিগ্রস্ত দীন-দরিদ্র আর্তলোক···একটা পয়সার জন্যে, এক মুঠী অন্নের জন্যে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে ! আপনা থেকে একটী দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে মনে ভাবে, তাহলে যা শুনেছি, সব গল্প-কথা···কই, এর পথে পথে তো পয়সা পড়ে নেই ···এখানেও সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর সেই একটী-পয়সা দাও-না-বাবা !

বাজার এবং বস্তি পেরিয়ে তারা ভদ্রলোকদের পাড়ায় এসে ঢোকে। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী।

মুন্নু বলে, দাদা, এইখানে কোথাও একটু জায়গা খুঁজে নিলে হয় না ?

হরি উত্তরে জানায়, আরে সর্বনাশ ! এখানে দেখছো না সব বড় লোকের বাড়ী ! এখানে রাত কাটানোর বিষম বিপদ···জানইতো বড় লোকদের বাড়ীতে চুরি-চামারি প্রায়ই হয়। রাতে যদি এই রকম কোন কাণ্ড ঘটে, তাহলে পুলিশের লোক আগে আমাদের ধরবে। আমরা গরীব, চাল-চুলো নেই সুতরাং আমরা চোর···এখানে নয়···এখানে নয়···আরো একটু এগিয়ে চল···সামনেই দোকানপাট সব আছে। একটু রাত হতেই তারা দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ী চলে যায়···তখন সেই সব বন্ধ দোকানের পাটাতনে কোথাও রাত কাটানো যাবে।

ছেলেটা আর মেয়েটা তখন ঘুমে আর নড়তে পারছিল না। মুন্নু বেশ ক'রে তাদের দু'জনকে দু'কোলে তুলে নেয়। সেই অবস্থায় আধ-অন্ধকারে

নিজের ভার রাখতে না পেরে, কিসের ওপর ধাক্কা খেয়ে মুন্নু পড়ে যায়। দেখে, একরাশ ছেড়া কাঁথার ভেতর একজন কুষ্ঠরোগী—ন্যাকড়া দিয়ে তার পায়ের দগদগে ঘা বাঁধছে।

ভয়ে আর ঘৃণায় মুন্নু আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কোন রকমে শিশু দুটিকে সামলে নিয়ে সে আবার চলতে আরম্ভ করতেই দেখে, কার পায়ের ওপর সে পা দিয়ে ফেলেছে। অন্ধকারে ফুটপাতের ওপর এক ভিখারিণী তার শিশু-পুত্রকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে শুয়ে ছিল। সে নড়লো না, কোন আহা-উহুও করলো না। শুধু অন্ধকারে তার চোখ দুটো বাঘের চোখের মত একবার জ্বলে উঠলো।

মুন্নু মনে মনে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ এলো না দেখে, নীরবে এগিয়ে চলতে থাকে।

ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের সামনে হাত চারেকের মতন একটা কাঠের পাটাতন পড়ে আছে—খালি। এতক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এইটুকু খালি জায়গা চোখে পড়েছে। সেইখানেই কি ক'রে কি ব্যবস্থা করা যায়, তারা দাঁড়িয়ে জল্পনা-কল্পনা করে।

এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে কার যেন দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। মুন্নু ফিরে চেয়ে দেখে, এককোণে অর্ধ-নগ্নদেহে একটী স্ত্রীলোক বসে রয়েছে…দু'হাত দিয়ে মাথাটা এমন ভাবে ধরে আছে, দেখলেই মনে হয় যে, কি ভীষণ যন্ত্রণাই না তার হচ্ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে স্ত্রীলোকটি সেই অবস্থায় ঘাড় তুলে তাদের দিকে চেয়ে দেখে…একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কাল রাত্তিরে এইখানে আমার সোয়ামী মারা গিয়েছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বলে, মরেছে, না বেঁচে গিয়েছে! ভালই হয়েছে, তার খালি জায়গায় আমরা থাকতে পাবো!

সেই অন্ধকারে, সেই স্ত্রীলোকটির স্থির দৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মুন্নুর মনে জেগে ওঠে মৃত্যুর আতঙ্ক। একবার দৌলতপুরে একটা দোকানে

সে একটা ছবি দেখেছিল, যমরাজ তার বিপুল নীলবর্ণ দেহ নিয়ে দণ্ড হাতে রক্ত-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই রক্ত-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে যত সব পাপী-তাপী লোকে। আজ সহসা সামনের অন্ধকারে তার মনে হলো যেন সেই নীলবর্ণ অতিকায় পুরুষ ভাঁটার মত লাল চোখ বা'র ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার অঙ্গ হিম হয়ে আসে। কাঁধের ওপর ঘুমন্ত শিশুর তপ্ত শ্বাসে যেন ফিরে পায় জীবনের মহা-আশ্বাস।

হরিহর বলে ওঠে, আমি ভূতের ভয় করি না।

স্ত্রীলোকটি তখনও এসে পৌঁছয় নি। তাই এ-সব কথা সে শুনতেই পায় নি।

সে এসে পড়তেই হরি বলে, লক্ষ্মী, এখানেই আজকের মত ডেরা গাড়লুম ...মালপত্র নামিয়ে পা ছড়িয়ে একটু বোস...

কোল থেকে টিনের বাক্স আর বোঁচকা নামিয়ে লক্ষ্মী বসে পড়ে।

মুন্নুর কাঁধে হাত রেখে বুড়ো বলে, ওদের দু'জনকে ঐ কাঠের ওপর শুয়ে দাও ভাই...ওদের মার সঙ্গে ওরা ওখানেই শুক...আমরা ফুটপাতের ওপর শোব'খন!

শিশু দুটিকে কাঠের ওপর শুইয়ে দিয়ে মুন্নু দেয়ালে ঠেস দিয়ে ফুটপাতের ওপর বসে পড়ে। সারাদিনের রোদে পুড়ে ফুটপাতের পাথর তখনও গরম হয়ে আছে। একবার আশে-পাশে চার দিকে চোখ তুলে মুন্নু দেখে, তারা নিতান্ত সঙ্গহীন নয়। আশে-পাশে ফুটপাতের ওপর গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে সারিসারি সব মানুষ শুয়ে আছে। মুন্নু মনে মনে ভাবে, অভ্যেসে সব সয়ে যায়...আমার একদিন অভ্যেস হয়ে যাবে...

ক্রমে রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে আসে। আশে-পাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। মুন্নু একা জেগে থাকে। ঘুম তার আসে না। মনে হয় যেন সে একা, একান্ত একেলা।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গরম দমকা হাওয়া আসে...হাওয়ার সঙ্গে অদ্ভুত পচা গন্ধ...ঘী...চন্দন...প্রস্রাব...মাছ...পচা ফল...সব মিলে একটা

উৎকট দুর্গন্ধ…ঘাড় তুলে সে দেখতে চেষ্টা করে কোন্ দিক থেকে গন্ধ আসছে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না…তার বদলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, এক টুক্‌রো কান্না তার কানে এসে লাগে। অন্ধকারে কে নড়ে ওঠে…মড়ারা কি পাশ ফেরে? সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো দিকে চায়… একটা কুলি ছট্‌ফট্‌ ক'রছে আর আপনার মনে কি বকে যাচ্ছে। মুন্নু আবার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। পাশেই হরি ঘুমিয়ে পড়েছে…তার ওধারে সেই সদ্য বিধবা স্ত্রীলোকটী অন্ধকারে তখন ঠিক সেই ভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। তার ওপাশে সারি সারি সব পড়ে আছে…যেন চাদর-চাপা সব মড়া।

সহসা তার মনে আবার আতঙ্ক জেগে ওঠে, নিদ্রাহীন নিশীথের আতঙ্ক …নিশ্চল নিশ্চুপ দেহের দুর্জ্ঞেয় আতঙ্ক…

জোর ক'রে চোখের পাতা বন্ধ ক'রে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে…নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, আজ রাতে তার আশে-পাশে যারা শুয়ে রয়েছে, তারা তারই মতন সব মানুষ…মড়াও নয়…ভূত নয়…কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখে, আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে গিয়েছে…অন্ধকারেই একা সে চোখ চেয়ে জেগে আছে। কাতর ভাবে সে বলে ওঠে, আয় ঘুম, আয়…পাশে চেয়ে দেখে বৃদ্ধ হরি কি ভাবে ঘুমুচ্ছে। হয়ত ফুটপাতে ঘুমোবার একটা আলাদা কায়দা আছে। বৃদ্ধ ঠিক যে ভাবে শুয়েছিল, মুন্নু ঠিক সেই ভাবে চেষ্টা ক'রে শোয়…কিন্তু তবুও কৈ ঘুম তো আসে না! চোখ ভারী হয়ে আসে, দেহ ক্লান্তিতে নাড়তে পারে না, তবু চোখে আসে না ঘুম। গায়ের ঘামে পাথর ভিজে ওঠে। অসহ গরম। কোথাও এতটুকু কিছু নড়ছে না। মুন্নুর মনে হয়, যেন সে ছুটে চলে যায়, যেখানে একটুখানি বাতাস আছে, এই রাস্তার বাইরে, এই বাড়ী-ঘর দোর ছাড়িয়ে, খালি মাঠের মধ্যে যেখানে অবাধে বইছে অফুরন্ত হাওয়া। কিন্তু ছুটে যেতে গিয়ে, তার ভয় হয়, পদে পদে সে ঘুমন্ত মানুষদের হয়ত মাড়িয়ে ফেলবে…তখন হয়ত একটা তুমুল গণ্ডগোল বেঁধে যাবে। জোর ক'রে সে চোখ বন্ধ ক'রে থাকে। উপুর হয়ে পাথরের ওপর দেহের সমস্ত চাপ দেয়…বায়ুহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে…

ভোরের দিকে রাস্তার ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়।

ছেঁড়া কাপড় আর শতছিন্ন কাঁথার ফাঁক দিয়ে ভোরের বাতাস অসীম উদারতায় সকলের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যায়,—ভিখারী, কুলি, কুষ্ঠরোগী, অনাথ আতুর সকলকেই সমান ভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

ঘুমের মধ্যে তারা কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছে···সান্নিধ্যের উত্তাপের আকর্ষণে এখন পরস্পর পরস্পরের গা ঘেঁষে চলে এসেছে···শীতের কাঁপুনিতে কেউ কেউ ধনুকের মত হয়ে গিয়েছে···হাঁটু দুমড়ে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে।

এমন সময় জোরে এক ঝটকা বাতাস তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

নগ্নদেহ কুষ্ঠরোগীটি কেঁপে কেঁপে ওঠে···যে-যার ছেঁড়া কাপড় বা কাঁথা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নেয়···কেউ বা ভোরের ঘুম ভেঙ্গে উঠে অভ্যাসবশত বলে ওঠে, রাম··রাম···হরি···হরি···

সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া ক্রমশঃ জল-ভার-সিক্ত হয়ে ওঠে। ফুটপাত-শায়ীদের মুখে রাম-নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হতে থাকে। তারা একে একে জেগে উঠে বসে। কেউ কেউ তখনও শুয়ে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তা' সম্ভব হয় না। দেখতে দেখতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনের রক্ষণদল লাঠি হাতে ফুটপাত পরিষ্কার ক'রে চলে।

হরি জেগে উঠে মুন্নুকে ঠেলে তুলে বলে, চলো ভাই, একবার কারখানার দিকে এগুনো যাক্!

হরি টিনের বাক্সটা ঘাড়ে তুলে নেয়···মুন্নু ছোট ছেলেটাকে কোলে করে ···লক্ষ্মীর কোলে মেয়েটা ওঠে···যাত্রীরা আবার চলতে সুরু করে।

মহানগরী তখন একটু একটু ক'রে জেগে উঠেছে। রাস্তায় একজন দু'জন ক'রে দেখতে দেখতে লোকে ভরে ওঠে। শাদা লোক, লাল লোক, কালো লোক, আধ-কালো লোক···সব রঙের লোকে রাস্তা ভরে যায়। তাদের মধ্য দিয়ে যাত্রীরা আস্তে আস্তে চলে, তখনও তাদের অঙ্গ থেকে ঘুম ছাড়ে নি।

ক্রমশঃ বোম্বের উঁচু-শির সব বাড়ীর অন্তরাল রেখা থেকে সূর্য মাঝ-আকাশের দিকে এগিয়ে আসে···রোদ্দুরের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুন্নুর মনে

হয় যেন তার পেটের ভেতরটাও জলছে···গলা শুকিয়ে আসছে···রোদ দিয়ে সূর্যদেব তার চলার শক্তি যেন শুষে নিচ্ছে।

গোল গোল চোখ দুটো বার ক'রে হরি বলে, আর বেশী দূর নয়···মাইল খানেক!

বুড়োর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে···প্রত্যেক পা ফেলবার সঙ্গে যেন তার দম ফুরিয়ে আসছে।

মুচকে হেসে মুন্নু বলে, আমাদের উত্তর দেশের মাইল থেকে তোমাদের দোখ্‌নে দেশের মাইল দেখছি ঢের বড়!

লক্ষ্মী কেৎরে এগিয়ে এসে বলে, হাঁ গা, এত যে সব বড় বড় বাড়ী···এর কোথাও একটা ঘর পাওয়া যায় না?

হরি ধমকে ওঠে, থামো···কাজ জোটে কিনা আগে তাই দেখো!

একে এই দীর্ঘ পথের ক্লান্তি—তার ওপর যত পথ এগিয়ে আসছে, হরির মনে ততই ভয় বেড়ে উঠছে, ফোরম্যান সাহেবের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলবে!

কিছুক্ষণ চলার পর, সামনে একটা বিরাট পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী তাদের সামনে দেখা দিল। আঙুলদিয়ে দেখিয়ে হরি বলে, ঐ···ঐ হলো সারজাবাইট কারখানা···

হঠাৎ একদল কাকের চীৎকারে মুন্নু দেখে, একদল লোক এই সবে স্নান ক'রে উঠে সূর্যকে প্রণাম ক'রছে। কাছে-ভিতে কোথাও কোন জলের কল দেখতে না পেয়ে মুন্নু ভাবে, এতগুলো লোক স্নান করলো কোথায়? ভাল ক'রে এদিক ওদিক দেখতে, মুন্নু লক্ষ্য করলো, এক সারি ভেঙ্গে-পরা খোলার ঘরের পাশে,—একটা ছোট্ট পাহাড়ী ঢিপির তলায় খানিকটা ঘোলাটে নীল জল জমা হয়ে রয়েছে। জলের ওপর এক থাক পুরু সর জমে আছে। তার মধ্যে মানুষের সঙ্গে গরু আর মোষ নির্বিবাদে একসঙ্গে স্নান ক'রছে। কতকগুলো মোষ জলের ধারেই ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। তাদের ঘাড়ের ওপর দল বেঁধে বসে কাকেরা ঘাড়ের ক্ষতস্থান থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রছে।

একপাল ছেলে তারই মধ্যে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। তাদের খেলা দেখে, মুন্নুর মনে পড়ে যায়, নিজের ফেলে-আসা গ্রাম্য-জীবনের কথা, বিয়াসের জলে কত না খেলা! দুর্দমনীয় লোভ হয়, এই মুহূর্তে, কাপড়টা খুলে রেখে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সেই নীল জল থেকে যে দুর্গন্ধ উঠছিল, উৎসাহের ঝোঁকে তখন তা' আর তার নাকে লাগে না। আগ্রহ ভরে হরিকে বলে, এসোনা দাদা, এখানে স্নানটা সেরে নি!

হরি বাধা দেয়, আরে এখন নয়, এখন নয়···এখন সময় নেই···যদি একটা কাজ জোটে, তাহলে এখানেই তো একটা ঘর ভাড়া নিতে হবে, তখন দু'বেলা এখানে তুমি নেয়ো!

অগত্যা মুন্নু তাই-মনকে বোঝায়।

একটু এগিয়েই সামনে মস্ত বড় লোহার গেটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'স্যার জর্জ হোয়াইট কটন মিল।'

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পাঠান দারোয়ান বন্দুক ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে, থামো!

ভয়ে লক্ষ্মীর কোল থেকে ছেলেটা পড়ে যাবার মতন হয়। তাকে কোন রকমে সামলে নিয়ে ভয়ে সে কাঁপতে থাকে।

সম্ভ্রমটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিয়ে হরি বলে ওঠে, সালাম, খাঁ সাহেব! আমাকে চিনতে পারছেন না হুজুর? আমি হরি···চার মাস আগে আমি এখানে কাজ করতাম···দেশে গিয়েছিলুম হুজুর, পরিবার আনতে··· একবার ফোরম্যান চিমটা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো!

'আচ্ছা' বলে পাঠান নাদির খান পাশের টুলে উপবিষ্ট একটা ছোট ছেলেকে হুকুম করে, লালকাকা, ভেতরে গিয়ে চিমটা সাহেবকে খবর দে, একজন বুড়ো কুলি কাজের জন্যে দেখা ক'রতে এসেছে!

লালকাকা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। দরজার বাইরে তারা নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকে। মিনিট কুড়ি অপেক্ষা ক'রে থাকার পর যখন ভেতর-

থেকে কোন উত্তর আসার লক্ষণ দেখা গেল না, তখন হরি মুন্নুকে আশ্বাস দেবার জন্যেই বলে, সাহেব বড় ভাল লোক!

একজন সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সৌভাগ্য আবার হবে, এই আশাতে মুন্নুর বুকের ভেতর তখন দুলছিল। শ্যামনগরে তার মনিবের বাড়ীতে প্রথম তার সে সৌভাগ্য দেখা দেয়...এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে মিঃ ইংলণ্ডের সেই ছোট্ট লাল মুখখানা.. তারপর প্রভুদয়ালের বাড়ীতে যখন পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব আসে... মুন্নু ইংরেজীতে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল। মনে মনে অতীতের সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে আজকের সম্ভাবনাকে সে মধুর ভাবে জুড়তে চেষ্টা করে।

লক্ষ্মীরও মনের ভেতর অনুরূপ একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকের ধুকধুকুনিকে বাড়িয়ে চলেছিল। এতদিন ঘোমটার দূরত্বের ভেতর দিয়ে ক্বচিৎ কখন যে লাল-মুখ সে দেখেছিল, আজ সামনাসামনি তা' দেখার সৌভাগ্য হবে। এ-আনন্দ বহু কষ্টে সে চেপে রেখে চুপটী ক'রে আছে। ছেলেটা আর মেয়েটা কোল থেকে নেমে রাস্তায় নুড়ি নিয়ে খেলা করছে। হয়ত তাতে তারা ক্ষিদের কথা ভুলে আছে।

এমন সময় নাদির খাঁ বন্দুক তুলে গর্জন ক'রে উঠলো, এই খবরদার... ঢিল ছুঁড়ো মত্!

ভয়ে তারা ছুটে লক্ষ্মীর পেছনে এসে কাপড় ধরে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী তাদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময় দরজার ভেতরে এসে উপস্থিত হলো জিমি টমাস। একদা ল্যাঙ্কাসায়ারের কোন মিলে মিস্ত্রীর কাজ করতো; এখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ এক মিলের ফোরম্যান সে। বিরাট দেহ...মুখটা বুল-ডগের মতন বড় আর চ্যাপ্‌টা...টক্ টক্ করছে লাল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নীচু ক'রে হরি অভিবাদন জানায়, সালাম হুজুর...সালাম চিমটা সাহেব...

চিমটা সাহেব চোখ তুলে একবার দেখে নিয়ে ইংরেজী-হিন্দুস্থানীতে বলে, টোম্ হারি ? ফির্ আয়া ?

উল্লসিত হয়ে হরি বলে ওঠে, জী হুজুর ! তারপর হাত জোড় ক'রে বলে, হুজুর মা-বাপ···আমি শুধু একা আসি নি···আমার বউ আর ছেলেদেরও নিয়ে এসেছি···একটা ছোঁড়াও এনেছি···সবাই আমরা কাজ করবো হুজুর !

—বলি তোর সব গাঁয়ের লোককে নিয়ে'আসতে পারিস্ নি হারামজাদা !

হতভাগ্য হরি সাহেবের বিদ্রুপ বুঝতে পারে না। আনন্দে বলে ওঠে, হুজুর যদি ভরসা দেন, তাহলে এখুনি চিঠি লিখে গাঁয়ের কয়েকজনকে আনিয়ে নিতে পারি।

এবারে আর সাহেবের ধৈর্য থাকে না। গলা চড়িয়ে তর্জন ক'রে উঠে, উল্লুক কাঁহাকার···চাকরী নিয়ে আমি বসে আছি, না ? ভাগো !

হঠাৎ মুন্নুর দিকে নজর পড়তে, সাহেব হেসে বলে ওঠে, ঐ ছোঁড়াটার জন্যে হয়ত কিছু হতে পারে !

যুক্তকরে সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে হরি কেঁদে ফেলে, হুজুর···গরীবের অন্নদাতা···মা-বাপ··দয়া ক'রে আমাদেরও একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন !

—আচ্ছা···আচ্ছা···সবশুদ্ধ মাসে ত্রিশ টাকা···তোর দশ টাকা···ঐ ছোঁড়াটার দশ টাকা··ঐ মেয়ে লোকটা পাঁচ টাকা···আর আড়াই টাকা ক'রে ঐ দুটো বাচ্ছা···

হরি এবার সাহেবের বুটের কাছে এগিয়ে যায়। গরুর চামড়ার বুটে কপাল ঠেকিয়ে হরি আকুল মিনতি জানায়, হুজুর, আর একটু মেহেরবানী করুন ! ভেবে দেখুন হুজুর···ঘর ভাড়া···এতগুলো লোকের খাওয়া···জিনিস-পত্তর এত মাগ্‌গি···

তা' আমি কি করবো ? আমার জন্যে কি করেছিস্ যে আমি তোর জন্যে করবো ? গাঁ থেকে ব্যাটা এলি, মেমসাহেবের জন্যে কিছু এনেছিস্ কি ? একবারও ব্যাটা মেমসাহেবকে কি আমাকে ভেট দিয়েছিস্ ? যদি ঐ টাকাতে থাকতে পারিস্ তো থাক্···নইলে গেট্ আউট্।

—দেখবেন হুজুর, আপনাকে খুশী ক'রে দেবো···একটু ভেবে দেখুন আপনি, আগে এইখানেই আমি পনেরো টাকা পেতাম !

সাহেব তেড়ে ওঠে, মজা পেয়েছিস্ না ? যখন খুশী চলে যাবি···আর যখন খুশী আসবি···আর সেই মাইনেই তোকে দিতে হবে ? আবদার, না ? বড় সাহেবের হুকুম, যে কুলি কাজ ছেড়ে চলে যাবে, তাকে আর কাজ দেওয়া হবে না। আর তোর মতন বুড়ো অকেজো লোককে নেওয়াই বারণ··· তবুতো শালা তোকে আমি বহুৎ মেহেরবাণী ক'রছি।

হরি দমে না, দোহাই হুজুর এই বাচ্চাদের মুখের দিকে চেয়ে দয়া করুণ !

সাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে ওঠে, তুই ব্যাটা মজা ক'রে শুয়োরের মত ছেলে-মেয়ের জন্ম দিবি···আর আমি তাদের খোরাক জোগাব, না ? যত সব কালা আদমী···

আর থাকতে না পেরে মুন্নু বলে ওঠে, হুজুর সাহেব ! দৌলতপুরে আমি শুনেছি, এখানে কুলিদের সব চেয়ে কম মাইনে হলো ত্রিশ টাকা !

সাহেব গর্জন ক'রে ওঠে, ঝুটা বাত্ !

হয়ত সাহেব রাগে ফেটে পড়তো কিন্তু লালকাকা ঠিক সেই মুহূর্তে সাহেবের সই-এর জন্যে একটা খাতা এনে ধরলো।

হরিকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে ইসারা ক'রে মুন্নু কানে কানে বলে, দাদা, চল অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখি !

হরি ভালরকমই জানতো অন্য জায়গায় গিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। দেখতে শুনতে আর বাকি ছিল না তার কিছু।

গোঁফে মোচড় দিয়ে সাহেব শেষ কথা বলে ওঠে, বল্ কাজ করবি কি না ? কোথাও আর কাজ মিলছে না ! এমনি হাজার হাজার কুলি বোম্বেতে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে···আমি যে তোদের নিতে চাইছি, তার কারণ, তুই এখানে কাজ ক'রে গিয়েছিস্···আর এ-ছোঁড়াটাকে মনে হচ্ছে চটপটে···

—হুজুর, আমরা কোথাও যেতে চাই না—আপনার আশ্রয়েই কাজ ক'রতে চাই···একবার ভেবে দেখুন হুজুর ··চাল কত মাগ্‌গি হয়ে গিয়েছে··· হরি হাত জোড় ক'রে জানায়।

—আচ্ছা···আচ্ছা···তোকে আর ঐ ছোঁড়াটাকে পনেরো টাকা ক'রেই দেবো···মনে রাখিস্ ব্যাটা, এবারের মতন মাফ করলুম···কিন্তু সেবারে আমাকে কিছুই ঠেকাও নি এবার তা' চলবে না, বলে রাখছি আগে থেকে।

হঠাৎ কি মনে ক'রে, একটু থেমে, কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে সাহেব বলে ওঠে, হাঁ, এখন নিশ্চয়ই কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই? সে আমি জানি! আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা নেই···আমি দশটাকা আগাম দিচ্ছি···কিন্তু মনে থাকে যেন, টাকা পিছু চার আনা সুদ···আর মাসে মাসে মাইনে পেলে আমার কমিশন···কেমন, রাজী তো? দাঁড়া, আমি টাকা এনে দিচ্ছি!

সাহেব চলে যেতেই বিরস মুখে নাদির খাঁ বলে ওঠে, আরে, টাকা ধার নিবি তো আমার কাছে নিলিনা কেন? আমি খুব কম সুদ নি—মাত্র টাকায় দু'আনা!

হরি বিব্রত হয়ে পড়ে, পাছে নাদির খাঁ আবার অসন্তুষ্ট হয়।

কাতরভাবে বলে ওঠে, কি করবো খাঁ সাহেব, সাহেবকে কথা দিয়ে ফেলেছি।

নাদির খাঁ কোন কথা না বলে কি দরকারে গুমটী ঘরের ভেতর চলে যায়। সেই ফাঁকে মুন্নু বলে, এ কি কাণ্ড! ফোরম্যানকে মাসে মাসে কমিশন দেবো কেন? আর তা' ছাড়া এত চড়া সুদে টাকা ধার ক'রলে কেন?

মুখ বেঁকিয়ে হরি জবাব দেয়, সব জায়গায় এই···ফোরম্যানকে কমিশন দেওয়া মানে চাকরী বজায় রাখা···বলতে গেলে ফোরম্যানই হলো কারখানার সব···

মুন্নু মনে মনে ভাবে, তা' হয়ত হবে···তবে সাহেবটার পোষাক এত ময়লা কেন? সাহেবের পোষাক সম্বন্ধে তার একটা স্বতন্ত্র ধারণা ছিল। হায়, মুন্নু তখনও পর্যন্ত জানতো না, যে ঐ ময়লা-পোষাক্-পড়া ফোরম্যানই

হলো কারখানার ভাগ্যবিধাতা। কারখানার সব ব্যাপারের সঙ্গেই সে জড়ানো। সে জানতো না যে মালিকদের পক্ষ থেকে তারই একমাত্র অধিকার লোকজন নেওয়া···এবং তারই প্রসন্নতার ওপর নির্ভর করে চাকরী থাকা না থাকা—মুন্নু জানতো না যে কুলিদের কাজকর্ম তদারক করার ভার তারই ওপর, এবং শুধু কুলি কেন, কারখানায় যে সব যন্ত্রপাতি চলছে সেগুলোকেও সচল রাখার দায়িত্ব তারই। মালিক আর কুলিদের মধ্যে সেই হলো যোগ-সূত্র···কারণ কুলিদের কোন কিছু হুকুম ক'রতে হলে মালিকরা তারই মারফৎ সে-কাজ ক'রে থাকেন। তাই প্রত্যেক কুলিকেই কাজ পাওয়ার জন্যে অথবা কাজ বজায় রাখার জন্যে তাকে একটা মূল্য দিতে হয় এবং কাজের চাহিদার চেয়ে লোকের চাহিদা যখন বেড়ে যায়, তখন স্বভাবতই সে মূল্যের হারও বেড়ে যায়। এত কাজ ক'রেও, আর একটা কাজ তাকে করতেই হয়—মহাজনী কারবার। সে-ও এই কুলিদের জন্যেই। এবং এই কুলিদের জন্যেই সে প্রায় শত-খানেক চালাঘর'ও তৈরী করেছে, যখন কুলিরা ঘুরে-ফিরে অন্য কোথাও জায়গা পায় না, তখন বাধ্য হয়েই বেশী ভাড়া দিয়ে তার ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয়।

টাকা নিয়ে যখন সাহেব ফিরে এলো, তখন সে আর ফোরম্যান নয়, বাড়ীওয়ালা।

—সাহেবের গলিতে আমার একটা চালা-ঘর আছে···ভাড়া মাসে পাঁচ টাকা মাত্র। এখন ঘরটা খালিই আছে। যা, এখুনি সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়্—নইলে কে আবার ভাড়া নিয়ে নেবে, বুঝলি? যা, আমি তোর জন্যে কমিয়ে তিন টাকা ক'রে দিলাম।

করতল দিয়ে কপাল স্পর্শ ক'রে হরি বলে ওঠে, হুজুরের দয়ার প্রাণ··· আমার মা-বাপ আপনি!

গম্ভীর ভাবে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে জিমি টমাস সাহেব নিজের উদারতায় যেন নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়, বলে, খুব হয়েছে—যা এখন, কাল ভোর বেলা পয়লা সিটি বাজতে না বাজতে হাজির হওয়া চাই! যা···

যাত্রীর দল ফিরে চলে।

একপাশে খোলা পা! নর্দমা···আর তার ধারে ধারে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ···

গলির মুখে দাঁড়িয়ে হরি বলে, এই হলো সাহেবের গলি! ঐ বোধ হয় আমাদের ঘর···এই বলে সারি সারি কতকগুলি চালাঘরের একপাশে একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। লম্বাপ্রায় ছ'ফিট হবে, আর চওড়ায় পাঁচ ফিট।

তারা সদলবলে সেই দিকে এগিয়ে চলে। ঘরের সামনে এসে দেখে দরজায় একটা ছেঁড়া চট পর্দার মত ঝুলছে। চট সরিয়ে বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে···ঘর নয়, একটা অন্ধকার গর্ত—

পুরানো চালা ঘুণ-ধরা বাঁশের আশ্রয় অবজ্ঞা ক'রে মাটীর দিকে ঝুলে পড়েছে—মুন্নু বা লক্ষ্মীর দাঁড়াতে গেলেই মাথায় লাগে। সেদিক থেকে হরির বরাত ভাল ছিল কারণ বয়স তাকে আগে থাকতেই কুঁজো ক'রে দিয়েছিল। ঘরের মেঝে বাইরের রাস্তার চেয়ে আধ হাত নীচু···তার ওপর ফুটো চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে দিব্যি ঘাস জন্মেছে। দেয়ালে মাটীর কাটল ছাড়া কোথাও আর একটু ফাঁক নেই যে আলো-বাতাস আসতে পারে কিম্বা ঘরের ভেতরের ধোঁয়া বাইরে যেতে পারে। তবে চিমটা সাহেবের অন্য ঘরগুলোর চেয়ে এই ঘরটীর একটী স্বতন্ত্র গর্বের জিনিস ছিল, দরজায় চটের পর্দা···ঘরের আব্রু তো রক্ষা হবে!

হরির কাছে এ-সব কিছু নতুন লাগে না। তাই ঘরে ঢুকে সহজ ভাবেই সে বলে, যাক্, এবার একটু হাত-পা মেলে বসা যাক্।

স্ত্রীকে ডেকে বলে, লক্ষ্মী, খাবার যা আছে, ভাগ ক'রে সকলকে দে।

সেই অন্ধকার ঘরের ভেতর মুন্নু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···সোজা ভাবে নয়···একটু নুয়ে। চারদিক থেকে সেই অন্ধকারে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ তার নাকে এসে লাগে···সব স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো ঘামে সারা মুখ ভিজে উঠেছে—মাথাটা লাট্টুর মত ঘুরছে। ক্রমশঃ চোখের সামনে অন্ধকার

আলো নিবিড় হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে দম আটকে আসে। ম্লান হেসে সে মাটীর ওপর বসে পড়ে নইলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়েই যেতো।

লক্ষ্মী তখন প্যাঁটরার ভেতর থেকে বাসি মিষ্টি-ফুলুরী বার করছিল। হঠাৎ মুন্নুকে অসাড় হয়ে বসে পড়তে দেখে ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো।

কিছুক্ষণ পরে মুন্নু নিজেই উঠে দাঁড়ায়। হরির সঙ্গে বাজার করতে বেরোয়। কুলি-পাড়ার বাজার, নামেই বাজার।

বাজারে ঢুকতে, দু'একজন চেনা লোকের সঙ্গে হরির দেখা হয়। আগে এই বাজার থেকেই হরি জিনিস-পত্র কিনতো। সেই সূত্রে সেখানকার কুলি-দের সঙ্গে তার আলাপ ছিল।

একটা দোকানের সামনে একদল কুলি বসে ছিল। দোকানী একজন শিখ। তার সামনে সাদা উর্দি-পরা একজন লোক একটা চাদর বিছিয়ে চাল কিনছিল। দোকানী গুণে গুণে ওজন ক'রে ঢেলে দিচ্ছিল, একা…দুয়া… একা…দুয়া…

হঠাৎ হরিকে দেখে কুলিদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, আরে এই যে হরি ভাই, কবে এলে?

হাত-জোড় ক'রে অভিবাদন জানিয়ে হরি বলে, এই ভাই পরশু এসেছি।

—তোমার বউ-ছেলেপুলে সব ভালো তো?

—হাঁ ভালই আছে একরকম…তাদের এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।

—তাই নাকি? বেশ…বেশ…

এমন সময় দোকানী পাল্লা নামিয়ে রেখে চীৎকার ক'রে ওঠে, বলি, এটা দোকান, না তোদের আড্ডাঘর…? কাজের সময় যত সব ঝামেলা দূর হ… হাঁ…একা—দুয়া…ত্রিয়া

দোকানী আবার পাল্লা তুলে নিয়ে মাপতে শুরু করে।

কুলিরা চুপটী ক'রে বসে থাকে।

চাল ওজন করা শেষ হয়ে গেলে দোকানী ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো হে, চিমটা সাহেবের আর কি কি দরকার?

চিমটা সাহেবের বেয়ারা উত্তরে জানায়, দুটো ডবল রুটি...এক ডজন্ ডিম ...আর দুটো মুরগী...

দোকানের ভেতর থেকে দুটো শাদা বড় পাউরুটী এনে ধরে দেয়। মুন্নু চেয়ে চেয়ে দেখে, হাঁ এই রকম শাদা পাউরুটি সাহেবেরাই খায় বটে।

—আর কি? এক ডজন ডিম, না? এই নাও...এক...দুই...তিন...এই এক ডজন...হাঁ...দুটো মুরগী...না?

এই বলে সেখান থেকে উঠে কুলিদের একপাশে একজন চাষী দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে এগিয়ে যায়। চাষীটার বগলে দুটো মুরগী।

—বলি এই শম্ভু...হুতুম প্যাঁচার বাচ্চা...বল্...বল্...জলদি বল্...এ দুটো কততে দিবি?

একটা মুরগী দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে শম্ভু সগর্বে বলে, একবার মুরগীটাকে টিপে দেখো...তারপর দাম বলবো!

মুরগীটার মুণ্ড ধরে এ-দিক ও-দিক ঘুড়িয়ে দোকানী বলে ওঠে, দূর বেটা কোথা থেকে একটা বুড়ো মুরগী নিয়ে এসেছে...ওটাতো দেখছি তেমনি শোলার মত হাল্কা...একটুও মাংস নেই গায়ে...শুধুই হাড়...বল্.. বল্...কি দিতে হবে?

শম্ভু কাতরভাবে বলে, কি আর বলবো হুজুর! হুজুর মা-বাপ! ভেবে-চিন্তে উচিত যা দাম বিবেচনা করেন, দিন্...নিজেরা না খেয়ে, এই দুটোকে খাইয়েছি!

তার সঙ্গে আর কোন কথাবার্তা না বলে, মুরগী দুটোকে নিয়ে এসে চিমটা সাহেবের বেয়ারার হাতে তুলে দেয়...এই নাও...বদরুদ্দীন সাহেব...

কি দামে বেচছে, সেটা যাতে, যার কাছ থেকে এখুনি কিনলো, তার সামনে আলোচিত না হয়...সেই জন্যে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, দাম এখন থাক সাহেবের নামে খাতায় লিখে রাখলাম।

তারপর দোকানের ভেতর গিয়ে একটা কাঁচের বোতল থেকে কতকগুলো চকলেট-জাতীয় জিনিস নিয়ে এসে বদরুদ্দীনের হাতে দিয়ে বলে, আমার নাম

ক'রে মেমসাহেবকে দিও···আর তোমার পাওনা···একদিন দুপুরে সময় ক'রে এসো···হিসাব ক'রে যা হোক বন্দোবস্ত করবো!

মুরগী দুটোকে বগলে পুরে চিমটা সাহেবের বেয়ারা বদরুদ্দীন গা দুলিয়ে চলতে সুরু করে···সাদা সাহেবের কালা চাকরেরা ঠিক যেমন ভাবে চলে।

বদরুদ্দীন দৃষ্টি-সীমার বাইরে চ'লে গেলে শিখ দোকানী শম্ভুকে ডাকে, মুরগীর দামের বদলে চাল নিবি না পয়সা নিবি?

শম্ভু দীনভাবে জানায়, কিছু পয়সা দিন, আর কিছু চাল ডাল দিন!

—আচ্ছা, এই নে চার আনা পয়সা আর আঁচল পাত্···এক সের চাল দিচ্ছি।

শম্ভু ছুটে গিয়ে দোকানীর হাঁটু জড়িয়ে ধরে, কি বলছো সর্দারজী! এক একটা মুরগীর দাম যে এক এক টাকা! বাড়ীতে আমার বউ এ দুটোকে যা খাইয়েছে, তাতে আমাদের অন্তত এক হপ্তার খোরাকী চলে গিয়েছে! আমি তো বলেছিলাম, বেচবো না। কিন্তু কি করবো, নগদ পয়সা যে একটাও নেই! সর্দারজী! হক দাম যা, তাই দাও!

সর্দার এবার রেগে ওঠে।

—কি! আমি তোকে ঠকাচ্ছি? হক দাম, মানে? মুরগী দুটো থেকে ভেবেছিস্ আমি বুঝি খুব লাভ করলাম? আরে ব্যাটা, ও দুটো আমাকে এমনি বকশিস্ দিতে হলো সাহেবকে! ঘুষ না দিলে সাহেব এখান থেকে মাল নেবে কেন? ও-থেকে এক পয়সাও আমি লাভ করছি না!

হাত জোড় ক'রে শম্ভু বলে, হুজুর, তুমিও মনিব, সাহেবও মনিব। তোমরা দু'জনেই বড়লোক—তোমরা ইচ্ছে করলে যা খুসী তাই বকশিস্ করতে পার। আমিও পরে একদিন হুজুরকে একটা মুরগী বকশিস্ ক'রে যাব! তবে দোহাই সর্দারজী, এখন এই দুটো মুরগী ছাড়া আমার আর কিছু নেই। বাড়ীতে একটা দানা নেই যে বউ-ছেলের মুখে দি! এক সের চালে একদিনও যাবে না···আর চার আনা পয়সায়, বোম্বের মত শহরে কি কিনবো বলো? বিচার ক'রে একটা কথা বল! অন্যায় করো না সর্দারজী!

সর্দারজীর গলা সপ্তমে চড়ে যায়।

—কি! আমি অন্যায় করছি? ঠকাচ্ছি তোকে? জানিস্ গুরু-গ্রন্থ রোজ পূজো করি আমি! কাকে কি বলতে হয়, ভেবে-চিন্তে বলবি হাবামজাদা! যা, আর দু'আনা বেশী দেবো—আর গোলমাল করবি না—তোকে নিয়ে পড়ে থাকলেই তো চলবে না—অন্য খদ্দের দেখতে হবে!

শম্ভুর চোখ আপনা থেকে জলে ভিজে আসে। হাত জোড় ক'রে বলে, হুজুর, আমি তো বেশী চাইচি না! যা ন্যায্য দাম, আমাকে তাই দিন্!

দোকানীর হাতের কাছে একটা কাঠের হাতা ছিল। সেটা তুলে সজোরে শম্ভুর কাঁধে এক-ঘা বসিয়ে দেয়।

—যা ব্যাটা পাজী…দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে! ব্যাটাদের যতই দাও…ততই নাকে কান্না!

আহত হয়ে শম্ভু সরে আসে। ছোট ছেলের মতন অসহায় ভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মুন্নু সামনেই বসে ছিল। যেন মাটীর সঙ্গে কে তাকে গেঁথে দিয়েছে। সামনে যে কি হচ্ছে, তা' সে শুনেও যেন শোনে না, দেখেও যেন দেখে না।

মার খেয়ে শম্ভু বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুলিরা তার কাছে গিয়ে তাকে হাত ধরে টেনে তোলে।

কাঁদিস না…চুপ কর…ব্যাটা ছেলে কাঁদছিস কি রে?

কুলিরা প্রকাশ্যে তার বেশী সহানুভূতি দেখাতে পারে না কারণ সর্দারজীর দয়ার ওপর তাদের জীবিকা নির্ভর ক'রছে।

সর্দারজী বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, এইনে আর এক আনা…আর এই এক সের চাল…শো'র পেটে ভরাগে যা!

মুখ দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এক হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে আর এক হাতে সালাম জানিয়ে, শম্ভু অগত্যা সেই পয়সা আর চাল তুলে নেয়। চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কেঁদে বলে ওঠে,

—দোহাই সর্দারজী···অপরাধ নিয়ো না···মাফ করো আমায়—মাফ করো সর্দারজী!

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ধীরে ধীরে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কুলিদের দিকে ফিরে তখন সর্দারজী জিজ্ঞাসা করে, কি চাই তোদের?

—সওদা কিছু চাই না হুজুর!

—তবে?

—যদি কোন মোট থাকে···

—না···না···আজ কোন মোট নেই···

তারপর হঠাৎ মুন্নুর দিকে দৃষ্টি পড়তে, জিজ্ঞাসা করে, কি চাইরে তোর?

হরি এগিয়ে গিয়ে বলে, ও আমার সঙ্গে এসেছে সর্দারজী, মিলে কাজে ঢুকেছে···ওর ইচ্ছে, আপনার দোকান থেকেই কিছু মাল খাতায় লিখে যদি পায়···অবিশ্যি বরাবর আপনার সঙ্গেই লেন দেন চলবে···আমাকে তো চিনতে পারছেন হুজুর? আমি হরি···গত বছর এইখানেই কাজ করতুম···

সর্দারজী বলে ওঠে, এ-বছর আমি সুদের হার চড়িয়ে দিয়েছি!

আমি টাকা ধার নিতে আসি নি হুজুর···আমি বলছিলাম কি, যদি দু'টাকার চাল আর এক টাকার ডাল ধারে দেন···আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো···আর যা দরকার, তা' না হয় নগদই কিনবো!

সর্দারজী জানিয়ে দেয়, ধারে মাল নিলে, টাকা পিছু এক আনা ক'রে সুদ দিতে হবে!

হরি কৃতার্থ হয়ে বলে, তা' হুজুরের যা ইচ্ছে···আমি না বলবো না!

—তা'হলে কাপড় পাত্···আর কি কি জিনিষ দরকার?

—ময়দার দর কি রকম সর্দারজী?

সর্দারজী নামতা পড়ার মত তাড়াতাড়ি যেন মুখস্থ বলে যায়। ময়দা টাকা টাকা সের, চাল আট আনা, ঘী পাঁচ টাকা, খাঁটি সর্ষের তেল এক টাকা ···গুড় চার আনা···ইংরেজী চিনি আট আনা···নাও···জলদি বল কি কি চাই! অন্ত খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে!

উল্লসিত মনে হরি ফর্দ বলে চলে, দশ সের ময়দা, পনেরো সের চাল, পাঁচ সের ডাল, এক সের তেল, এক সের দেশী চিনি···

মালের শেষে এই ফর্দের দরুণ তাকে কত যে দিতে হবে, সে বিষয়ে সে একটুও ভাবে না, কারণ কততে কত হয়, সে-ধারণা তার ছিল না।

কত টাকা যে খরচ হচ্ছে, মৃন্ময় তা' জানতেও চায় না···কারণ মাসের শেষে পনেরো টাকা সে পাবে, সেই ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা···ইতিমধ্যেই তাকে বেপরোয়া ক'রে তুলেছে।

[আট]

ভোরের আবছা অন্ধকারে তখন, ঘুম-পাড়ানো হাওয়া বইছে, সেই সময় পাতলা আকাশ চিরে হঠাৎ বেজে উঠলো কারখানার বাঁশী। তীব্র দীর্ঘ শব্দ।

তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ্মী একরকম বেসামাল কাপড়-চোপড়ে হাঁড়ি থেকে বাসি ভাত আর ডাল বার ক'রে সকলের সামনে ধরে। মাটীর হাঁড়ি থেকে খুঁটে খুঁটে শেষ ভাতটী বার করতে করতে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম আপনা থেকে ফুটে ওঠে। কিন্তু সেই বন্ধ ঘরের পচা গরমে যে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে, তা' দেখলে মনে হয় না। লক্ষ্মীর মুখ দেখলে মনে হয় না যে সে দুই ছেলের মা···পল্লীর মুক্ত জীবন তার সহজ যৌবন-শ্রীকে এখনও অটুট রেখে দিয়েছে। হয়ত প্রতিদিনের জীবনের তিক্ততা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ···নয়ত···পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আভ্যন্তরিক জ্যোতিতে বাইরের ময়লার কোন ছাপ পড়তে পায় নি···তার দুটী ঘন কালো চোখে এখনও আলো ঝিকমিক করে··· গালের দু'ধারে দুই গণ্ড এখনও তামাটে লাল। ঈষৎ-মুক্ত দুই ওষ্ঠে ভয়হীন, সদ্যবিকশিত সহজ হাসি···সে-হাসি নিজেকেও জানে না···জগৎকেও চেনে না।

বনের মধ্যে হঠাৎ যখন কুরিণী শোনে সিংহের গর্জন···ভেতর থেকে কি যেন তখন তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে···তেমনি কারখানার সেই লৌহ-গর্জন লক্ষ্মীর কানে এসে পৌঁছতেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন কোন্ দূর আশঙ্কার

হিম-শিহরণ তার পেটের ভেতর থেকে উঠে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে···তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অকারণে সে হেসে ওঠে। সে অশ্বস্তি সহ্য করতে না পেরে স্বামীর কাছে ছুটে আসে···ছোট ছেলে যেমন বিপদে পড়লে মা-বাপের কোলে ছুটে গিয়ে পড়ে। ডান-পায়ের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে স্বামীকে জাগাতে চেষ্টা করে···জোরে নাড়তে গিয়েও বেশী জোর দিতে পারে না, পাছে কিছু অসম্ভ্রম দেখায়।

—উঁ···হুঁ···হুঁ···

চোখ চেয়ে নানারকম অনুনাসিক শব্দ করতে করতে হরি উঠে পড়ে।

চাপা গলায় লক্ষ্মী বলে, কাজে যাবার সময় হয়েছে···কারখানার বাঁশী বেজে গিয়েছে···

তারপর ছেলেদের কাছে গিয়ে লক্ষ্মী তাদের ঠেলে ঠেলে তোলে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের পিচুটী মুছিয়ে দেয়।

মুন্নুকে ধাক্কা দিয়ে হরি ডাকে, ওঠো হে ভায়া!

মুন্নু আস্তে আস্তে চোখ খুলে চায়, দু'একবার পাশ-মোড়া দিয়ে নেয়, তারপর সোজা উঠে বসে সামনে চাইতেই দেখে, লক্ষ্মীর অনবগুণ্ঠিত সম্পূর্ণ মুখ। বীয়াস নদীর তীরে বহুদিন বহুপ্রভাতে সে দেখেছে, লক্ষ্মীরই মতন যুবতী সব নারী, অমনি দেহ-সৌষ্ঠব, অমনি তাম্রাভ তপ্ত রঙ। দৃষ্টি-সীমার মধ্যে সুন্দরী নারীর অস্তিত্বের আনন্দে তার অজ্ঞাতে তার সর্বদেহ পুলকিত হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মীকে সামনাসামনি না ডেকে অথচ তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে সে বলে, মুখ ধোবার জল একটু পেতে পারি?

মুন্নুর দিকে চেয়ে, লক্ষ্মী এক মুখ হেসে ওঠে, তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাটীর কলসী থেকে এক গেলাস জল নিয়ে দরজার ধারে রেখে আসে।

না, কাল বাঁশী বাজবার আগেই উঠতে হবে···নইলে দেরী হয়ে যাবে···

বলেই হরি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে।

মুন্নু কোন রকমে কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে গোছ-গাছ ক'রে, ঘরের এটা-সেটা ক'রতে লক্ষ্মীর দেরী হয়ে যায়।

বাইরে থেকে অধৈর্য হয়ে হরি রেগে চীৎকার ক'রে ওঠে, বেরিয়ে আয় মাগী! তোর জন্যে সকলের দেরী হয়ে যাবে···

ছেলেমেয়েদের টানতে টানতে লক্ষ্মী বেরিয়ে পড়ে।

পথে পুকুরের ধারে এসে, তারা যে-যার প্রাতকৃত্য সেরে নেবার জন্যে আলাদা আলাদা জায়গায় পুকুরের পাড়ে আশেপাশে বসে পড়ে। চারদিকে তখন তাদেরই মতন আরও অনেকে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে বসে গিয়েছে। অসহায় দৈন্য তাদের প্রাথমিক লজ্জাবোধ কেড়ে নিয়েছে কখন, তা' তারা নিজেরাই জানে না।

এমন সময় কারখানার দ্বিতীয় বাঁশী বেজে ওঠে।

তাড়াতাড়ি পুকুরে হাত-মুখ সব ধুয়ে তারা আবার চলতে আরম্ভ করে। কারখানার দরজার কয়েক গজের মধ্যে যখন এসে পড়েছে, তখন শেষ বাঁশী বেজে উঠলো। দলে দলে অন্য সব কুলিরাও তখন ভীড় ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা সেই দলে মিশে যায়। ভোরের শিশিরে শুকিয়ে যাওয়া কাদা আবার ভিজে উঠেছে। খালি-পায়ে কাদা-চটকানোর শব্দ উঠতে থাকে। নিদ্রা-শ্লথ অনিশ্চিত ক্লান্ত পদে তারা এগিয়ে চলে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। প্রত্যেকের কপালে ভয় যেন চিরকালের মত দাগ কেটে চলে গিয়েছে···দুশ্চিন্তার গুরু-ভারে প্রত্যেকের মাথা আপনা থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ কেউ পা পিছলে গিয়ে, বা অসাবধানতায় রাস্তার গর্তের মধ্যে জমানো কাদা-জলে পড়ে গিয়ে, গালাগাল দিয়ে ওঠে। হয়ত বা কোন বুড়ো কুলি পরিচিত অন্য কোন সহকর্মীকে দেখে অভিবাদন জানায়, রাম···রাম···ভাই! ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কেউ হয়ত সামনের শ্লথ-যাত্রীকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে দ্রুত চলবার ইঙ্গিত করে। সমবেতভাবে তারা এগিয়ে চলে, কিন্তু তাদের গতির মাত্রা অতি ধীর, অতি শান্ত।

মুন্নু দরজায় ঢুকতেই দেখে, কারখানার ঘড়িতে ছোট কাঁটাটা ছ'টার ঘরে গিয়ে সবে দাঁড়িয়েছে।

কারখানা ঘরে ঢোকবার সেড্রের মুখে জিমি টমাস সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। দু'পা ফাঁক ক'রে দীর্ঘ গোঁফের সূক্ষ্ম প্রান্ত দুটো হাত দিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে অগ্রসর-মান জনতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার সামনে এসে প'ড়ে, যেই কুলিদের দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ে, কলের পুতুলের মতন তাদের হাত কপালে উঠে যায়, সেলাম জানায়, তারপর ছায়াভয়-ভীত শাবকের মত দৌড়ে কারখানার সেডে ঢুকে পড়ে।

চিমটা সাহেব গর্জন ক'রে ওঠে, হারামজাদারা দেরী ক'রে আসবে আর এখানে এসে ছুটবে! অসভ্য বাঁদরের দল! এক,একজন ক'রে আস্তে আস্তে···

সকলের পিছনে আসে হরি···চিমটা সাহেবের সামনে প'ড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায়, সালাম সাহেব!

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মুন্নুদের দিকে চেয়ে চিমটা সাহেব বলে ওঠে, এই নতুন কুলিগুলো···তোরা আমার সঙ্গে আয়···তোদের কি করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি!

লক্ষ্মী আর তার ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চিমটা সাহেব মুন্নুর ঘাড় ধরে টানতে টানতে তাকে হরি আর একজন আধাবয়সী লোকের মাঝখানে একটা খালি কাঠের টুলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলে, এইখানে, তুই ওদের কাছে কাজ শিখবি!

মুন্নু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, চিমটা সাহেব অসংখ্য যন্ত্র-পাতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা শোয়াস্তির নিঃশ্বাস আপনা থেকে বেড়িয়ে এলো।

গরমে মুন্নু ঘেমে উঠেছিল। এইবার সে আত্মস্থ হয়ে তার নতুন পারিপার্শ্বিকের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। সামনে বহু কুলি কাজ করছিল। মুন্নু তাদের মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, শুষ্ক বিবর্ণ মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই। সেখান থেকে চোখ তুলে যন্ত্রপাতির দিকে চায়, গোল, চৌকা, লম্বা, ত্রিভঙ্গ, নানা আকারের নানা ধরণের সব যন্ত্র।

প্রথমটা মন্দ লাগে না। হঠাৎ যন্ত্রগুলো সব একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। তাদের অসংখ্য উত্থান-পতনের উন্মাদ গর্জন হঠাৎ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে তার মনে হলো যেন সে একটা খাঁচায় বন্ধ হয়ে আছে। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার যেন দম আটকে আসতে থাকে। বহু চেষ্টা ক'রে মন থেকে সেই ধারণা দূর করতে চেষ্টা করে। সমস্ত দেয়াল তুলোর আঁশে আর কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে···সে বিচিত্র কালো যেন চোখে এসে বেঁধে। সেখান থেকে দৃষ্টি তুলে দেখে, মাথার ওপরে দেয়ালের এক ফাঁকে একটুখানি ছিদ্র-পথ দিয়ে দু'এক ফালি সূর্যের আলো যেন লুকিয়ে চুরি ক'রে এসে পড়েছে। যত বেলা বাড়ে ততই ভেতরকার হাওয়া গরম হতে থাকে। তেল আর তুলোয় মিলে একটা ভারী গন্ধ নিঃশ্বাস আটকে দেয়। ঘামে গায়ের জামা ভিজে যায়। মনে হয় সে যেন একা, সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। ঐ একঘেয়ে শব্দ বোধ হয় ওকে পাগল ক'রে দেবে।

হরি বলে ওঠে, মুন্নু, এই দেখ্, আমি ডান হাত দিয়ে যেমন ঘুরুচ্ছি, এই হ্যাণ্ডেলটা তেমনি ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে ঘোরা·· যখনি সুতো ছিঁড়ে যাবে··· তাড়াতাড়ি গেরো দিয়ে দিবি।

মুন্নু মনে মনে আশ্বস্ত হয়, অন্তত এ কাজটা খুব সোজা।

কিন্তু হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে গিয়ে প্রথম প্রথম তার ভয় করে, সে অতি সন্তর্পণে ঘোরাতে থাকে।

—আর একটু জোরে ঘোরাও, ভায়া! হরি বলে ওঠে।

জোরে ঘোরাতে গিয়ে সুতো ছিঁড়ে যায়। কি ক'রে গেরো দেবে মুন্নু ঠিক ক'রতে পারে না। পাশের লোকটী এসে দেখিয়ে দেয়।

তারপর আর কোন অসুবিধা হয় না। সুতো ছিঁড়ে গেলে মুন্নু নিজেই জোড়া দিয়ে নেয়।

একটা নতুন কাজ সে শিখেছে, সেই আনন্দে খানিকটা তার মনের অবসাদ কেটে যায়। কিন্তু এ-কাজে দেহের পরিশ্রমের চেয়ে, সে বুঝলো, বেশী দরকার সজাগ দৃষ্টি। সর্বদাই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে সুতোর

দিকে। তার ফলে, কিছুক্ষণ পরেই মাথা ধরে যায়। চারদিক থেকে যন্ত্রের আওয়াজ···কোনটা টিক্-টিক্ ক'রছে, কোনটা গুম্-গুম্ ক'রছে···নানা যন্ত্রের নানা শব্দ···অবিরাম, অবিচ্ছেদ···তার সঙ্গে তাদের বিচিত্র গতি···কোনটা উপর-নীচু চলেছে, কোনটা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে আসছে···সেই সঙ্গে তেল আর নতুন তুলোর গন্ধ···সব মিলে তার মনকে যেন অবসন্ন ক'রে ফেলে··· কিছুক্ষণ পরে সে স্পষ্ট অনুভব করে, এক ঘন-কৃষ্ণ-ছায়া যেন তার অদৃশ্য লোহার আঙুল দিয়ে তার গলা আঁকড়ে ধরছে। মুন্নুর মনে পড়ে, আরো ছেলেবেলায়, তাদের গাঁয়ে, তাঁতিদের ভাঙ্গা তাঁতশালায়, কলুদের অন্ধকার ঘানি-গাছের আশে-পাশে, যেখানে চোখে কাপড় বেধে বলদেরা হয়ত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনি ধারা কি এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সে মাঝে মাঝে দেখতে পেতো!

টিফিনের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কুলিরা কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ায়। মুন্নুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বাইরে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ঘামে সমস্ত জামাটা ভিজে গিয়েছিল। চলতে চলতে জামাটা তাই খুলে ফেলে। এমন সময় হঠাৎ পাশের এক যন্ত্রের ঘুরন্ত চাকায় লেগে জামাটা তার হাত থেকে মুহূর্তের মধ্যে সরে যায়···দেখতে দেখতে জামাটা চাকায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জামাটা হাত থেকে আচমকা সরে যেতেই মুন্নু সেটাকে বাঁচাবার জন্যে তক্ষুণি দু'হাত বার ক'রে সেই ঘুরন্ত চাকার দিকে বাড়ায়··· অমনি একজন কুলি চীৎকার ক'রে ওঠে—

—হাত দিস্‌নি···হাত দিস্‌নি, হারামজাদা···

মুন্নু ভয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়!

—বেটার মাথা খারাপ নাকি! চাকায় হাত ঠেকলে আর পৈত্রিক প্রাণটা ফিরে পেতে না বাছাধন!

হরি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মুন্নুকে ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। যেতে যেতে পেছন ফিরে সেই দুরন্ত চাকার দিকে মুন্নু একবার চেয়ে দেখে। মনে মনে ভাবে, বহু-বাহু, আর বহু-শির যন্ত্র-দেবতা আজ তার মত দরিদ্র লোকের ময়লা জামাটা কেড়ে নিয়ে একি রসিকতা ক'রলো!

মুন্নুর কানে কানে হরি বলে, টিফিন টাইম্‌!

এই দু'টি ইংরেজী কথা সে কারখানা থেকে শিখেছে…

সারা কারখানার মধ্যে কুলিদের হাত-মুখ-ধোবার কোন ব্যবস্থাই নেই। পেছনের দিকে, রাশিকৃত টিনের কেনেস্তারা আর তেলের ড্রামের মধ্যে এক পাশে একটা পাম্প…সেখানেই শ'খানেক কুলি এক সঙ্গে জড় হ'য়েছে, এক আঁচলা জল খাবার জন্যে!

টিফিন!

কিন্তু টিফিন খেতে পারে এমন কোন ব্যবস্থাই নেই…কোন হোটেল নয়, কোন খাবারের দোকান নয়…কোন খাবারওয়ালা নয়…শুধু কারখানার গেটের বাইরে একজন ফেরিওয়ালা দু' ঝুড়ি সস্তা তেলে-ভাজা গজা জাতীয় জিনিস আর মুড়ি নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু কুলিদের স্ত্রীরা যে যার আপনার লোকের জন্যে বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে এসেছে…ভাত আর ডাল। একটা গাছ তলায় বসে গো-গ্রাসে তাই তারা শেষ ক'রে ফেলে।

অপরের স্ত্রী-ভাগ্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সামনে দেখে হঠাৎ হরির নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়।

—কৈ! সে তো এখনও এলো না? কি হলো তার? হরি কারখানার ভেতর ছুটে যায় দেখবার জন্যে।

এমন সময় কারখানার বাঁশী বেজে উঠলো, টিফিন শেষ।

দলে দলে আবার সেডের ভেতর গিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লো।

মুন্নু ভেতরে তার জায়গায় গিয়ে দেখে হরি তখনও আসে নি। কিছুক্ষণ পরে দেখে হরির জায়গায় অন্য আর একজন লোক এসে কাজ ক'রছে। হরির কি হলো? দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এলো কিন্তু তখনও হরির দেখা নেই।

কিছুক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতে হরি এলো, ভয়ে যেন তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

মুন্নুর দিকে চেয়ে কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো, ছোট ছেলেটার ডান হাতটা কুলে ভেঙ্গে গিয়েছে…বেচারা জানে না তো কিছু…ভুল ক'রে একটা ঘুরন্ত বেল্‌টে হাত দিতে গিয়ে তার এই দুর্দশা!

শুনে মুন্নুর মনে তীব্র কষ্ট হয় কিন্তু সে-কষ্ট সে বোঝাতে পারে না। নিরর্থক ভাবে শুধু হরির মুখের দিকে চেয়ে থাকে… মুখ দিয়ে একটাও সহানুভূতির কথা বেরোয় না…ভেতর থেকে তাঁর বুক টন্‌টন্ ক'রতে থাকে।

পাশের একজন কুলি জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার দেখিয়েছ?

কাঁদতে কাঁদতে হরি বলে, না, ভাই! মিলে তো কোন 'ডাকদার' নেই। তবে চিমটা সাহেব আমাকে ছুটি দিয়েছে, ছেলেটাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু আমার চাকরী বোধ হয় আর থাকবে না…পয়লা দিনই পুরো কাজ করলুম না…সাহেব তো খুব রেগে গিয়েছে!

এই দ্বিধা-বিভক্ত কর্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা তার পক্ষে শ্রেয় হবে, ঠিক ক'রতে না পেরে হতাশ হয়ে সে বসে পড়ে। মনে হয়, এত লোকজনের মধ্যেও সে যেন একলা। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার উঠে দাঁড়ায়। না, ছেলেটাকে নিয়ে যেতেই হবে। কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে আসে, যেন কি ফেলে গিয়েছে। মুন্নুর কাছে এসে বলে, ভাই, বাড়ী ফেরবার সময়, ছেলের মাকে তুই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাস্… সে-বেচারা পথঘাট তো কিছুই জানে না!

হরি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুন্নুর মনে হয়, এমনি তার বসে থাকা উচিত হয়নি। এই কারখানা থেকে শহরের দূরপথে এই রোদে ছেলেটাকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে বুড়ো মানুষের খুব কষ্ট হবে…সে তো খানিকটা সে-কষ্ট লাঘব ক'রতে পারতো, ছেলেটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে। মুন্নু যেন দেখতে পায় পথ দিয়ে টলতে টলতে হরি চলেছে…এ-রাস্তা সে-রাস্তা দিয়ে, পুকুর-পাড় দিয়ে, এতক্ষণে সে শহরের ধারে গিয়ে পৌঁছেছে…সেখান থেকে শহরের লোকের ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়… মুন্নু আর দেখতে পায় না… হঠাৎ মনে জাগে, যদি ছেলেটা পথেই তার কাঁধে মারা পড়ে? সে-ক্ষেত্রে হরির সঙ্গে একত্র বাস করা তার আর চলবে না, কারণ তারা নিশ্চয়ই ভাববে, তারই

জন্যে তাদের এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে। সে অপয়া তবু তো আজও পর্যন্ত, তারা জানে না, তার মা-বাপ কেউ নেই, সে অনাথ। জানলে হয়ত অপয়া ব'লে আগে থাকতেই তারা তাড়িয়ে দিত!

কে যেন মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা ক'রে ওঠে, সত্যিই কি অলুক্ষণে, অপয়া? আমি জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপকে খেয়েছি···তারপর মাকে হারিয়েছি···আমার জন্যেই প্রভুদয়াল ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছে···এখানে এলাম···এখানেও হরির এই দুর্ভাগ্য! তাহলে নিশ্চয়ই আমি অলুক্ষণে! যদি অলুক্ষণে তবে বেঁচে থাকি কেন? আমার মৃত্যুতে অন্তত জগৎ থেকে একজন খারাপ লোক সরে যাবে···

হরি তার পাশে নেই···তার মনে হ'লো, কারখানার মধ্যে তার কেউ নেই। এখানে কারুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার ওপর যন্ত্রের সেই কানে তালা-লাগা একঘেয়ে গর্জন···সে অস্থির হয়ে ওঠে। ক্ষিদেতে তার পাঁজরার ভেতর জ্বালা ক'রতে থাকে···যেন একটা ইঁদুর, মস্ত বড় ইঁদুর, তার পেটের ভেতর ঢুকে ভেতর থেকে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের সংঘাতে যেমন ফেনা জেগে ওঠে, তেমনি ভেতর আর বাইরের আক্রমণে তার মগজের মধ্যে ভাবনাগুলো যেন সব ফেনার মত একাকার হয়ে যায়···আর সেই ফেনার মধ্যে তার ছোট্ট প্রাণটুকু কোন রকমে ডুবে না গিয়ে ভেসে চলে··· কিন্তু কোথা থেকে ঝড় উঠে তাকে আর ভেসে থাকতেও দেয় না···বুঝি ডুবে যাবে এবার একেবারে।

তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে তুলে ধরতে। শহরে ঢোকবার সময় যে-সব বড় বড় বাড়ী সে দেখেছে, রাস্তায় দামী দামী পোষাকে যে-সব সাহেব আর ধনী রইসদের সে লক্ষ্য করেছে, দোকানে থাকে থাকে-সাজানো হরেক রকমের যে-সব আনন্দের উপকরণ তার নজরে পড়েছে, প্রত্যেকটী তার অজ্ঞাতে তার অন্তরের গভীর গহনে অদৃশ্য এক বৈচিত্র্যময় জীবনের ভোগ স্পৃহাকে জাগিয়ে দিয়েছিল···জীবনের কুৎসিৎ বাস্তবতার আড়ালে তার মনে মধুর স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন সে কারখানায় এসে চিমটা সাহেবের মুখে তার মাইনের কথা শুনলো···এত টাকা একসঙ্গে সে আর

কখনো হাতে পায় নি···সেই অনাগত রজত-খণ্ডগুলির কথা ভাবতে ভাবতে তার সে স্বপ্ন আরো প্রগাঢ় হয়ে ওঠে···সেই অর্থ দিয়ে সে যে-সব অমূল্য জিনিষ কিনবে, আগে থাকতেই তাদের স্পর্শ সে রোজ মনে মনে অনুভব করে··· কালো চক্ চকে বুট, বুকের-কাছে-টিকটীক-করা ঘড়ি, ঘড়ির চেন, পোলো-টুপি, রেশমের পোষাক···সাহেবিয়ানার যাবতীয় উপকরণ। অন্তরের অন্তরতম স্থলে অতি সযত্নে সে লালন ক'রে আসছে এই সংগোপন বাসনাকে ···বাইরে প্রকাশ ক'রে তার মাধুর্য নষ্ট করতে পর্যন্ত সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

পাছে এই স্বপ্নের ধন বুঝি নষ্ট হয়ে যায়, মাঝে মাঝে তাই সে নেড়ে-চেড়ে দেখে। নাড়তে চাড়তে কখন আবার মনের মধ্যে জেগে ওঠে বাঁচবার আশা, আলোর আকাঙ্খা···সেই আকাঙ্খার আলোয় মানস-নয়নে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, বিচিত্র হরফে-লেখা জীবনের আনন্দ-বেদ···নিজেকে উৎসাহ দেবার জন্যে নিজেই বলে ওঠে, আমি বাঁচতে চাই, আমি জানতে চাই, কাজ ক'রতে চাই···

এতক্ষণ পর্যন্ত সহকর্মী যে কুলিটিকে সে ভালো ক'রে দেখে নি···আধা-বয়সী···পালোয়ানের মত চেহারা···তাকে যেন ভাল লাগে···

লোকটি আপনা থেকে আলাপ সুরু করে, আমার নাম রতন। পাঞ্জাবে বাড়ী। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, পাহাড়ী, না?

মুন্নু খুশী হ'য়ে উত্তর দেয়, ঠিক তাই। তবে এর আগে আমি শ্যামনগর আর দৌলতপুরে কাজ ক'রে এসেছি!

—বেশ···বেশ···তোমার নামটী?

—মুন্নু

মুন্নুর ভাল লাগে, লোকটীর আলাপ করবার ধরণ, সহজ আন্তরিকতা। এতক্ষণ পরে তার মনে হয়, সে একা নয়।

এমন সময় ছুটির বাঁশী বেজে উঠলো। হাঁপাতে হাঁপাতে, শেষ দম ছেড়ে, কর্কশ শব্দে, কাঁপতে কাঁপতে যন্ত্রগুলো থেমে গেল। কুলিরা কাজ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, যেন বনের বাঘ অদূরে কোথাও কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়েছে।

ফেরবার মুখে তাঁতশালার ভেতর দিয়ে আসবার সময় মুন্নু দেখে, কারখানার কামীনরা···কারো পিঠের সঙ্গে ছেলে বাঁধা···কারো বা কোলে···কেউ বা মাটীতে ছেড়ে রেখে দিয়েছে···সেইখানেই ধুলোতে পিষ্টন, রড আর সিলিণ্ডারের লোহার-থাবার মুখে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

মুন্নু অবাক হয়ে ভাবে, ছেলেগুলো অক্ষত আছে কি ক'রে···কোন মেসিনই তার দিয়ে ঘেরা নয়···তাদের হাত-পা বা মাথাগুলো এখানে আস্ত আছে কি ক'রে!

লক্ষ্মী এক কোণে বসে আপনার মনে কাঁদছিল, এমন সময় মুন্নু খুঁজে গিয়ে উপস্থিত হলো। মুন্নুর সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে এলো। মুন্নুরও কান্না পাচ্ছিল কিন্তু তবুও তার চোখে জল এলো না। নীরবে দু'জনে পাশাপাশি চলে।

গেটে নাদির খাঁর গুমটী ঘরের ঘড়ির দিকে চেয়ে মুন্নু হিসেব ক'রে দেখে, এগারো ঘন্টা আগে তারা এইখান দিয়ে কারখানায় আজ ঢুকেছিল।

মাথার ওপর থেকে সূর্য নেমে গিয়েছে···আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে··যেন কে একটা বিরাট ময়লা পর্দা আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

[নয়]

শনিবার কুলিরাও আধবেলা ছুটি পায়। লক্ষ্মীর বড় সাধ, শহরের দোকান দেখবে। মুন্নুরও আগ্রহ কম ছিল না···যে-সব উপকরণ দিয়ে সাহেবদের জগৎ গড়ে উঠেছে, সে-গুলো তার মনকে যেন দড়ি দিয়ে টানতে থাকে।

বিকেলের দিকে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে হাসপাতাল। ছোট ছেলের ঘা তখনও সারে নি। রোজ গিয়ে ধুইয়ে আসতে হয়! সেখানে ডাক্তার এবং নার্সের অনুগ্রহ-দৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকতে থাকতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতে, হঠাৎ মাথার উপর মহাগর্জনে আকাশ ফেটে পড়লো··যেন এক সঙ্গে একদল

সিংহ গর্জন ক'রতে ক'রতে মত্তকরীদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। শূন্যের মহারণ্য সহসা জেগে উঠলো আর্তনাদে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্দম বেগে ক্ষিপ্ত অশ্বের দল উন্মাদ হ্রেষারবে ছুটে চলে···তাদের পায়ের লৌহ-পাদুকার সংঘর্ষণে মেঘ-প্রস্তরে ঠিকরে ওঠে বিদ্যুৎবহ্নি···আরোহীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ বর্শা ভেদ ক'রে পলাতক শিকারের বক্ষ···ভিন্ন-বক্ষ থেকে হিম-রক্তের মত ঝ'রে পড়ে বৃষ্টির বিন্দু···অজস্র ধারায়···দীর্ঘ সরল রেখায়···

সুবিপুল সেই বৃষ্টি-ধারায় সহসা পরিপ্লুত হয়ে ওঠে ধরণী। বহুদিনের নিরুদ্ধ বাষ্প আজ বন্ধন-হারা বৃষ্টি-ধারায় স্নিগ্ধ ক'রে দেয় মাটীর তৃষিত বক্ষ। নিরুদ্ধ ঘরে, অন্ধকার গর্তে, মানব ও পশু সভয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে।

দু'ঘণ্টা পরে, বৃষ্টির ধারা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, হরি ভিজে ভিজেই অনুচরদের নিয়ে বস্তির দিকে রওনা হলো। রাস্তা আর নয়, নদী···শহরের বাইরে শুষ্ক প্রান্তর আজ সম্পূর্ণ জলমগ্ন···বস্তির ধারের পুকুর কুল ছাপিয়ে চারধারের সমস্ত ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরগুলিকে ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জলে গায়ের চামড়ার ভেতরটা পর্যন্ত যেন ভিজে গিয়েছে···অনাবৃত দেহে কাঁপুনি লাগে। চারদিকে বৃষ্টির ঝিম্-ঝিম্ আওয়াজ···মাঝে মাঝে হঠাৎ বজ্রের গর্জন···সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলসানো নীল আলো···পায়ের তলায় মাটীতে পা রাখলে পা আপনা থেকে পিছলে যায়, ভয়ে জড়সড় হয়ে তারা একটা কলা বাগানের তলায় আশ্রয় নেয়। ভেজা অন্ধকারে আস্তে আস্তে চারপাশ থেকে দলে দলে অন্য সব কুলিরা এসে জড় হয়, তাদেরও ঘর ভেসে গিয়েছে।

আপনার মনে হরি বলে ওঠে, রাম! রাম।

কলাবাগান ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে। আশ্রয় তো চাই। মুন্নু চুপটী ক'রে পিছু পিছু চলে। বিদ্যুতের চমকানির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী চমকে চমকে ওঠে। ছেলে মেয়েগুলো ভিজে বেড়াল ছানার মত গোঁঙাতে থাকে।

মুন্নু কোলে ক'রে হরির ছোট মেয়েটাকে নিয়ে চলেছে। এমন সময় অন্ধকারে ভাঙ্গা কর্কশ গলায় তার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠলো। মুন্নু

তখন মনে মনে ভাবছিল, ছেলেবেলায় এমনি যখন তাদের গাঁয়ে বৃষ্টি নেমে আসতো, তার মা সেদিন পিঠে তৈরী ক'রতে বসতো···

এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর আবার হেঁকে উঠলো, ওহে মুনড়ু···বলি মুনড়ু হে···

মুন্নুর মনে হয় যেন পরিচিত কণ্ঠ। অন্ধকারে চারদিকে চেয়ে দেখে।

এমন সময় কণ্ঠস্বর খুব নিকটে ধ্বনিত হয়ে উঠলো, সুমধুর আহ্বান ক'রে কে যেন বলে উঠলো, এই শালা···বুঝেছি···ঘর ভেসে গিয়েছে তো··· ?

মুন্নু এবার চিনতে পারে। কারখানায় পালোয়ানের মত যে লোকটীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, রতন !

হরিকে ডেকে বলে, হরিভাই, রতন ডাকছে···

ততক্ষণে রতন সামনে এসে পড়েছে। হরি চেয়ে দেখে, তার চোখ দু'টো যেন জলছে, মুখে একগাল হাসি···মদের গন্ধ মেশানো। ভয় হয়, বুঝি রতন এই সুযোগে তাদের নিয়ে রঙ্গরস করে। কেন না কারখানায় তার সে-সুনাম আছে। দিলটা তার দরাজ তাই সকলের সঙ্গে সে মজা করে।

মুন্নুর কাঁধ ধরে বেপরোয়া ভাবে একটা ঝাঁকানি দিয়ে রতন বলে ওঠে, চল্, আমাদের চউলে···চল্ রে শালা—জানি আমি, কোথাও আর তোর যায়গা নেই যাবার !

মুন্নু সঙ্কুচিত হয়ে বলে, কিন্তু আমার সঙ্গে হরিভাই আর তার পরিবার রয়েছে যে !

রতন আজ মহা-উদার।

—তাতে হয়েছে কি ! সবাই চল্ ! যাবি না তো কিরে ভিখিরীর বাচ্ছা ? সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটো···আর রাত্রিরে···মাথা গোঁজবার একটা গর্তও নেই ! হাঁ যাবার শুধু একটা জায়গা আছে, তাড়ির দোকান !

আপনার মনে সে অট্টহাস্য ক'রে ওঠে। মুন্নুকে ইতস্তত ক'রতে দেখে তার পৌরুষে যেন আঘাত লাগে। হুংকার দিয়ে ওঠে, কি ভাবছিস্ রে ব্যাটা ? আমি রতন···হিন্দুস্থানের রুস্তাম···আমি ইচ্ছে ক'রলে তোদের

সকলকে জায়গা দিতে পারে! আমার চেয়ে বড় পালোয়ান কোন্ শালা আছে? আমার কাছে থাকবি, ভয় কি?

নিজের উক্তিকে নিজেই সমর্থন করবার জন্যে যেই দু'হাত দিয়ে বুক চাপড়াতে যাবে, অমনি পিছল মাটীতে পা রাখতে না পেরে টলে পড়ে যায়। তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য ক'রে গালাগাল দিয়ে ওঠে, এই শালা বৃষ্টি···ভগবান বেটা জল ছাড়ছে··বুঝেছিস্?

হঠাৎ হেঁচকি উঠতে আরম্ভ করায় বিব্রত হয়ে পড়ে। মনে পড়ে যায়, হয়ত কথাবার্তাগুলো ঠিক স্থানকালোচিত হচ্ছে না। হাত জোড় ক'রে হরিকে ডেকে বলে, কিছু মনে করো না ভাই! বুড়ো রতনকে আজ ক্ষমা করে দিও···একটু আনন্দ করেছি কি না? তবে, ভয় করো না, আমি ঠিক আছি...বিল্‌কুল ঠিক আছি···নির্ভাবনায় আমার সঙ্গে চলে এসো···আমি রাজার হালে তোমাদের রেখে দেবো···আমি হিন্দুস্থানের রুস্তাম···লোকের দায়ে অদায়ে কেউ না থাকুক, আমি আছি···চলে এসো···

রতন বড় বড় পা ফেলে আগিয়ে চলে। হরিভাই-এর দল সভয়ে তাকে অনুসরণ করে।

রতন তাদের নিয়ে যে চাউলে গিয়ে উঠলো, সেটা একটা তিনতলা বাড়ী! কোনরকমে কতকগুলো ঘর একটার পর একটা গেঁথে তোলা হয়েছে। তার চারদিকে ঠিক তেমনি সব বাড়ী। মাঝখানে এক গজও জায়গা ফাঁক নেই।

একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে তেতলার যে-ঘরের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়ালো, আয়তনে সেটি পনেরো ফিট লম্বা এবং দশ ফিট চওড়া হবে।

ঘরের ভেতর এত ধোঁয়া যে ভেতরে কি আছে না আছে তা ভাল ক'রে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে মুন্নু বুঝলো, সেই ধোঁয়ার ভেতর একজন কঙ্কালসার পুরুষ যেন নড়ছে আর মেঝেতে একটী ছোট্ট ছেলেকে কোলের কাছে নিয়ে একটি শীর্ণ ম্লান মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

মুন্নু দেখলো, ঘরের ভেতর যারা ছিল, তারা সুগম্ভীর নীরবতায় তাদের আবির্ভাবকে গ্রহণ করলো। এই ধরণের নীরব আপ্যায়নে প্রথম প্রথম মুন্নু

ভীত হয়ে উঠতো কিন্তু কুলিদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ক্রমশ সে লক্ষ্য করেছিলো, ওটা ওদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে জানবার কোন আগ্রহ বা কৌতূহল তাদের নেই। এক গজের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করলেও তারা কেউ কাউকে জানতে চায় না।

রতন গৃহস্বামীকে ডেকে বলে, তুই আধখানা ঘর ভাড়া দিবি বলেছিলি না শিবু? আমি একটা দলকে নিয়ে এসেছি…সাহেব পাড়ার গলিতে এদের ঘর ভেসে গিয়েছে।

হুঁকোতে টান দিতে দিতে শিবু বলে, আচ্ছা।

দরজার কাছ থেকে ঘাড় নীচু ক'রে হরিভাই তার দলবল নিয়ে ঘরে ঢোকে।

—তোমার ঐ কুঁড়ে ঘরের চেয়ে এ ঘর ঢের ভাল, রতন বলে।

হরি উত্তর দেবার আগেই মুন্নু বলে ওঠে, নিশ্চয়ই! গোড়ায় যদি এখানে এসে উঠতাম, তাহ'লে জিনিস-পত্তরগুলো আর নষ্ট হতো না?

হরিভাই এবার কথা বলে, কিন্তু আমি ভাবছি—চিমটা সাহেবের কথা তার ঘর ছেড়ে দিয়েছি বলে নিশ্চয়ই রাগ ক'রবে…গোটা মাসের ভাড়া তো নিশ্চয়ই আদায় ক'রে নেবে!

রতন তখন একটু ধাতস্থ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে, সেখানে কত ভাড়া দিতে?

—তিন টাকা।

—এখানে আর মাত্র দু টাকা বেশী দিতে হবে, রতন জানায়।

হরি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দেয়, চিমটা সাহেব তো দশ টাকা এমনি পাবেই…ধার দিয়েছে…এখন দেখছি, ঘটি-বাটি কেনবার জন্যে আরো কিছু ধার ক'রতে হবে…দেখি, কাল সকালে গিয়ে যদি কিছু উদ্ধার ক'রতে পারি! বিধি বাদ সাধলে মানুষ আর কি ক'রবে?

—ও সব কথা ছাড়ান্ দেও ভাই। শিবু আশ্বাস দেয়। তার ঘরের ভাড়া পাঁচ টাকা কমে গেল, এই সুখে সে উদার হয়ে ওঠে, ও সব কথা এখন থাক্। কিছু তো খেতে হবে। আমার বউ কিছু চাপাটী তৈরী ক'রেছিল…এখন তাই ভাগ ক'রে খাওয়া যাক্। তারপর ও ভাত চড়িয়ে দিয়েছে…খেয়ে দেয়ে

শুয়ে পড়ো ! সকাল বেলা বৃষ্টি থামলে, আমরা সবাই মিলে যাবোখন, দেখি তোমার জিনিস্-পত্তর কিছু উদ্ধার হয় কি না !

হরি কুণ্ঠিত হয়ে বলে, বড় মেহেরবাণী···তোমার ভাই এত বড় সংসার··· আবার আমাদের জন্যে রান্নাবান্না···

শিবু বাধা দিয়ে বলে, থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্···না হয় আমরা গরীব, এখন বোম্বে শহরে আছি···তবু আমরা সবাই পাহাড়ী গেঁয়ো লোক···সে কথা ভুল্লে চলবে কেন ? এই নাও চট্‌টা···এটা পেতে নাও।

হরি হাতজোড় ক'রে বলে, দেখতো, অকারণে তোমাদের কত কষ্ট দিলাম !

শিবু উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, সে কি কথা ! বাপের বেটা যে হবে, সে মানুষকে দেখবে ! চল্লিশ বছর ধ'রে এই সংসারের উঠতি-পড়তির মধ্যে ভাই শুধু এই একটা কথা শিখেছি, যদি এমন একটা কোনও কজে ক'রে যেতে পারো, যা দিয়ে মানুষ তোমাকে ভালবেসে মনে রাখবে, তা'হলেই এই মানব-জনম সার্থক !

রাত্রিবেলা মনের মধ্যে যে শান্তি নিয়ে মুন্নু ঘুমিয়ে পড়েছিল, সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই দেখে সে-শান্তি কিসের এক তীব্র বদ-গন্ধে যেন উড়ে যাচ্ছে ! এত কাছে কোথা থেকে আসছে এ-রকম তীব্র বদ-গন্ধ ?

রতনও ঘুম ভেঙ্গে উঠে একটা হুঁকো নিয়ে বসে ছিল। মুন্নু তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিল, কি জানি, বোধ হয়, ঐ গলির কাছে কোথা থেকে আসছে !

নাকে কাপড় গুঁজে মুন্নু জানালার কাছে গিয়ে গলির দিকে উঁকি মেরে দেখে···বাড়ীর নীচেই একটা খোলা ড্রেন···ময়লা ভ'রে গিয়ে উপচে উঠছে।

মুন্নু চীৎকার ক'রে ওঠে, রতন ভাই, এতো গলি নয়···এ যে পচা খাল···

অবিচলিতভাবে রতন জানায়, তা' হবে ! এই বাড়ীতে প্রায় দুশো লোক আছে···তাদের জন্যে নীচে ঐ গলিতে মাত্র সাতটা পায়খানা আছে··· মেথর বলতে একজন আছে···সে দয়া ক'রে যখন পরিষ্কার করে, তখনই কিছুক্ষণের জন্যে পরিষ্কার থাকে। তোমার যখন পায়খানা যাবার দরকার

হবে, মেথরকে ডেকে এক আনা পয়সা দিয়ে বলো, আলাদা যে পায়খানা আছে, সেটা যেন তোমাকে ব্যবহার ক'রতে দেয়···বুঝলে? আমি এখনই যাচ্ছি···এসো···তোমাকে দেখিয়ে দিই!

নীরবে বারাণ্ডা দিয়ে, স্তূপীকৃত জঞ্জাল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা কলসী, ভাঙ্গা খেলনা পেরিয়ে, মুন্নু নীচের দিকে চলে।

নীচে হাঁটু-পর্যন্ত কাপড় তুলে মেথর বসেছিল। দুর্গন্ধে মুন্নুর গা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠতে থাকে।

রতন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, পায়খানা ঠিক আছে তো?

মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে মেথর বলে, হাঁ, পালোয়ানজী?

মুন্নুর দিকে চেয়ে রতন বলে ওঠে, তুমিই আগে যাও···

তারপর মেথরকে ডেকে জানিয়ে দেয়, এই ছেলেটী আমাদের দেশ-অঞ্চল থেকে এসেছে···এর জন্যে রোজ পায়খানা সাফ ক'রে দিবি!

—জো হুকুম! বলে মেথর মুন্নুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ পরে মুন্নু ফিরে এলে, রতন তাকে কল-তলায় নিয়ে যায়।

—সারা বাড়ীতে এই একটা কল-তলা···সেই জন্যে হয়ত মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে একটু···

কল-তলায় হাত-মুখ ধুয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে, সেই সময় দেখে হরিভাই নেমে আসছে।

—যাই দেখি, জিনিস-পত্তর কিছু উদ্ধার ক'রতে পারি কি না!

মুন্নু বলে, বেশ···চল···আমিও যাব···পুকুরে স্নানটা সেরে আসবো!

পরের দিন সেডে ঢোকবার মুখে জিমি টমাস সাহেব, দু'হাত দিয়ে মোম-দিয়ে ছুঁচের মতন-সরু-করা গোঁফের দুই প্রান্ত পাকাতে পাকাতে, দু'পা ফাঁক ক'রে বিরাট প্রস্তরমূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল! কষাই-এর দোকানে সদ্যকাটা কাঁচা মাংসের মত মুখের রঙ···হুইস্কীর প্রসাদে তাতে চাপ-চাপ রক্ত জমা হয়ে আছে···তার মধ্যে নীল শিরাগুলো এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে···ভ্রূকুটী পর্যন্ত।

দূর থেকে সাহেবকে দেখে, সেইখান থেকেই সাহেবকে সালাম জানাবার জন্যে সে নিজেকে তৈরী ক'রে নিতে চেষ্টা করে…সাহেব বস্তুকে সালাম জানাতে গেলেই মুন্নুর রীতিমত তোড়জোড় করতে হয়…কেন যে তা' হয়, তা' সে বুঝতে পারে না।

কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে তার কারণটা যেন সে বুঝতে পারে। দরজার মুখে যেই কুলিরা ঢুকছে, অধিকাংশই পাশ কাটিয়ে পালিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেকেই সাহেবের স্থ-বুট লাথির আঘাতে ছিটকে পড়ছে…আঘাত সামলে সাহেবের ক্রোধ-রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তারা আবার ঢুকছে।

মুন্নুর বুক ধড়াস্ ক'রে উঠলো…সে দেখে, হরিভাই সাহেবের লাথিতে পড়ে গিয়েছে…কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে হরিভাই সাহেবের করুণা ভিক্ষা করছে।

—শুয়ারকা বাচ্চা! হারামজাদা! ঘর ছেড়ে দিবি তো আগে আমাকে জানালি না কেন?

মুন্নু শুধু শুনতে পায়, আহত অসহায় শিশুদের মত, কুলিরা একসঙ্গে সবাই কেঁদে উঠে বলছে, দোহাই হুজুর! দোহাই হুজুর!

কাঁদতে কাঁদতে হরি বলে, হুজুর, ঘরের ছাদ একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল—তার ওপর বৃষ্টিতে…

পা তুলে আঘাত করবার ভঙ্গীতে সাহেব গর্জন ক'রে ওঠে, মিথ্যে কথা! আমি কাল নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, কোথাও জল নেই!

হরির কণ্ঠস্বরে আর কান্না নেই। সে সোজা প্রতিবাদ ক'রে জানায়, কাল জল হয়েছিল, আমার সমস্ত জিনিস-পত্তর তাতে ভেসে যায়…বহুকষ্টে পরে তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু উদ্ধার ক'রে আনি!

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবের কথার ওপর কথা বলতে শুনে মুন্নু হরিভাই-এর ওপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে…আপনার মনে বলে ওঠে, সাবাস, হরিভাই, সাবাস!

তখন হরির পশ্চাতে সজোরে একটা লাথি মেরে সাহেব রেগে তেড়ে উঠেছেন, তবে রে হারামজাদা, আমি মিথ্যে বলছি!

মুন্নু উত্তেজনায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সেইখানে দাঁড়িয়েই বলে ওঠে, সাহেব, হরিভাই সত্যিকথাই বলছে, আমি দেখেছি, জলে ওর ঘর ভেসে গিয়েছিল! আমি ওর সঙ্গেই ছিলাম।

মুন্নুকে তেড়ে মারতে গিয়ে সাহেব বলে ওঠে, চুপ রও কুকুরকা-বাচ্ছা!

অন্য সব কুলি-রমণীদের সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলেমেয়েদের নিয়ে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। মুন্নুকে তেড়ে আসতে দেখে, সে কেঁদে উঠলো।

মুন্নু দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলে, মিথ্যে নয় সাহেব, আমি সত্যি কথা বলছি!

সাহেব যেই মুন্নুকে আঘাত করবার জন্যে হাত তুলেছে, অমনি রতন গম্ভীর ভাবে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—ছেড়ে দাও, সাহেব! মেরো না!

রতনের বিরাট দেহে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নেই...তাকে চঞ্চল ক'রে তুলতে হ'লে বুঝি অনেক কাঠ-খড় লাগে। তবে সেই বিরাট শক্তি-পুঞ্জের মধ্যে কোন অনিশ্চয়তাও নেই।

সংযত গাম্ভীর্যে সে জানায়, শনিবার রাত্তিরে আমি যখন ওদের দেখতে পাই, জলে ওরা তখন ন্যাতা হয়ে গিয়েছে...সমস্ত মাঠ ভেসে গিয়েছিল...আর ওদের ঘরের ছাদ যে ভাঙ্গা ছিল, আমি আগেই দেখেছি...বুঝেছ? আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে যেয়ো না তাহলে জীবনের মত শিক্ষা দিয়ে দেবো!

শেষ কথাগুলো বলবার সময় সে রীতিমত জোর গলা ক'রেই বল্লো... চোখ দুটো জ্বলে উঠলো...সাহেব শুনতে পেলো, তার দাঁতের ওপর দাঁত পড়ে রীতিমত আওয়াজ হচ্ছে।

একবার আপাদমস্তক রতনের বিরাট দেহটিকে দেখে নিয়ে চিমটা সাহেব দু'পা পিছিয়ে বলে উঠলো, যা, যা, নিজের কাজে যা! এখানে দাঁড়িয়ে বদমায়েসী করবি তো লাথি মেরে ঠিক ক'রে দেবো! আমার ঘর,

আমি ওদের ভাড়া দিয়েছি···তোর কি? তুই বেটা এর মধ্যে কেন কথা বলছিস্‌?

রতন গর্জন ক'রে উঠলো, বেশ করবো ··বলবো! ওরা আমার লোক! ভাল চাও তো সাহেব তোমার বাংলোয় ফিরে যাও, নইলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো!

কুলির দল চীৎকার ক'রে ওঠে···রতন···রতন···দোহাই সাহেব!

—বলি তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? জানিস আমি তোর উপরিওয়ালা? উপরিওয়ালা সাহেবকে অপমান করা? চিমটা সাহেব গর্জে ওঠে।

—সাহেবই হও আর যেই হও···তুমি ফোরম্যান আছো তা' হয়েছে কি? তা' বলে তুমি কারখানার কুলিদের লাথি মারবে?

নিস্ফল আক্রোশে চিমটা সাহেব প্রত্যাবর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে। কিন্তু ফেরবার মুখে হরিকে শাসিয়ে যায়, আমি কিন্তু ছাড়বো না, পুরো মাসের ভাড়া দিতে হবে...দাঁড়িয়ে দেখেছিস্‌ কি? যাও, যে যার কাজে যাও

সাহেব আর পিছন ফিরে তাকায় না।

রতন সাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তা' না হয় তুমি যেমন ক'রে পার আদায় ক'রে নিও। কিন্তু ওদের কারুর গায়ে হাত দিয়েছ কি তোমার একদিন না হয় আমারই একদিন

এই সময় পাঠান দারোয়ান নাদির খান এসে রতনকে টেনে সেডের ভেতর নিয়ে যায়,—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে পালোয়ানজ

কুলিরা ভয়ে জড়সড় হয়ে সেডের ভেতর ঢুকে পড়ে।

মুন্নু নিজের জায়গায় যাবার সময় দূর থেকে হাতের ইঙ্গিতে রতনকে অভিবাদন জানায়!

সেডের ভেতর রতনের পাশে একজন কুলি রতনের কানে কানে বলে, খুব সাবধানে থাকবি · সাহেব তোকে ভুলছে না, ঠিক একসময় প্রতিশোধ নেবে!

অবজ্ঞার হাসি হেসে রতন ব'লে ওঠে, ওর মতন অনেককে দেখেছি আমি·· রেখে দে, রেখে দে! বহুৎ মেহনৎ ক'রে পালোয়ান হ'তে হয়েছে··· অমনি নাকি?

কাজ-কর্ম স্থরু হয়ে গেলে মুন্নু রতনের কাছে এসে বলে, রতনভাই, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর একটু হ'লে হয়ে যেতো বলতো !

—আরে, ভয় পাচ্ছিস্ নাকি ? ওর মতন ঢের-ঢের লোক আমি দেখেছি ! তখন আমি জামসেদপুরে টাটার কারখানায় কাজ করি·· সেখানে একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক কাজ করে···একবার আমাদের মাইনে কেটেছিল ব'লে আমরা ধর্মঘট করি···কোম্পানী কিছুতেই নুইবে না···শেষকালে···এই শর্মার জন্যেই কোম্পানীকে নুইতে হলো···

বলেই নিজেকে বাহবা দেবার জন্যে নিজের বুক নিজেই চাপড়ায়।

একটা ছেঁড়া সুতোয় গেরো দিতে দিতে মুন্নু জিজ্ঞাসা করে, তা'হলে টাটার কারখানা ছেড়ে এলে কেন ?

—সে আর একবার ধর্মঘট হ'লো···বেশী ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেয়··· কুলিদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে···থাকবার জায়গা ভাল জোটে না···এই সবের দরুণ। ধর্মঘটের যারা নেতা ছিল, কোম্পানী তাদের ভয় দেখিয়ে, কাউকে বা উঁচু চাকরী দিয়ে হাত ক'রে নিল। বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে একজনকে আমি ধরলাম এবং বেশ উত্তম-মধ্যম ঘু'ষা দিয়ে দিলাম। তারপর বুঝলে কি না, চাকরী ছেড়ে পালিয়ে এলাম···ধর্মঘট তবুও চলতো কিন্তু সেবার ধর্মঘট যারা ক'রেছিল, তারা মস্ত বড় একটা ভুল ক'রে বসলো। একটা ধর্মঘট ভাল ভাবে উৎরে যাওয়ার অত কাছাকাছি আবার ধর্মঘট করতে নেই। তা'ছাড়া, সেখানকার কাজটাও আমার মনের মত ছিল না···বড় বেশী খাটতে হতো।

মুন্নু অবাক হয়ে শোনে। বলে, লোহার কারখানায়, আমার কিন্তু কাজ করতে বড্ড ইচ্ছে যায়। সেখানে তোমরা বড় বড় লাইন তৈরী করতে ? রেলের লাইনের মত ? মস্ত বড় বড় উনুন, না ? তার ধারে বসে থাকতে কি মজা ? এখানে, শুধু বসে বসে সুতো টানো আর গেরো দাও !

মুন্নুর কথায় রতনের পূর্ব-স্মৃতি জেগে ওঠে। বলে, তখন আমার আঠারো বছর বয়স·· সেই কারখানায় যখন গিয়ে ঢুকি। অবশ্য তার আগে আগুন

নিয়ে কাজ করেছিলাম, দৌলতপুরে…আমাদের জাত-ব্যবসাই হলো তামার কাজ কিন্তু জামসেদপুরে গিয়ে বুঝলুম সে-সব আগুন হলো ঠাণ্ডা বাতাস। জামসেদপুরের কারখানায় আগুনের আঁচ, সে যে কি ভয়ঙ্কর তা' তোকে কথা দিয়ে কি বোঝাবো…সদাই জ্বলছে…এক মুহূর্ত রেহাই নেই। চোখের সামনে যেন আগুনের ঢেউ ঘুরছে, ফিরছে, নামছে…চোখ ঝলসে যায় দিনেও যেমন রাত্রিতেও তেমন…গ্রীষ্মকালেও যেমন শীতকালেও তেমন…যখন বৃষ্টি আসতো, গরম ছাউনীতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে-জল উবে যেতো…আর হিস্ হিস্ শব্দে ধোঁয়া উঠতে থাকতো।

অনু মনে মনে ভাবে যদি কোন রকমে সেখানে একবার ঢোকা যায়। জিজ্ঞাসা করে, সেখানে কাজ পেয়েছিলে কি ক'রে?

—কাজের দরকার, তাই কাজ পেয়েছিলাম। দরজায় গিয়ে দারোয়ানকে ধরতে, দারোয়ান বল্লো, ফোরম্যানের সঙ্গে দেখা ক'রতে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না! তখন কোথায় যেন মস্ত বড় যুদ্ধ বেঁধেছিল, তাই কারখানায় বড় বড় রেল তৈরী হচ্ছিল। বিস্তর কাজ অথচ তেমন লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তার কারণ, যত সব কুলি ছিল তারা তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে পাগলের মত ছুটেছিল সৈন্য হতে। যুদ্ধে মরার মধ্যে একটা গৌরব আছে তো?

—কারখানার কাজ কি খুব শক্ত?

—কি বল্লি? শক্ত? ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা…হপ্তায় সাতদিন। বিরাট খোলা উনুন…রাতদিন জ্বলছে…তার ওপর বড় বড় চৌবাচ্চার মতো কড়ায় জলের মত পাতলা গরম গলানো ইস্পাৎ টগবগ ক'রে ফুটছে। আমার মাথার ওপরে চেন্-ম্যান কপি কলে সেই জ্বলন্ত কড়া তুলে বাঁ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চীৎকার করে উঠতো…সাবধান…গরম লোহা! গরম বটে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যি-ডোবার সময় আকাশ যে-রকম লাল হয়, ঠিক সেই রকম লাল…আধ ঘন্টার পর একটু একটু ক'রে রঙ বদলে কালো হতো। যখন কালো হয়ে যেতো, তখন যদি ভুল ক'রে, বা আচমকা তাতে হাত পড়তো,

যেখানটায় ঠেকতো, সেখানটা জ্বলে যেতো। অনেক দিন আবার ডবল কাজ ক'রতে হতো চব্বিশ ঘন্টা। একদিন আমার বদলি যে লোকটা ছিল, সে এলো না, আমাকেই এক নাগাদে ছত্রিশ ঘন্টা কাজ ক'রতে হলো।

অবাক হ'য়ে মুন্নু বলে ওঠে, বল কি। ছত্রিশ ঘন্টা! ঘুম পেতো না?

—অবশ্য ছত্রিশ ঘন্টাই সমান কাজ করতে হয় নি। ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে সবশুদ্ধ বত্রিশ ঘন্টা কাজ করেছি···বাকি চার ঘন্টা রাত্রির বেলা কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছি। তবু তাও এক সঙ্গে চার ঘন্টা নয়···দশ পনেরো মিনিট ক'রে যখনই সুযোগ পেয়েছি···একটা কাঠ পড়ে থাকতো·· তার ওপর ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তাম। পাশেই টাইম-কিপারের ঘাঁটি ছিল। ব্যাটা আফিং-খোর ··ঝিমুতো···তা' ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল যে আগুন-ঘরে কেউ ঘুমুতে পারে না।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে মুন্নুর দুটো চোখ ভাঁটার মত বড় হয়ে ওঠে।

মুন্নুর মুখের দিকে চেয়ে রতন বুঝতে পারে, ছোকরার ভাল লাগছে। তাই সে বলে চলে, তা' বলে তুমি জামসেদপুরে যাবার কথা মনে ঠাঁই দিয়ো না। এখানে যেমন স্থতোর কাঠি ঘোরাচ্ছ তেমনি ঘোরাও। সেখানে একটু যদি অসাবধান হয়েছ, অমনি একটা না একটা কিছু বিপদ ঘটে গিয়েছে, মাথার ওপর দিয়ে কপিকলে অনবরত চলছে ইয়া ভারী ভারী ইস্পাৎ···এক একটার ওজন যে কত টন তা' কে জানে···যদি একবার একটা কোন রকমে পড়ে যায় ··ব্যাস্

এমন সময় দরজার ফাঁকে দেখা যায় চিন্‌টা সাহেবের মুখ···চীৎকার ক'রে সকলকে শাসিয়ে যায়···আড্ডা না মেরে যে-যার কাজ জলদি সারো!

রতনের কানে কানে মুন্নু চাপা গলায় বলে, ব্যাটা, আমাদের বাগে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না!

ছাড়েও নি। তবে তার পরের দিন নয়, তার পরের সপ্তাহেও নয়, পরের মাসেও নয়···এক মাস পনেরো দিন পরে · যেদিন মাসের পাওনা মাইনে কুলিদের দেওয়া হচ্ছিল।

শনিবার বিকেল বেলা। বর্ষা-অন্তে নিষ্করুণ সূর্য তখন কারখানার খোলা মাঠে সমবেত নগ্ন-দেহ কুলিদের কালো চামড়ায় বার্ণিস দিচ্ছিল আর বারাণ্ডার তলায় উপবিষ্ট চিমটা সহেবের লাল মুখকে আরো লালচে ক'রে তুলছিল। তেল-কালি মাখা ময়লা প্যান্টে আর ময়লা সার্টে চিমটা সাহেব বারাণ্ডার এক ধারে বসে···পাশে দেহরক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে পাঠান নাদির খাঁ।

কতকগুলো অসভ্য মাছি সাহেবের পোষাকে তেল-কালির গন্ধে আর গোঁফের মোমের আকর্ষণে তখন অনবরত সাহেবকে বিরক্ত ক'রে তুলছিল। দু'হাত দিয়ে তাদের তাড়াতে তাড়াতে সাহেব হেঁকে উঠলো, হারি!

হরি তখন একমনে দেখছিল, রতন আর মুন্নু মাটিতে ঘর কেটে বাঘবন্দী খেলছে। তার নাম যে সাহেবের মুখে হারিতে রূপান্তরিত হয়েছে, সে তা' ঠিক ক'রে উঠতে পারে নি। তাই সে চুপ ক'রে খেলা দেখতেই লাগলো।

অধীর হয়ে অসহিষ্ণুতায় সাহেব আবার হেঁকে উঠলো, হারি!

কোন উত্তর নেই। অন্য কুলিরা এদিক ওদিক চাইছে। পাছে দেরী হ'লে সাহেব আবার রেগে যায়। রেগে গেলে কার ওপর যে সে-রাগের ঝাঁঝ পড়বে, তাতো ঠিক নেই!

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সাহেব গর্জে উঠলো, হারি!

মুন্নুর কানে আওয়াজ যেতেই সে চমকে উঠে হরিকে ঠেলে বলে উঠলো, হরি ভাই! আরে যাও, সাহেব তোমাকে যে ডাকছে!

তৎক্ষণাৎ হরি লাফিয়ে উঠলো।

হরিকে আসতে দেখে সাহেব চীৎকার ক'রে উঠলো, জলদি! জলদি! আমি কি ব্যাটা তোর বাপের চাকর যে, হুজুরের হাতে মাইনে তুলে দেবো বলে এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো? দেখি বুড়ো আঙ্গুল!

—মাই বাপ! বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতের বুড়ো আঙুলে কালির প্যাড থেকে কালি মাখিয়ে নেয়। তারপর কাঁপতে কাঁপতে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

চিমটা সাহেব কোন রকমে তাচ্ছিল্য ভরে হাতটা নিজের হাতে তুলে ধরে, যেন কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ স্পর্শ করতে হচ্ছে। আঙুল ধরে খাতায় টিপ সই দিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর গুণে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট আর একটা দশ টাকার নোট তার হাতে তুলে দেয়।

—দাঁড়া…দশ টাকা ধার শোধ…এক টাকা সুদ…এক মাসের ঘর ভাড়া তিন টাকা…ঘর মেরামতের দরুণ এক টাকা…কারখানার কাপড় নষ্ট করার দরুণ পাঁচ টাকা ক'রে কাটান…বুঝলি? বাকি এই কুড়ি টাকা…তোর হাতে দিচ্ছি…তোর, মুন্নুর, তোর বউ-এর আর বাচ্চা দুটোর মাইনে…

নগদ…সুদ…কাটান…ভাড়া… দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে হরির এ-সব শব্দগুলোর অর্থ জানা ছিল। মনে মনে কষ্টও হলো, বাইরে কোন কথা উচ্চারণ করবার মত সাহস তার ছিল না। নিঃশব্দে সেই কুড়ি টাকা নিয়ে, সাহেবকে সালাম জানিয়ে, পিছু হটতে হটতে চলে আসে।

মুন্নুর কাছে এসে দাঁড়াতেই তার দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল ঝরে পড়ে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় শীর্ণ মুখ যেন দড়ির মত পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে।

মুন্নু জিজ্ঞাসা করে, কি হলো হরিভাই?

রুদ্ধ কণ্ঠে হরি বলে, কিছু না! কিছু না! কাপড় নষ্ট করার দরুণ পাঁচ টাকা ক'রে কেটে নিয়েছে…তার ওপর ধারের টাকা · সুদ ··বাড়ী-ভাড়া… সব শুদ্ধ মিলিয়ে আমাদের পয়তাল্লিশ টাকা থেকে এই মাত্র কুড়ি টাকা পেলুম! এই নাও তোমার দশ টাকা!

মুন্নু বাধা দিয়ে বলে, না…ও টাকা তো আমি নিতে পারি না। আমার খাওয়া, থাকা বাবদ ও তোমারই প্রাপ্য।

হরি তবুও বলে, তা' হয় না! আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে? তোমার মাইনে তুমি নাও!

আপোষ নিষ্পত্তি স্বরূপ রতন বলে, বেশ, হাত খরচের জন্যে পাঁচ টাকা ও-কে দে!

এমন সময় এলো ডাক—রটন!

রতন অঙ্গ দুলিয়ে চিমটা সাহেবের সামনে মাইনের টেবিলে গিয়ে হাজির হলো। চিমটা সাহেব বলবার আগেই সে বলে উঠলো, কাপড় নষ্ট করার দরুণ কাটান ছাটান আমার নেই…সুদ নেই…আমি অমন ধারও করি না।

চিমটা সাহেব টাকা গুণে বলে ওঠে, উনিশ টাকা…দেরী ক'রে আসার দরুণ এক টাকা ফাইন।

দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে নিয়ে, পালোয়ান চীৎকার ক'রে ওঠে, কুড়ি টাকা…তার এক আধলা কম নয়!

চিমটা সাহেব মুখ তুলে রতনের চোখের দিকে চেয়ে দেখে। সেখানে তখন আগুন জ্বলে উঠছে। আপনা থেকে সাহেবের হাত গোঁপে উঠে যায় …লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে।

নিজের মর্যাদা বজায় রাখার জন্তে বলে ওঠে, আচ্ছা! এবার মাপ করলুম …দেখি আঙুল!

রতন গম্ভীর ভাবে বলে ওঠে, আমি লিখতে জানি!

কলমটা এগিয়ে দিয়ে, সাহেব দু'খানা দশ টাকার নোট আগিয়ে রেখে দেয়। লোকটা বিদেয় হ'লে যেন বাঁচে।

রতন ধীরে সুস্থে হিন্দুস্থানীতে গোটা গোটা ক'রে তার নাম সই করে …তারপর টাকাটা ভাল ক'রে দেখে নেয়।

—মেহেরবাণী সাহেব! বলে সোজা সাহেবের সামনে পেছন-ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে আসে। এ ভাবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে সাহেবের সামনে দিয়ে চলে আসা কুলিদের রীতি-বিরুদ্ধ!

রতন ফিরে এসে দেখে মুন্নু আর হরি নেই। ভাবলো, নিশ্চয়ই বাড়ী চলে গিয়েছে। সে-ও বেড়িয়ে পড়ে।

কারখানায় বাইরে মাঠের সামনে দেখে, একটা লম্বা পাঠান হরিকে ঘাড় ধরে টানছে। আর একটা বেঁটে মুসলমান রাইফেলের বাঁট তুলে তাকে শাসাচ্ছে। কাছে ভিতে মুন্নু নেই।

হরিকে ঘাড় ধরে চেপে পাঠানটা বলছে, ব্যাটা চোখে ধুলো দিয়ে পালাবি ভেবেছিলি? ভেবেছিলি পায়ে পায়ে লুকিয়ে থাকলে আর দেখতে পাবো না? দে ব্যাটা, নাদির খাঁর টাকা শোধ ক'রে দে···সে এখানে নাই বা রইলো···আমরা তো আছি!

হরি কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট পাঠানটার হাতে দিতেই, পাঠানটা এক লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কাপড় ছিঁড়ে, দাঁতে দাঁতে লেগে হরি মাটীতে পড়ে গেল।

—পাঁচ টাকা! পাঁচ টাকা তো শুধু স্থদ! আসল টাকা কই! ব্যাটা খোল কাপড়···কাপড়ের ভেতর নিশ্চয়ই ব্যাটা লুকিয়ে রেখেছিস···

হাত জোড় ক'রে তার ভেতর অন্য নোটখানা লুকিয়ে রেখে হরি বলে, দোহাই খাঁ সাহেব, এমাসে সব কেটে নিয়েছে···সামনের মাসে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো ··এ মাসে আর দিতে পারবো না···

হাত ধরে টানতেই হাতের নোটটা পড়ে গেল। পাঠানটার বেঁটে সাথীটা সেটা তুলে নিয়ে যেই লাথি মারবার জন্যে পা তুলেছে অমনি রতন পেছন দিক থেকে এসে তার গলার জামা টেনে ধরলো।

ছেড়ে দে ওকে···বদমায়েসের দল!

পাঠানটা বিরক্ত হয়ে বলে, এর সঙ্গে তোমার কি আছে পালোয়ান?

—সব কিছু আছে, হারামীর বাচ্ছা! তোমাদের টাকা তো দিয়ে দিয়েছে ···আবার কি? একটা বুড়ো মানুষের ওপর জোড় ফলাতে লজ্জা করে না ব্যাটা? আয় না, কত তাগৎ আছে···আয় আমার সঙ্গে!

পাঠানটা ততক্ষণে হরিকে ছেড়ে দিয়েছে।

—আচ্ছা! আচ্ছা! বাকি যা রইলো তা' নগদের সঙ্গে খাতায় জুড়ে দেবো···যা···আজ যা!

ছাড়া পেয়েই হরি ভয়ে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে ছুটতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল!

রতন ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে।

—ভয় নেই হরি···আমি রতন !

হরির তখন মনে হচ্ছিল যেন পাঠান দুটো তার পেছনে পেছনে আসছে।

কোনো কথা না বলে তারা দু'জনে ঘরে ফিরে এলো।

সিঁড়ির সামনে মুন্নু আর চৌকিদার দাঁড়িয়ে।

তাদের দেখে মুন্নু আগিয়ে এসে জানায়, চৌকিদার ভাড়ার জন্যে এসেছে ···আমি বলেছি, শিবুর কাছ থেকে নিতে !

কাপড়ের খুঁট থেকে তিনটী টাকা বার ক'রে হরি বলে, তুমি আর দুটো টাকা দাও···তারপর শিবুর সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া ক'রে নেবো'খন !

মুন্নু দুটো টাকা দিয়ে দেয়।

রতনও দুটো টাকা চৌকিদারের হাতে দেয়, আমার ভাড়া !

হরি কোন রকমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ঘরে পৌঁছায়। ঘরে ঢুকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঝের ওপর বসে পড়ে। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে তার পা টিপতে আরম্ভ করে।

রতন বাইরে একটা বিড়ি ধরায়।

মুন্নুর সাধ যায়। কিন্তু টানতে গিয়েই গলায় ধোঁয়া আটকে যায়। কাশতে আরম্ভ করে। রতন হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

শিবু সেই সময় ঘরে এসে ঢোকে।

—আমারও মাইনে থেকে পাঁচ টাকা কেটে নিয়েছে, কাপড় নষ্ট করার দরুণ·· হাসতে হবে না আর...এসময় ভাল লাগে না হাসি !

রতন হাসি থামিয়ে বলে, কই, আমার মাইনে থেকে তো ও-সব বাজে অজুহাতে কাটতে সাহস করে না ! তোমরা ভয় পাও···তাই ওরা অত্যাচার করে ! আমার মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পার না ? তা' যদি না পার, আমার সঙ্গে চলো, য়ুনিয়নে নাম লেখাবে চলো···অমন কুঁড়ে হলে কি চলে ?

মুন্নু লাফিয়ে ওঠে, আমি য়ুনিয়নে নাম লেখাবো ! বল, কোথায় যেতে হবে ?

রতন বলে, বেশ চলো·· আমি নিয়ে যাবো···দেরী করলে চলবে না !

লক্ষ্মীর সেবার ফলে হরি ততক্ষণে কথঞ্চিত সুস্থ হয়ে উঠেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে-ও বলে, আমিও যাবো—আমিও নাম লেখাবো!

—আমিও যাব, শিবু বর্মে।

সকলকে নিয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হেসে বলে, নাম লেখার পর, তাড়িখানায় গিয়ে সবাই মিলে এক পাত্র খেয়ে ফিরবো। কেমন?

দেখতে দেখতে মুন্নু আর রতনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে ওঠে·· সহজ, সরল, তাজা দু'জন পাঞ্জাবীর মধ্যে যে-রকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব। যেমন তাড়াতাড়ি এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল, তেমনি তা' গভীরও হয়ে উঠছিল··· যেন তারা—যাকে বলে ন্যাংটো বেলাকার বন্ধু।

যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তারা দু'জনে এসে পড়েছিল···তাতে ক'রে আপনা থেকে এই বন্ধন আরো সুগভীর হয়ে ওঠে। সেই প্রাণহীন শব্দ-সঙ্কুল কারখানার মধ্যে, কিম্বা বাড়ীতে সেই বন্ধুহীন জনতার মধ্যে, জীবনের তিক্ততা যেখানে পায়ে পায়ে কাঁটার মত ফুটতো, সেখানে একমাত্র অন্তরের তাগিদেই এই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

দিনে বারো ঘণ্টা যদি খাটতে হয় লোহাও ক্ষয়ে যায়···মানুষের জীবন তো অতি ক্ষণভঙ্গুর!

আর যদি পনের ফিট লম্বা আর দশ ফিট চওড়া একটা ঘরে বাক্স-বন্দী হয়ে বাস করতে হয়, যদি ধোঁয়া আর রান্না আর ময়লা আর পাইখানার গন্ধে এক ঘরে, এক কলে, এক সিঁড়িতে, এক উঠোনে, একই ছেঁড়া বালিশ আর ময়লা চটে দু'বেলা জীবনকে বহন করতে হয়, আপনা থেকেই তা' এনে দেয়, মৈত্রী-স্পৃহা···সঙ্গ-তৃষ্ণা···

তাই এই নরকের বাইরে, যে-কয়েক ঘণ্টা তারা ছুটি পেতো, সেইটুকুতেই ছিল তাদের মন-লেন-দেনের আসল আনন্দ।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে মুন্নুর রীতিমত কষ্ট হতো। কারখানায় হেঁটে যেতেই হয় এবং বাড়ী থেকে কারখানায় যেতে কম পক্ষে এক ঘণ্টা

সময় লাগে। তার মধ্যেই প্রাতঃকৃত্য, স্নান ইত্যাদি সেরে নিতে হয়। তা'হলে বিছানা থেকে উঠতে হয় ভোর সাড়ে চারটে কিম্বা বড় জোর পাঁচটার সময়।

সন্ধ্যাবেলা আবার যখন ছ'টার বাঁশী বেজে উঠতো, তখন আবার সেই বাড়ী ফিরে আসা। মেয়েরা সারাদিন কারখানায় খেটে আসার পর, বাড়ীতে রান্না করতে বসতো। রান্না সারতে ন'টা বেজে যেতো। সুতরাং আট-ঘণ্টা যদি ঘুমুতে হয়, তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। অবশ্য শুয়ে পড়লেই এদের ঘুম এসে যায়। এদের একমাত্র সৌভাগ্য; ঘুম আনবার জন্যে কোন নিদ্রাকর্ষক ওষুধ খেতে হয় না। দিনে বারো ঘণ্টা খাটুনীই ঘুমের সব চেয়ে বড় ওষুধ।

কিন্তু মুন্নুর মত ছেলে ন'টার সময় বিছানায় কিছুতেই শুতে যায় না। যেদিন থেকে রতন তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তাকে নিত্য টানে, বাইরের খোলা মাঠে, তাড়ির দোকানে, শহরের রঙমশালে। তাই অধিকাংশ দিনই শয্যা নিতে মধ্যরাত্রি হয়ে যেতো।

কিন্তু রাত্রির এই ক'টা ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেইটুকুই শুধু বেঁচে থাকা! পাঁচজন লোকের সঙ্গে মিশে, পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে, সেইটুকু সময় সে যেন বেঁচে থাকবার একটা মানে খুঁজে পেতো। সেই সময়টাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারতো, শৈশবের অর্থহীন অসহায়তা থেকে ক্রমশঃ সে বড় হয়ে উঠেছে। এবং একদিন হয়ত সে সম্পূর্ণ বড় হয়ে উঠবে। তাই এই ক'ঘণ্টা বাইরের জীবনের মধ্যে সে যা কিছু বলতো, শুনতো, করতো, তাই তার কাছে মহামূল্যবান বোধ হতো।

তাই ছুটির দিন সে আনন্দে ফেটে পড়তো। দলে দলে কুলিরা তখন শহরে বেড়াতে বেরুতো, তাদের সঙ্গে সে-ও ভিড়ে যেতো। শহরের মধ্যে তাকে সব চেয়ে বেশী টানতো, বড় বড় দোকানে সাজানো জীবনের নানা বিচিত্র সব উপকরণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতো, কল্পনায় তাদের স্পর্শ-সুখ

অনুভব করতো…সেই সঙ্গে মনে জেগে উঠতো তীব্র আশা, অদূর ভবিষ্যতে একদা সেই সব উপকরণ দিয়ে সত্যি সত্যি সে সাজিয়ে তুলবে তার জীবনকে।

সাধারণত শনিবার বিকেলে মুন্নু আর রতন একসঙ্গেই বেরুতো।

তাদের বাড়ীর কাছে দিয়ে যে-রাস্তা মাঠের ভেতর দিয়ে বোম্বে শহরে গিয়ে পৌঁছেছে, কুলিদের পায়ে পায়ে তার মরা ধূলো তখনকার মত যেন বেঁচে উঠতো। কোথাও কাঁচা চামড়া তৈরী হচ্ছে, তার পচা গন্ধ, পথের ধারে কোথাও দু'দিনের মরা কুকুর পড়ে আছে…আঁস্তাকুড়ের ওপর কোথাও বেড়ালে ঝগড়া করছে…মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগলের পরিত্যক্ত দেহ-মল মাঠের ফাটলে, রাস্তার গর্তে পড়ে পড়ে শুকোচ্ছে…ক্রমশঃ সে-দৃশ্য সে-গন্ধ পেছনে পড়ে যায়। তার পরিবর্তে দেখা যায় পাম্-ঘেরা ছায়া-বীথি…স্নিগ্ধ শ্যামল লতায়-পাতায় ঢাকা মনোরম অঙ্গণ…গোলাপে আর চামেলীতে-ছাওয়া লতা-বিতান। ক্রমশঃ চোখের সামনে মাথা তুলে ওঠে মেঘচুম্বী প্রাসাদ, 'গোল্ড-মোহরের' সোণালী-ফুলে ছাওয়া ভ্রমর-উদ্যান। শীর্ণ-দেহ, গলিত লোম-চর্ম শুষ্ক মুখ কুলিরা ক্রমশঃ মিশে যায় সিল্ক-আর সুন্দর-শুভ্রতায় মোড়া পদচারী সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের দলে। পথ ভরে ওঠে মোটরে, বাসে, ভিক্‌টোরিয়া গাড়ীতে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারাতে কুলির দল শহরের বাজারে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

তাড়ির দোকানে বসে রতন দুষ্টু হাসি হেসে মুন্নুর কাছে প্রস্তাব করে, আজ তোকে একটা তামাসা দেখাবো…

এক বোতল মুরী বিয়ার ঢক্ ঢক্ ক'রে শেষ ক'রে মুন্নুকে পাশে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। আবদুল রহমান ষ্ট্রীটের বিজলী-বাতির তলা দিয়ে, ভেণ্ডী বাজারের গ্যাসের পোষ্ট পেরিয়ে একটা ছোট্ট স্বল্প আলোকিত গলির ভেতর দিয়ে তারা গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটের ওপর এসে পড়ে।

মুন্নু এক গেলাস বিয়ার খেয়েছিল। গোলাপী নেশার উৎসাহে সে রতনকে অনুসরণ ক'রে চলে…পুরানো, সরু স্যাঁৎসেঁতে গলি…অন্ধকারে

তার দু'পাশের ময়লা জঞ্জাল ঢাকা পড়ে গিয়েছে ছোট ছোট খুপরীতে ফুলওয়ালারা বসে···তাদের ফুলের গন্ধে রাস্তার দুর্গন্ধ যেন লুকিয়ে পড়েছে··· ক্রমশ আশে-পাশের ভাঙ্গা-চোরা বিসদৃশ দৃশ্যের বদলে চোখে পড়ে, জানালার ধারে, বারান্দায় টুলের ওপর বসে নকল-গয়নায় সারা-গা-মোড়া বিচিত্র-মূর্তি সব নারী, রাস্তায় পান চিবোতে চিবোতে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে মুচকে হেসে চোখের ইঙ্গিতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে···

রতন মুন্নুকে দেখিয়ে বলে, কেমন, সুন্দর না? সত্যি বল্‌, ভাল লাগছে তো? কোন মেয়েটাকে তোর পছন্দ হয়?

মুন্নু বিব্রত হয়ে পড়ে। অকারণে হেসে ওঠে। রতনের কথার ইঙ্গিতে তার দেহের মধ্যে যেন রক্তে দোলা লাগে। উত্তপ্ত পরিতৃপ্তিতে সে বন্ধুর দিকে চায়। চোখে তার জ্বলে ওঠে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র আলো। রেশমী-উত্তরীর মত তার অঙ্গকে ঘিরে দোলে উন্মাদ কামনার আতুর স্বপ্ন···

মুন্নুর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রতন বলে ওঠে, আয় আমি জানি কোথায় যেতে হবে···পিয়ারী জান···পিয়ারী জানের ঘরে যাব, চল্‌!

মুন্নু নীরবে অনুসরণ করে।

সাদা, কালো, তামাটে, বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র সব মানুষের দল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে। আনন্দ-মুখর···চঞ্চল···জীবন্ত কামনায় চলমান তরঙ্গের পর তরঙ্গ···যেন কোন্‌ অনাহত নীরব সঙ্গীতের সঙ্গে দুলে উঠেছে সমস্ত সরণী! আপনার আদিম সঙ্গীত···অন্তরের নিষ্করুণ নিঃসঙ্গতার হাত থেকে, নৃত্যে, সুরে, প্রেমে সুকোমল স্পর্শে যা এনে দেয় মুক্তি···মধুর মৃত্যু···সুমধুর পরিসমাপ্তি···হোক্‌ তা' ক্ষণিক, হোক তা' অসম্পূর্ণ···

এই আনন্দ-সরণীতে এই যে মানুষের ভিড়···এরা যে কত দুঃখী, কত ভাগ্যহত···ভেতরে বাইরে কত রিক্ত···তা' মুন্নুর ধারণায় ছিল না। এই ছদ্ম-সমারোহের ওপরের চাকচিক্য তার মনকে ভুলিয়ে দেয়···তার মনে প'ড়ে যায়, তার দেশে, বৎসর অন্তে যে-সব মেলা বসতো···দলে দলে মেয়ে-পুরুষ

জড় হতো, যার যা ভাল পোষাক লোক-দেখানোর জন্যে সেদিন তারা বার করতো। তার নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না তাই সে ভেবে নিয়েছিল তার আশে-পাশে যারা ভিড় ক'রে আসছে যাচ্ছে, তাদেরও বুঝি কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।

ইতিমধ্যে রতন একটা গলির ভেতর দিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি পেরিয়ে বৈঠকখানার মত একটা বড় ঘরে মুন্নুকে নিয়ে হাজির হয়। ঘরের ভেতর ঝাড়-লণ্ঠনের আলো···দরজায় কাগজের ফুলের মালা ঝোলান···দেয়ালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড আর তাঁর পৌত্রের একটা বড় রঙীণ ছবি···তার পাশে ভক্ত-রাজ হনুমানের একটা পট···সেই সঙ্গে সুবেশা এক তরুণী নারীর একখানি ফটো-চিত্র। চিত্রখানি ঘরের বর্তমান অধিকারিণী পিয়ারী জানের যৌবনের প্রতিকৃতি···তখন বোম্বের বড় বড় সওদাগর আর রইস তার নৃত্য উপভোগ করবার জন্যে সমবেত হতো···তখন গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটে পিয়ারী জানের নিজস্ব আলাদা আড্ডাখানা ছিল। এখন ভগ্ন-দেহ···বয়োবৃদ্ধা···নিঃশেষিত-রস শুষ্ক ছোবড়া ···পথচারীর অনুকম্পার জন্যে রোজ সন্ধ্যায় নকল-গয়না আর সস্তা রঙীন পোষাকে জানালার কাছে সেজে গুজে বসে থাকতে হয়।

—আরে, এসো, এসো পালোয়ানজী! বলি এতদিন কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে? মাইরি বলছি, তোমার জন্যে পথ চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো ক্ষয়ে গেল একেবারে···

এক গাল হেসে পিয়ারী জান সাদর আমন্ত্রণ জানায়।

—আরে ভাই, বড় কাজ পড়েছিল···তার ওপর ফোরম্যান ব্যাটা গেলো-মাসের মাইনে থেকে বিস্তর কেটে নিয়েছিল!

মুচকে হেসে পিয়ারী বলে, এ-মাসের মাইনে কাটেনি নিশ্চয়!

পিয়ারীর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে রতনের দেরী হয়না। তাই তার যোগ্য উত্তর সে দেয়, আরে, না, না···তোমার যা পাওনা, তার জন্যে ভেবো না! সে ঠিক আছে!

কথাটা পালটে নিয়ে মুন্নুকে দেখিয়ে বলে, এই দেখ, তোমার জন্যে খাপসুরুৎ

একটা তাজা ছোঁড়া নিয়ে এসেছি !

মুন্নুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার ওপর হাত রেখে পিয়ারী বলে ওঠে, বাঃ, সত্যি তো, যেন পটের দেবতা···দিব্যি চেহারা·· তোমার ছেলে বুঝি ?

রতন বলে ওঠে, দূর মাগী ? আমার ছেলে কেন ? তোর পীরিতের লোক···আমার দুষমন্ !

সেই ঝলমল গয়না আর রঙচঙে পোষাক···সেই সঙ্গে আতরের মিষ্টি গন্ধে মুন্নু যেন মুহ্যমান্ হ'য়ে পড়ে। এখনো যার দেখা পায় নি তার স্বাদ নেবার জন্যে তার দেহ-মন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। বহু কষ্টে উত্তেজনাকে দমন ক'রে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন পালোয়ানজী, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা !

ফরসা-চাদরের ওপর আরাম ক'রে বসে রতন উত্তর দেয়, তা'হলে তোমার আড্ডায় ভাঁড়ের চাকরীটা তো পাবো ?

—সে কি কথা ! তুমি হলে আমার মালিক ! আমি তোমাকে চাকরী দেবো ? আমি যে তোমার দাসী গো !

বাজে রসিকতা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আনবার জন্যে পিয়ারী জান স্বর পাল্‌টে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে হুজুরের যদি ফরমাস হয়, সরবৎ নিয়ে আসি··· সরবৎ খেয়ে দু'খানা গান শোন···কেমন ?

জামার ভেতর থেকে এক বোতল মদ বার ক'রে পিয়ারীর সামনে ধরে উল্লাসে রতন বলে ওঠে, হাঁ হাঁ···সরবৎ চাই বইকি ! তবে এই সরবৎ না হলে কি বিবিজানের ভাল লাগবে ?

আপ্যায়িত হয়ে পিয়ারী বলে ওঠে, এমনি না হ'লে পালোয়ানজী ! মাইরি ভাই, তোমার দিল্ যেন হাতেম তাই-এর দিল। দরাজ ! দাঁড়াও, গ্লাস নিয়ে আসি !

সামনে চমৎকার কাঠের কাজ করা একটা খাটের ধারে কুলুঙ্গী থেকে গোটা চারেক ছোট গ্লাস নিয়ে আসে। দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁকে, জানকী···

গুলাব জান···বুদী খাঁ···

রতন বুঝতে পারে, তা'হলে একটু নাচ হবে দেখছি ? - মাইরি জা'ন্, আমার জন্যে তুমি বড় মেহনৎ করেছো···একটু আমার পাশে এসে বসো তো আগে ?

অঙ্গ দুলিয়ে নাচতে নাচতে মুচকি হেসে পিয়ারী রতনের কোলের ওপর বসে পড়ে।

চোখের সামনে কামনার এই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ সচকিত হয়ে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষকে এইভাবে এত কাছাকাছি সে আর কখনো দেখে নি। দেশেতে তার খুড়ো আর খুড়ী এক বিছানাতে শুতো না। প্রভুদয়ালের বাড়ীতেও, পাশা-পাশি দুটো আলাদা খাটে তাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে সে শুতে দেখেছে—কখনও পরস্পর পরস্পরকে ছুঁতে পর্যন্ত দেখে নি। হরি আর লক্ষ্মী সম্বন্ধেও তাই, তারা যেন দু'জনে দু'শহরে থাকতো। তাই চোখের সামনে সেই অন্তরঙ্গ দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখার পরেই তার মনে হলো, তার শরীরের ভেতর যেন কেমন ক'রছে। মদের চেয়ে মাদক, কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধরসে যেন তার সব ভাবনাগুলো গলে গলে যাচ্ছে।

এমন সময় দু'টী সুন্দরী তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়ালো। পরণে গোলাপী রঙের সিল্কের ঢিলে পায়জামা আর গায়ে আঁট পিরাণ। সামনের দিকে স্পষ্টভাবে একবার দেখে নিয়ে তারা বুদী খাঁর জন্যে পিছন দিকে ফিরে চায়। সঙ্গে সঙ্গে দন্তহীন, ক্ষীণ দৃষ্টি, ভাঙ্গা-গাল কৃষ্ণকায় একজন বৃদ্ধ সেলাম করতে করতে প্রবেশ করে। দেখলেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলের দালাল ! বুদী খাঁ।

—সেলাম, সেলাম পালোয়ানজী ! ওঃ ! বহুৎ বহুৎ দিন বাদে পায়ের ধূলো পড়লো আপনার ! ভাল ক'রে আজ খুশী ক'রতে হবে···কি বলিস্ রে ছুঁড়িরা ?

বুদী খাঁ দেরী না ক'রে সোজা এগিয়ে গিয়ে হারমোনিয়াম খুলে বাজাতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

পিয়ারী কোলের কাছে তবলা টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে।

গানের প্রথম কলি গাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে দু'টীর পায়ের ঘুঙুর বেজে ওঠে…রঙিন ওড়না উড়িয়ে তারা নাচতে আরম্ভ করে। সঙ্গীতে, নুপুরে, নৃত্যে দেখ্‌তে দেখতে সমস্ত ঘরটা ভরে ওঠে।

রতন উচ্ছ্বসিত হয়ে ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার ক'রে বুদী খাঁকে দেয়, বাহবা, বাহবা, ওস্তাদজী! দিল্ ঠাণ্ডা ক'রে দিলে!

তারপর নেশায় অবশ দেহে পিয়ারীর ঘাড়ে ঢলে পড়ে…

—পিয়ারী! মেরী জান্…

আদর পেলে বিড়াল যেমন সমস্ত দেহটা বিচিত্র ভঙ্গীতে কুঁকড়ে কোল ঘেঁষে বসে, পিয়ারী ঠিক তেমনি ক'রে রতনের কোলে গিয়ে উঠে বসলো… গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠলো, আমার বরাৎ ভাল, তোমাকে খুশী করতে পেরেছি! তবে আমাকেও খুশী ক'রতে হবে!

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে রতন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তবে কি বৃথাই লোকে আমাকে হিন্দুস্থানের রুস্তম বলে?

মেয়ে দুটী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

মুন্নুর মনে হচ্ছিল যেন তার দেহের ভেতর থেকে হৃদয় বলে পদার্থটা বাইরে এসে গলে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে…তরঙ্গের মত ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে সেই দুটী তরুণীর দেহ-তট স্পর্শ করবার জন্যে…কিন্তু কিসে যেন ব্যাহত হয়ে বার-বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

চোখের ইসারায় বুদী খাঁকে বাজনা বাজাতে ইঙ্গিত ক'রে, পিয়ারী বিলোল-কটাক্ষে হাতের চুড়ির আওয়াজের তালে আর একটী গান ধরে।

নেশার আবেশে রতন আদেশ করে, আর একবার নাচ হোক…আমার খাতিরে…

পিয়ারীর ইঙ্গিতে মেয়ে দু'টী আবার নাচতে সুরু ক'রে দেয়…পিয়ারী গান গায়…

ঠিক সোমের মাথায় রতন বাহবা দিয়ে ওঠে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আর একটা টাকা ট্যাঁক থেকে বার ক'রে সামনের থালার ওপর ছুড়ে দেয়।

পিয়ারীর সঙ্গে মেয়ে দু'টীর চোখে চোখে কি কথা হয়ে যায়, তারা উঠে ঘর ছেড়ে চলে যায়। তাই দেখে মুন্নু চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে স্পষ্ট অনুভব করে, তার সারা গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

রতনের দিকে চেয়ে মুচকী হেসে মুন্নুকে লক্ষ্য ক'রে পিয়ারী বলে ওঠে, আহা, বাছার বড় কষ্ট হচ্ছে!

সে-ইঙ্গিত বুঝতে রতনের দেরী হয় না।

—মুন্নু ভাই···তুই এবার বাড়ী যা···অনেক রাত হয়ে গিয়েছে···আমি একটু পরেই যাচ্ছি···যা—

এতদিন জীবনে যা জানা হয় নি, আজ তাই জানবার জন্যে সে আকুল আগ্রহে এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রেছিল। সহসা তা' থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুন্ন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এতক্ষণ ধরে সে যেন একটা কিছুর অপেক্ষায় বসে ছিল···কিন্তু কি তা, সে নিজেই জানতো না। এখন বাধ্য হয়েই তাকে উঠে দাঁড়াতে হলো। পিয়ারী উঠে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে যেন আশীর্বাদ করলো। আচ্ছন্নের মত সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে প'ড়লো···তখন মধ্যরাত্রি হয়ে গিয়েছে। বোম্বের নিদ্রাহীন রাজপথের আশে পাশে, ফুটপাতের ওপর, নিত্যকালের গৃহহীন কুলির দল শয্যাহীন হিম-প্রস্তরে তখন ঘুমুবার ব্যর্থ চেষ্টায় গড়াগড়ি দিচ্ছে···গল্প ক'রছে,—গ্যাসের মৃত্যু-পাণ্ডুর ম্লান আলোয় তন্দ্রা আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দুলছে।

শহর ছাড়িয়ে মুন্নু গাঁয়ের রাস্তায় এসে প'ড়ে। আকাশে চাঁদ নেই, তবুও পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তাগুলো রূপোর পাতের মত জলছে মাঝে মাঝে কোথাও অন্ধকারে জোনাকীর ক্ষীণ আলো অন্ধকারকেই আরো স্পষ্ট ক'রে তুলছে···কাছে কোথাও ঝোপের ভেতর থেকে নিশাচর পেচকের দল কঠিন

কর্কশ কণ্ঠে গেয়ে উঠছে নিশীথের নিষ্করুণ সঙ্গীত···

বুকের ভেতর যেন কি একটা ভারী জিনিস ভেতর থেকে তাকে অবশ ক'রে তুলছে···দুশ্চিন্তার প্রেতমূর্তির মত অর্ধ-জাগরিত বাসনার অতৃপ্তি শিরা-উপশিরা দিয়ে মগজে এসে সব যেন গুলিয়ে ধোঁয়ার মত ক'রে দিচ্ছে··· মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, বুঝি তার ঘাড়ের ওপর মাথাটাই নেই।

কোন রকমে ভারাক্রান্ত দেহকে টেনে নিয়ে সে এগিয়ে চলে। চলতে চলতে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, কি চাই তোর? কি চেয়ে ছিল সে, যা পায় নি ব'লে আজ তার মন এমনি ক'রে মরে যাচ্ছে? কিন্তু সে-প্রশ্নের কোন্ সঠিক উত্তরই সে দিতে পারে না। ক্রমশ তার নিজের পায়ের শব্দে সে নিজে ভীত সচকিত হয়ে ওঠে···নির্জন প্রান্তরের সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন প্রেত-স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে···সে ছুটতে আরম্ভ করে···যতক্ষণ না বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার ভেতরে ঢুকে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে··· রাত্রির পিশাচিণীরা আর তাকে ধরতে পারবে না! কিন্তু তখনও তার হাড়ের ভেতর যেন কাঁপতে থাকে অন্ধকারের বিভীষিকা···সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তার দম ফুরিয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী ছাড়া আর সকলেই তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। সেই বায়ুহীন বন্ধ ঘরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাটীর প্রদীপের আলোয় লক্ষ্মী তখনও পর্যন্ত জেগে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিল। আসলে সে মুন্নুর অপেক্ষাতেই জেগে বসেছিল।

ম্লান ব্যথিত দৃষ্টিতে মুন্নুর দিকে চেয়ে সে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

মুন্নু কোন কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে। পিয়ারী জান যখন তার মাথায় হাত দিয়েছিল, তখন তার উদ্গত অশ্রু-ধারা চোখের পাতার আড়ালে এসে থেমে গিয়েছিল···সেখানেই এতক্ষণ তা জমা হয়েছিল···লক্ষ্মীর স্নেহ-দৃষ্টির আকর্ষণে যেন তা ফেটে বেরিয়ে এলো। তাই লক্ষ্মীর দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, তার শোবার জায়গার দিকে চেয়ে দেখে। কতক্ষণ সে

এমনি চোখ ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তা' সে নিজেই অনুমান করতে পারে না, যখন আবার লক্ষ্মীর দিকে চাইলো, দেখে লক্ষ্মীর সমস্ত দেহ তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে…সে স্পষ্ট অনুভব করে, সে-আনত-দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে…চোখে তার বিদ্যুৎ-বহ্নি!

স্পর্শ-ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে অন্তর, তবু অভ্যাসবশত সে মাথাটা সরিয়ে নেয়, যেন লক্ষ্মীর স্পর্শ সে এড়িয়ে থাকতে চায়। তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে লক্ষ্মী কোমল, অতি কোমল স্পর্শে হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে… জননী যেমন অতি সহজেই বোঝে সন্তান কি চায়, নারীর সেই সহজাত বেদনাতুর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্মী নিমেষে বুঝতে পারে, তার সামনে সেই মৌনমূর্তি কিশোরের দেহমনের কি আর্তি…তপ্ত-ওষ্ঠ তার কপালে রেখে—মৃদু, অতি মৃদু কণ্ঠে, যেন কোন গুপ্তমন্ত্রের মতো কানে কানে বলে, ওগো, দুঃখ কি! তুমিও দুঃখী, আমিও দুঃখী…দুঃখই আমাদের সব!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মুন্নু তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। নীরবে লক্ষ্মী তার পাশে গিয়ে শোয়, দু'হাতে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে…সেই তপ্ত সান্নিধ্যের নীরব অভিষেকে সে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে…অসহ্য যন্ত্রণায় জেগে ওঠে ইন্দ্রিয়ের সব দ্বার ভেঙ্গে জাগ্রত-যৌবনের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনা…অসহ্য পীড়নে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে তার সারা দেহ…অবশেষে ঊষার মধুর লগ্নে নিশাবশানের সেই মায়া-মুহূর্তে, সেই অসহ্য জ্বালা আপনি খুঁজে নেয় তার মুক্তি, মধুর মরণ…নারীর তপ্ত দেহে পুরুষের ক্ষণিক দেহাবসান!

তাই সোমবারের সকাল বেলাটাকে সহজভাবে গ্রহণ ক'রতে তারা পারে না। একটি দিনের ছুটি, তারি মধ্যে তারা পুরোপুরিভাবে আস্বাদ ক'রে নিতে চায় অন্য সব দিনের সঞ্চিত মানবীয় ক্ষুধা...এই একটি দিন তারা বুঝতে চায় তাদেরও দেহের ভেতরে আছে মানুষের প্রাণ। তাই সেদিনটীর আত্মবিলাসের পর, সহসা যখন বেজে ওঠে আবার সোমবারের বাঁশী, মনে হয়, যেন সে আহ্বান জীবন-শেষেরই আহ্বান।

তবু উঠতে হবে, যেতে হবে কারখানায়। ঘর থেকে তাই কারখানার দিকে পা বাড়াতেই তাদের মনে হয় যেন কোন্ অদৃশ্য প্রেতমূর্তি আবার তাদের মরণ-আলিঙ্গনে আত্মস্থ ক'রে নিলো...তারা এগিয়ে চলে, যেন পক্ষাঘাতে সম্মোহিত হ'য়ে গিয়েছে সারা দেহ...উদাসীন...প্রাণহীন... চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে অব্যক্ত বেদনার বিভিষিকা...মুখ নয়, যেন মুখোস্।

মুন্নুর কাঁচা দেহ থেকে তখনও কারখানা সব রস শুষে নিতে পারে নি—একটা রবিবারের উৎসবের পর যথেষ্ট উদ্বৃত্ত তেজ তখনও দেহ-ভাণ্ডে সঞ্চিত থাকে। তাই সোমবার কারখানা-যাত্রী কুলিদের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সে বিস্ময়ে ভাবে, কেন তারা এত বিষণ্ণ?

কাঁপতে কাঁপতে, দুর্বল দেহে, রেখান্বিত কুৎসিৎ মুখে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ময়লা মেখে, নির্বিকার-চিত্তে, শির দাঁড়া-ভাঙ্গা পুতুলের মত সন্ত্রস্তপদে তারা কোন রকমে এগিয়ে চলে...চোখ চেয়ে থাকে বটে, কিন্তু সে-চাওয়াতে যেন কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে বোকার মত ধূম্র-লাঞ্ছিত আকাশের দিকে চেয়ে "রাম রাম" অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে...সর্বশক্তিমান তাদের বাঁচিয়ে রেখে যে করুণা দেখিয়েছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানায়। মুন্নুর মনে পড়ে, দৌলতপুরে প্রভুদয়াল প্রায়ই বলতো, সবই ভগবানের দান...গণপতের দুর্ব্যবহার, পুলিসের সেই অকারণ নিষ্ঠুর প্রহার, এমন কি প্রহারের ফলে মরণ-সমান সেই জ্বর, সবই ভগবানের

দান, কৃতকর্মের ফল! হয়ত তার চোখের সামনে নতমুখ ম্লান এই কুলির দল, তারাও তাই ভাবে। অন্তত হরিকে প্রায়ই সেই ধরনের কর্মফলের কথা বলতে সে শুনতো; হরির বিশ্বাস জীবনে সে অনেক ভাল কাজ করেছে, তার ফলে একদিন না একদিন তার ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবে। একমাত্র রতন এই ধরণের কথা শুনলে হেসে উঠতো, কোন কিছুতেই ভেঙ্গে না প'ড়ে একমাত্র তাকেই সে দেখেছে, হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে চলতে।

চিমটা সাহেব রোজ সকালে কুলিদের কারখানায় ঢোকবার সময় সেডের মুখে দাঁড়িয়ে সেলাম আদায় করতো। তাদের অভিবাদনের উত্তরে কখনো হয়ত একটু হাত তুলতো, নতুবা অধিকাংশ সময়ই গালাগাল দিয়েই প্রত্যুত্তর দিত। কাজে ঢোকবার মুখে সাহেবের সেই ষাঁড়ের মতন বিপুল দেহ দেখে, কুলিদের মনে আপনা থেকে ইষ্ট-দেবের কথা জেগে উঠতো, কাজ করবার একটা তাগিদ তারা খুঁজে পেতো। মাঝে মাঝে চিমটা সাহেব সেলামের বদলে বুটশুদ্ধ পায়ের লাথি দিয়ে প্রত্যাভিবাদন জানাতো। যেদিন সকাল থেকেই প্রভু রঙে থাকতেন, কিম্বা বাড়ীতে মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসতেন, অথবা সকাল বেলাকার খবরের কাগজ খুলে যেদিন দেখতেন, জাতীয় দলের লোকেরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে, কিম্বা কোথাও কোন বিপ্লবী কাউকে খুন করতে চেষ্টা করেছে, অথবা সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার জন্যে প্রচার করেছে, সেই দিনই তিনি হাতের চেয়ে পায়ের ব্যবহারটাই বেশী করতেন। তাঁর ধারণা, যেহেতু শাসক-সম্প্রদায়ের লোকের গায়ের রঙের সঙ্গে তাঁর গায়ের রঙের মিল আছে, সেই হেতু এই সব জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা যেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই অপমান করবার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। একদা ল্যাঙ্কাশায়ারের কোন কারখানায় কালি-ঝুলি মেখে তিনিও যে এমনি কুলিদের লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতেন, সে-কথা আজ তিনি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু একমাত্র রতন, সে কোনদিন মাথা নীচু ক'রে চিমটা সাহেবকে অভিবাদন জানায় নি। তার নিজের শক্তির ওপর তার প্রভূত ভরসা ছিল,

তার ভরসার আর একটি প্রধান কারণ ছিল, শ্রমিকদের য়ুনিয়ন। সে জানতে কারখানার কাজে তার এতটুকু গাফেলতী হয় না। সুতরাং মাসের শেষে তার পুরো মাইনে, সে পাবে না কেন? যখনই সময় মত মাইনে পেতো না, বা দেখতো চিমটা সাহেব তার মাইনে কাটবার ফন্দী করছে, সে রীতিমত আন্দোলন সুরু ক'রে দিত।

তা' বলে বাইরে থেকে দেখলে কারুরই বোঝবার কোন সাধ্য ছিল না যে, তার আর চিমটা সাহেবের মধ্যে কোন মনোমালিন্য আছে।

চিমটা সাহেবের পাশ দিয়ে সেদিন ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে রতন চোখ টিপে হেসে বলে ওঠে, সালাম সাহেব!

সাহেব চাপা গলায় ডাকে, এদিকে এসো!

যেন সাহেবের একান্ত বাধ্য, এমনি একটা ভঙ্গী ক'রে ছুটে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, হুজুর!

—চাকরী থেকে তুমি বরখাস্ত হ'য়ে গিয়েছো—। চিমটা সাহেব স্থিরভাবে জানায়।

রতন অবাক হ'য়ে যায়।

—আমার অপরাধ?

—যা—ও—ও··· !

রতন প্রথম শান্তভাবেই সাহেবের মুখের দিকে চেকে থাকে···ক্রমশ-তার মুখের চেহারা বদলাতে থাকে···চোখের কোণে আলো ঝিলিক মেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘুমন্ত দৈত্যটাকে যেন জাগিয়ে তোলে; বিদ্যুৎ আহতের মত এক নিমিষে সে বুঝতে পারে, সাহেবের সেই ক'টী কথার পরিণাম তার জীবনে কি হতে পারে···বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করবার জন্যে হাত উঠে যায়। কিন্তু চিমটা সাহেব তখন পেছন ফিরে দ্রুত নাদির খাঁনের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে, তাই পেছন দিক থেকে শত্রুকে আঘাত করতে তার পালোয়ানের নীতিতে বাধলো। ধিক্কারে সেই উত্তোলিত মুষ্টির বোঝা শূন্যে আস্ফালন ক'রেই হাল্কা ক'রে ফেলে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

আঘাতের জন্যে সংহত হয়ে উঠেছিল, সেগুলো আপনা থেকে আবার আলগা হয়ে যায়। বুক থেকে রক্ত ঝলক দিয়ে উঠে চোখে ছড়িয়ে পড়েছিল···চোখের পাতা ফেলতে, দেখলো সে-রক্ত গরম লোনা জল হয়ে ঝরে পড়ছে।

মুন্নু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, লোকে বলে শুনেছি, ঘোড়ার পেছন দিয়ে আর অফিসারের সামনে দিয়ে নাকি যেতে নেই! তুমি পারবে না জানি, আমি তোমার হয়ে চিমটা সাহেবের কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরছি—

স্থিরভাবে রতন বলে, না···আমার জন্যে কারুর হাতে-পায়ে ধরতে হবে না···সে কত বড় সাহেব আমি দেখে নেবো···তুই দাঁড়া···

এই বলে সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। আধ মাইল দূরে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশনের অফিস। তার বিশ্বাস, ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট লালা ওংকারনাথের কাছে যদি তার ব্যাপার সে জানাতে পারে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি এর একটা বিহিত করবেন।

কমিটির অফিসের একজন কেরাণী বারান্দায় বসেছিল। তাকে দেখে রতন বলে, প্রেসিডেণ্টের কাছে আমার একটা নালিশ আছে।

আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নিয়ে নিস্পৃহভাবে কেরাণীবাবু জানালেন, তিনি এখন কাজে ব্যস্ত আছেন।

রতন কোন কথা না ব'লে তার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিল।

কেরাণী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে, সামনের দরজার পর্দাটা তুলে একবার উঁকি মেরে দেখেই ফিরে এলো, সাহেব বল্লেন, তিনি এখন বড় ব্যস্ত···তোমার যদি খুব জরুরী দরকার থাকে, তাহলে একটা কাগজে লিখে দাও···নিজে যদি না লিখতে পার, একটা টাকা দাও আমি লিখে দিচ্ছি!

রাগে রতনের সর্ব-শরীর জলে উঠলো! ইচ্ছা হলো, এই মুহূর্তে লোকটার ঘার ধরে মটকে দেয়। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে ট্যাক থেকে একটা টাকা বার ক'রে তার হাতে দিল। কেরাণী হাসিমুখে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলো, রতন বলে যেতে লাগলো।

দেখতে দেখতে কুলি-মহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো, পালোয়ানজীকে বরখাস্ত

করা হয়েছে। তাকে খুঁজে বার ক'রে, কুলিরা দলে দলে এসে সহানুভূতি জানিয়ে যায়। দিনের পর দিন এই অত্যাচার তারা সহ্য ক'রে এসেছে। উল্টে রতনও তাদের সহানুভূতি জানায়।

কিন্তু তারা শুধু পারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে। দুঃখ-দৈন্যে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন কিছুতেই আর তাদের নেই উৎসাহ তাই তারা মুখ বুঁজে শান্তভাবেই সব সহ্য করে! রক্তহীন পাণ্ডুর চোখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে, বড় জোর তাদের মধ্যে কেউ একান্ত নম্রভাবে তাদের সান্ত্বনার যা বাঁধা বুলি আছে, তাই বলে, ভেবে আর কি হবে ভাই! এ সবই ভগবানের খেলা! কেউ কেউ বলে, কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ দুনিয়ার ধারাই এই·· বদমায়েস যে হবে, সেই পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকবে আর ভাল লোক মার খাবে!

দুঃখ সইতে সইতে তাদের দেহ-মন থেকে প্রাণ-শক্তি এমনভাবে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, সন্দেহ হয়, বুঝি তাদের দেহে প্রাণ আর নেই··· শুধু তাদের ম্লান বিবর্ণ মুখের মধ্যে দেখা যায় বেদনার স্মৃতির একটা ক্ষীণাভাস ···রোগ পঙ্গু-শয্যাশায়ীর দৈহিক অসহায়তার মতন, শিশুর মুখের কোমলতার মতন, মূক প্রাণীর চোখের দৃষ্টির পর-নির্ভরতার মতন।

সাড়ে আট-টা নাগাদ দু'জন দেশী সাহেব, সউদা আর মুজাফর, আর একজন বিলাতী সাহেব, ষ্টানলী জ্যাকসন, এসে উপস্থিত হলো। প্রায়ই মিলের ময়দানে তাদের বক্তৃতা দিতে কুলিরা দেখেছে।

সউদা জিজ্ঞাসা করে শুনলুম তোমাকে নাকি বরখাস্ত করেছে, রতন?

যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে রতন সংক্ষেপে উত্তর দেয়, হ্যাঁ!

ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বিলাতী সাহেব জিজ্ঞাসা করে, ফোরম্যান টোম্‌কো কুছ্ বাৎলায়া···কাহে নোক্‌ড়ী গিয়া?

—না সাহেব! আমার চাকরীটা খাবার জন্য অনেক দিন থেকেই তাক্ ক'রেছিল। চাকরী গিয়েছে তাতে আমার তত মনে লাগে নি সাহেব, যত মনে লেগেছে আমাদের য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট লালা ওংকারনাথের ব্যবহার···

তিনি আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না ?

মুজাফর বলে, তুমি আমাদের কাছে এলে না কেন? আমাদের সঙ্গে মেশো বলেই লালাজী তোমার সঙ্গে দেখা করে নি···ভয় নেই···আমরা তোমার পেছনে আছি।

রতন সরল ভাবেই জানায়, অন্য কোন মিলে হয়ত একটা চাকরী জুটে যেতে পারে, এই ভরসাতেই ছিলাম। তাই আপনাদের কাছে আসি নি। আপনাদের কাছে গেলেই ব্যাপারটা সব কারখানায় জানাজানি হয়ে যেতো, তখন কোন মিলেই আর আমাকে কাজ দিত না!

হঠাৎ তাদের ঘরে লাল-ঝাণ্ডা য়ুনিয়নের সাহেবদের আসতে দেখে মুন্নু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। চুপটী ক'রে তাদের কথাবার্তা শুনছিল! রতনের উত্তর শুনে সে বলে উঠলো, তুমি চিমটা সাহেবের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলেই পারতে।

হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে সউদা বলে ওঠে, না, না···সে কথনই নয়··· এত অপমান ভোগ করেও তোমাদের শিক্ষা হলো না? এত যে লাঞ্ছনা, এত যে নির্যাতন, তাতেও কি তোমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখালো না? তোমাদের দেহ থেকে চামড়া ছিঁড়ে নেবে।

এতক্ষণ ধনুকের মত পিঠ বেঁকিয়ে হরি চুপটী ক'রে বসেছিল। সউদার কথায় ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, ঠিক বলেছ সাহেব!

সউদা আবার বলতে শুরু করে, এই যে-ঘরে তোমরা বাস করছো, ভাল ক'রে এটাকে দেখেছ কোন দিন? এটা কি ঘর? হাজারে হাজারে তোমরা এমনি গর্তে রাতের পর রাত দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছ—কিন্তু এইভাবে কতদিন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? বড জোর আর ছ'মাস···তারপর অথর্ব পঙ্গু হয়ে যে-যার দেশে ফিরে যাবে, মরবার জন্য! আর তোমাদের ছেলেমেয়েরা যারা এখানে পড়ে থাকবে, এক আনা পয়সা রোজগার করতে তারা সারাটী দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে···বয়স হবে তাদের, অথচ বাড়বে না···যতদিন যাবে, ততই যেন তারা শুকিয়ে ছোট হয়ে আসবে। আর কবে

চেতনা হবে তোমাদের? কবে আর জাগবে তোমরা?

সউদার কথার মধ্যে যে-আঘাতটুকু ছিল, পাছে তাতে এরা ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে, সেই জন্য মুজাফর কথাটা অন্যভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে, সাহেবের কথা শুনে তোমরা রাগ করো না, সাহেবকে ভুল বোঝনা! সাহেব তোমাদের ভালবাসে বলেই তোমাদের এ ভাবে বলতে পারে। তোমাদের মত সাহেবকেও একদিন দুঃখকষ্ট পেতে হয়েছে, সাহেবের ইচ্ছে, যে-ভাবে তিনি চেষ্টা ক'রে সেই সব দুঃখ দূর করতে পেরেছেন তোমরাও সেইভাবে দুঃখকষ্টের হাত থেকে উদ্ধার পাও।

জ্যাকসন বলে ওঠে, তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে উনি স্কুল ক'রে দেবেন!

সউদা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, স্কুল কেন, তার চেয়েও যা বেশী দরকার তা হচ্ছে, খাদ্য। তোমাদের দরকার, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়া! তোমাদের হাত থেকেই এই সব কলে তুলো থেকে সূতো বেরোয়, কাপড় তৈরী হয়। দেশে তোমাদেরই আপনার জন মাঠে ঘাটে তুলোর চাষ করে। তোমরাই বন সাফ ক'রে পথ বার করছো···খনি থেকে মণি তুলছো, জঙ্গলে সোনা ফলাচ্ছো। আর তোমাদের মালিক বড় সাহেব, তোমাদের কাছ থেকে তোমাদেরই উৎপন্ন সব জিনিস আদায় ক'রে নিয়ে বিলেতে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তার বদলে তোমাদের মজুরী যা দিচ্ছে, তা' দিয়ে তোমাদের খেতে পরতেই কুলোয় না···ঘর ভাড়া, দেনা-শোধ তো দূরের কথা! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের মেয়াদ মত বুকের রক্ত হিম ক'রে খেটে, কাজ ছেড়ে যখন দেশে ফিরে যাও, তখন শুধু মরার মত শক্তিটুকুই পড়ে থাকে। তোমাদের শূন্য জায়গায়, আবার নতুন লোক আসে···আবার চলে সেই ব্যাপার। তার মধ্যে যদি এলো কলেরা, দলকে দল উজার ক'রে নিয়ে চলে গেল। তাই জিজ্ঞাসা করছি, বল, তোমরা চাও, যে এই ভাবে তোমাদের মালিকরা তোমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক?

রতন বিহ্বলের মত বলে, না···কখ্খনোই নয়···ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, কখ্খনোই নয়!

একজন কুলি তাদের ঘরে বেড়াতে এসেছিল। সে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো, আমরা কি করতে পারি সাহেব! তোমরা লেখা-পড়া-জানা লোক...সাহেবদের মতই...সেই জন্য তোমরা অন্য সাহেবের সঙ্গে লড়তে পারো...কিন্তু আমরা কে? কি সাহসে আমরা প্রতিবাদ করবো?

উত্তেজিত কণ্ঠে সউদা জবাব দেয়, কি সাহসে আবার! তোমরাও মানুষ ...সেই তোমাদের সব চেয়ে বড় দাবী। নিজেদের ইজ্জৎ ভুলে গেলে চলবে কেন? কেউ যদি তোমার মাথা থেকে পাগড়ী টেনে নিয়ে ফেলে দেয়, তুমি তাতে প্রতিবাদ করবে না?

উত্তেজিত সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে কুলিটি নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়, না!

সউদা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, তা'হলে বলবো তোমার ইজ্জৎ নেই! মান-অপমানের জ্ঞান নেই...মনুষ্যত্ব নেই!

রতন বুকে হাত দিয়ে বলে ওঠে, আমি কিন্তু মরদের বাচ্চা!

—তাই তো তোমার চাকরী আগে গেল, হেসে ওঠে মুন্নু।

হঠাৎ মুন্নুর সেই ব্যঙ্গ-উক্তিতে সকলেই হেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে যে-উত্তেজনা জমা হয়ে উঠেছিল, তা' যেন একটু হাল্কা হয়ে যায়। ঘাড় দুলিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে হরি বলে, আমাদের কিন্তু কাজ করতেই হবে...চিমটা সাহেবের কাছে না হোক্, অন্য কারুর কাছে!

—হাঁ, হাঁ, কাজ তো করতেই হবে! কাজ করা তো ভাল! কিন্তু এগারো ঘণ্টা রক্ত জল ক'রে যদি তার উপযুক্ত মাইনে না পাও? আমি যা বলি, সেই রকম যদি চলো, তা'হলে আমি বলছি, তোমাদের খাটুনির মেয়াদ কমে যাবে এবং মাইনেও বাড়বে!

হরি জিজ্ঞাসা করে, কি করতে হবে শুনি?

সউদা বলে, তোমরা এক সঙ্গে সকলে মিলে কাজ ছেড়ে দিয়ে মিল থেকে বেরিয়ে পড়ো। যতক্ষণ না তোমাদের মাইনে বাড়ে, খাটুনির ঘণ্টা না কমে, যতক্ষণ না তোমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া

শেখানোর কোন ব্যবস্থা হয়, তোমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর-দোর দেয়, ততক্ষণ তোমাদের কাজ ছেড়ে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে!

জ্যাকসন সংক্ষেপে সেই কথাটাই-বলে, অর্থাৎ তোমাদের ধর্মঘট করতে হবে!

রতন তৎক্ষণাৎ জানায়, আমি রাজী!

মুন্নু তাকে ক্ষেপায়, তুমি তো সকলের আগেই ধর্মঘট ক'রে আছো!

ঘরে আর যে-সব কুলি ছিল, তারা চুপচাপ বসে থাকে। সউদার প্রত্যেক কথাটী যে সত্য, তা তারা মনে-প্রাণে বুঝতে পারে কিন্তু তাদের ভাবনা, ধর্মঘটের মধ্যে তারা খাবে কি? তাঁদের ছেলে-পুলেরা কি ক'রে উপোস দিয়ে থাকবে? এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা খুঁজে পায় না···খুঁজতে গিয়ে তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই মাথা নীচু ক'রে তারা নীরবে বসে থাকে।

মুজাফর বুঝতে পারে। শান্তভাবে তাদের শেষ-আবেদন ক'রে বলে, বেশ ভাল ক'রে তোমরা ভেবে দেখ। ইতিমধ্যে, রতন, তুমি বরঞ্চ কাল আমাদের সঙ্গে একবার দেখা কোরো, তোমার সম্বন্ধে কি করতে পারি দেখবো'খন!

কুলিরা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়।

কম্যুনিষ্ট তিনজন সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করে।

—সালাম, সালাম, সালাম···

মুন্নুর অন্তরে অব্যক্ত এক মহাচাঞ্চল্য জেগে ওঠে···

সউদা, মুজাফর এবং জ্যাকসন রতনের জন্যে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড-য়ুনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টকে ধরাধরি ক'রে স্যার জর্জ হোয়াইট্ মিলের কর্তৃপক্ষের কাছে একটা আবেদন পাঠাবার বন্দোবস্ত করলো। আবেদনে লেখা হলো, যাতে রতনকে আবার কাজে বহাল করা হয়।

মিলের সাহেবের সেক্রেটারী মিঃ লিটলের কাছে সেই আবেদন-পত্র গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু অফিসের বিরাট দফ্তরের চাপে এক কোণেই তা পড়ে রইলো। মিঃ লিটল জরুরী কাগজ-পত্রে আগে হাত দিলেন, জরুরী বলতে সর্বপ্রথম বোঝায়, স্যার জর্জ হোয়াইটের নিজস্ব ফাইল।

স্বভাবতই মিঃ লিটল একটু অসহিষ্ণু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার ওপর বোম্বের চাপা গরমে সর্বদাই তাঁর মুখমণ্ডল ঘেমে নেয়ে উঠতো…তাতে সাহেবের অসহিষ্ণুতা এবং সেই সঙ্গে রাগের মাত্রাও বেড়ে যেতো।

ফাইলগুলো টেনে নিয়ে, তিনি হেঁকে উঠলেন, ক্লুওয়ালা!

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে একজন অল্প বয়স্ক দেশী কেরাণী ঘরে এসে ঢুকলো। পরণে সস্তাদামের সাদা বিলাতী পোষাক কিন্তু মাথায় কালো রঙের দেশী টুপি। বিলাতী পোষাক পরার অপরাধ যেন জাতীয় পোষাকের প্রতীক টুপিটুকু পরে কাটান দেওয়া হয়েছে।

ঘরেতে ঢোকবার সময় তার মুখের চেহারা দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে, সাহেবের সামনে আসতে তার ভয় ক'রছে। একবার হর্ণবি রোডের মোড়ে এক সাহেবের পদাঘাত অযাচিত পুরস্কারস্বরূপ পাবার সৌভাগ্য তার ঘটে। বেচারার অপরাধ, কৌতূহল বশতঃ সাহেবের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল। সেই থেকে কোন সাহেবের সামনে যেতেই তার ভয় করে।

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে টেবিলের সামনে এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিঃ লিটল ঝংকার দিয়ে ওঠে, মাই গড্! ভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে আমার যন্ত্রণা বাড়াতে কে বলেছে তোমাকে? বোসো!

ইয়াস্ স্যার! বলেই ধপ্ ক'রে সামনের চেয়ারে বসে পড়ে।

—লেখো…

সর্ট-হ্যাণ্ডের খাতাপত্রগুলো ঠিক ক'রে নিতে একটু সময় লাগে, সাহেব অধীর হয়ে ওঠে, বলি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না স্যার!

—নাও, আরম্ভ করো, ওপরে লেখ, নোটিশ…বানান হলো, N…O…T…I…C…E…

ঠিক সেই সময়ে একটা বেরসিক মাছি সাহেবের নাকের ডগার ওপর এসে বসে। সাহেব হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে যেই কথা বলবার জন্যে মুখ হাঁ ক'রবে, মাছিটা অমনি আবার ফিরে এসে ঠিক সেই জায়গায় বসে।

সাহেব চীৎকার ক'রে ওঠে, লালকাকা !

—হুজুর…বলতে বলতে পর্দার ওপার থেকে অফিসের পার্সী 'বয়' ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়।

বালক-ভৃত্যের হাতে একটা ছড়ি দিয়ে সাহেব হুকুম দেয় ঘরেতে যেখানে মাছি বসতে দেখবি, এই ছড়ি দিয়ে মেরে ফেলবি !

জী হুজুর ! লালকাকা যেন একটা মহৎ কাজের দায়িত্ব পেলো…আনন্দে সাহেবের হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে নেয়।

—নাও, স্ক্রুওয়ালা, এবার লেখো—

স্ক্রুওয়ালা পেনসিল নিয়ে লিখে চলে, সাহেব ধীর স্থিরভাবে বলতে থাকে,—

বর্তমান বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য মন্দা এবং মুদ্রা-সঙ্কটের দরুণ, মিলের ডিরেক্টর মহোদয়গণ অতঃপর স্থির করিয়াছেন যে, যাহাতে মিলের যন্ত্র না থামিয়া চলিতে থাকে, সেইজন্য মিল এখন হইতে কম সময় চলিবে এবং অবস্থা অনুযায়ী মিলের খরচও কমাইতে হইবে। সুতরাং অন্য নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এখন হইতে প্রত্যেক মাসের চতুর্থ সপ্তাহ কাজ বন্ধ থাকিবে। যে-সপ্তাহ মিল বন্ধ থাকিবে, সে-সপ্তাহের মাহিনা কুলিরা পাইবে না। কিন্তু মিলের কর্মীদের মঙ্গলচিন্তা কর্তৃপক্ষদের সর্বদাই স্মরণে আছে, সেইজন্য তাহাদের যথোপযুক্ত ভাতা দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ১০ই মে হইতে এই আদেশ কার্যকরী হইবে।

(স্বাক্ষর) স্যার রেজিন্যাল্ড হোয়াইট্, বার্ট, প্রেসিডেণ্ট, স্যার জর্জ হোয়াইট মিলস।

ঠিকমত লেখা হলো কি না, স্ক্রুওয়ালা যেই তা প'ড়ে শোনাতে যাবে, অমনি আবার সেই মাছিটা এবার সাহেবের বিস্তৃত কপালের ওপর এসে বসলো সাহেব বিরক্ত হ'য়ে ভ্রুকুটী বিস্তার ক'রে লালকাকার দিকে চাহিলেন।

লালকাকা মাছিটাকে আক্রমণ ক'রবে কি না একটু ইতস্তত করছিল কিন্তু সাহেবের ভ্রুকুটী-ইঙ্গিতে তার সে দ্বিধা দূর হ'য়ে গেল। ছড়িটা তুলে সোজা সাহেবের কপালে বসিয়ে দিল।

—ড্যাম্ ফুল্ ! ব্ল্যাডি রাস্কেল···সাহেব গর্জন করতে করতে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। একহাতে কপাল ঘসতে ঘসতে, আর এক হাত শূন্যে আস্ফালন ক'রে সাহেব লালকাকাকে তার কর্তব্যপরায়নতার পুরস্কার দেবার জন্যে স্ব-বুট পা তুলতেই টেবিলের ওপর টেলিফোনটা জোরে বেজে উঠলো···

সাহেবকে অন্য কাজে ব্যস্ত দেখে স্ক্রুওয়ালা রিসিভারটা তুলেছিল বটে, কিন্তু সাহেব উদ্যত-পা নামিয়ে নিয়ে এক ঝটকা মেরে তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কানে লাগালো—হ্যালো···হ্যালো···ও···স্যার রেজিন্যাল্ড···গুড মর্ণিং স্যার···নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই···এইমাত্র সর্টহ্যাণ্ডে লেখালাম···হাঁ স্যার··· জিমিকে ডেকে তার হাতেই দিয়ে দেবো···নিশ্চয়ই স্যার···কখন স্যার ? লাঞ্চের আগে ? আমি থাকবো স্যার···নিশ্চয়ই স্যার···গুড মর্ণিং স্যার···গুড মর্ণিং···

লালকাকা তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে সাহেব আদেশ করলো, শূয়োর-কা-বাচ্চা, জলদি জিমি সাহেবকো সেলাম দেও।

লালকাকা ছুটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ জিমি সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসে।

—হ্যালো জিমি, সামনের হপ্তা থেকে মিলে কমতি-রোজ সুরু হবে !

জিমি সাহেব আনন্দে বলে উঠলো, মরলো ব্যাটা নিগারগুলো ! ঠিক হয়েছে ! একটা পেগ খেতে ইচ্ছে ক'রছে !

—ঐ ড্রয়ারটা টানো—হুইস্কীর বোতল আছে · আমারও তেষ্টা পাচ্ছে··· গলাটা অনেকক্ষণ থেকে কাঠ হয়ে আছে !

বোতল থেকে গেলাসে ঢালতে ঢালতে জিমি সাহেবের নজর স্ক্রুওয়ালার ওপর গিয়ে পড়তে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ?

—সেব নোটিশটাই লিখছে—জবাব দেয় মিঃ লিটল।

একটা গেলাস আধাআধি নির্জলা হুইস্কী দিয়ে ভর্তি ক'রে জিমি লিটলের সামনে তুলে ধরে, এই নাও !

লিটল গেলাসটা তুলে নিতে নিতে জিমিকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে জানায়, কিন্তু সাবধান ! বেশী নয় ! রেজী লাঞ্চের আগে এখানে আসছে !

—তাতে তুমি মরবে···আমার কি.? আমাকে তো আর খাতা সাজিয়ে হিসেব বোঝাতে হবে না ?

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে লিটল নোটিশটার কথা তোলে, দেখো, সাহেব চলে গেলে ন্যোটিশটা কুলিদের জানিয়ে দেবে। ব্যাটাদের দলে কতকগুলো হুজুগে বদমায়েস আছে তো ?

—কতকগুলো নয়···একটা·· সেটাকেও আমি ঘাড় ধরে বার ক'রে দিয়েছি! ব্যাটা লাল-ঝাণ্ডাদের উস্কানিতে বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু ক'রে দিয়েছিল। তবে লোকটা কাজের লোক ছিল, কিন্তু তা'বলে তো কারখানার মধ্যে বিপ্লবী পুষতে পারি না!

—আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, বোধ হয় সেই লোকটার সম্বন্ধে ট্রেড য়ুনিয়নের কাছ থেকে একটা আবেদন পেয়েছি। ওরা বলেছে, লোকটাকে আবার কাজে বহাল ক'রে নেবার জন্যে। ব্যাপারটা কি বলতো? এই সব পাজী নচ্ছারগুলোই তো চারদিকে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে···সত্যি, আমি ভেবে পাই না; গভর্ণমেণ্ট চুপ ক'রে বসে আছে কেন? বিস্ময়ে প্রশ্ন করে লিটল।

পাত্রে এক চুমুক দিয়ে জিমি বলে, আর ওদের মধ্যে আবার দুটো দল হয়ে গিয়েছে। একটা হলো ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন, তার কর্তা হলো ওংকারনাথ। আর একটা হলো রেড-ফ্ল্যাগ য়ুনিয়ন, সেটা সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টার থেকে জ্যাকসন বলে কে একটা লোক এসে গড়ে তুলেছে!

লিটন সাহেব ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ে, সব ব্যাটাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সামনে সাড়ি সাড়ি দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মেরে ফেলা উচিত।

এমন সময় বাইরে মোটর গাড়ীর হর্ণের চীৎকারে লিটল সাহেবের উচ্ছ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বোতল এবং গেলাস ড্রয়ারের ভেতর লুকিয়ে ফেলে জিমি সাহেবও পর্দা সরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—এই যে, গুড মর্ণিং লিটন্স, গুড মর্ণিং জিমি,—স্যার রেজিন্যাল্ড এগিয়ে এসে ঘরে ঢোকেন।

—নোটীশটা দেওয়া হয়েছে?

জিমি উত্তর দেয়, না, স্যার, এখনো দিই নি···

স্যার রেজিন্যাল্ডের মোটরের শব্দ শুনে জিমি সাহেবের মেম সামনের বাংলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। স্যার রেজিন্যাল্ডকে কারখানায় দেখার সৌভাগ্য তো খুব বেশী ঘটে না!

জিমির দিকে চেয়ে হেসে স্যার রেজিন্যাল্ড বলে ওঠেন, জিমি, তোমার বউকে বলো, আমি বলেছি, বারান্দায় দাঁড়াবার সময় সে যেন জামা-কাপড় আর একটু বেশী ব্যবহার ক'রে!

জিমি লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে···কটমট ক'রে একবার বাংলোর দিকে চায় ···তারপর শান্ত দৃষ্টিতে স্যার রেজিন্যাল্ডের দিকে চেয়ে স্ত্রীর ক্ষীণ-বস্ত্রের ত্রুটীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

স্যার রেজিন্যাল্ড কাজের কথা পাড়েন,—হাঁ,···এই নোটীশ সম্পর্কে বলছিলুম···ডিরেক্টররা হোম থেকে যা খবর পাচ্ছেন, তাতে খুব খুশী হবার কিছু নেই। তা' ছাড়া, শুধু এই মিলের দরুণ নয়, কলকাতা এবং মাদ্রাজে যে সব মিল আছে, তাদের শেয়ার-হোল্ডারদের মুখের দিকে চেয়ে আমাকে বাধ্য হ'য়েই এই পন্থা নিতে হ'লো। আমাদের অবস্থা এখন ঠিক কি, তা' জানবার জন্যে হোম্ থেকে এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকেও জরুরী তারে খবর আনাবার ব্যবস্থা করেছি···যদি এই রকম দুর্দিন···

লিটল সাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠে, এখানকার হিসেব-পত্র অডিটররা এখন দেখছেন···তবে আমার মনে হয়, এখানে আমাদের অবস্থা ভালই। গত মাসে যা অর্ডার পেয়েছি, তা' ভালই বলতে হবে। কিন্তু বাইরের প্রতিযোগিতা বেড়ে গিয়েছে বলেই—

—এ সম্বন্ধে একটা ডেলিগেশন নিয়ে আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছি···দেখি কতদূর কি ক'রতে পারি। এখন আমাদের যা অবস্থা হয়েছে ···তাতে তুলোর মিলের কারবারে ভারতবর্ষীয়েরা প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ দখল ক'রে নিতে চলেছে···যাই হোক্···এখন আর আমার বেশী সময় নেই ···লিটল, তুমি শিগগির হিসাবটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে···গুড বাই!

সাহেব গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জিমি সাহেব কুলিদের ডেকে নোটীশের খবর জানিয়ে দেয়। কুলিদের মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ে। তারা দেখে, বড় সাহেবের ডিমলার গাড়ীখানা ফটক দিয়ে এই মাত্র বেরিয়ে গেল···নইলে তারা সবাই মিলে বড় সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়তো। কিন্তু যখন তার আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন তারা দল বেঁধে জিমি সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়বার জন্যেই অগ্রসর হয়।

জিমি সরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেয়, যদি ঐ নোংরা হাত দিয়ে তারা তার পা ছুঁতে আসে, তা'হলে লাথি মেরে সে মাথা গুঁড়ো ক'রে দেবে!

কিন্তু তবুও তারা ফিরে যায় না! হাত জোড় ক'রে সবাই মিলে একসঙ্গে তারা কেঁদে ওঠে, কাতরভাবে অনুনয় করে, সাহেবের সামনে মাটিতে সারা দেহ লুটিয়ে দেয়। তারা বড় সাহেবকে জানে না, তারা জানে জিমি সাহেবই তাদের দেবতা, তাদের হর্তাকর্তাবিধাতা। তাদের মারতে বা বাঁচাতে সেই পারে।

বেগতিক দেখে চিমটা সাহেব বাংলোর ভেতর ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাদির খাঁন এসে তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়।

[এগার]

শেরার-হোল্ডার, বড় সাহেব, ডিরেক্টর, এসব ব্যাপার মুন্নু কিছুই জানতো না। তার মনে হলো, রতনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই, এত সব গণ্ডগোল। তাই নিজের সহজ বুদ্ধিতে সে ঠিক করলো, সে নিজে গিয়ে চিমটা সাহেবকে ধরবে, পা ধরে অনুনয় করবে, রতনকে ফিরে নাও কাজে!

মনে মনে এই স্থির ক'রে, কাউতে কিছু না জানিয়ে সে চিমটা সাহেবের বাংলোর দিকে অগ্রসর হলো।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় তার বুকের ভেতর কাঁপুনি যেন শতগুণ বেড়ে যায়। এমন সময় দেখে, বারান্দার সামনে ঘরের পর্দা সরিয়ে মেম সাহেব দাঁড়িয়ে—নিশ্চয়ই চিমটা সাহেবের স্ত্রী!

কপালে হাত ঠেকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে মুন্নু বলে, সালাম!

মেমসাহেব মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তরে সেলাম জানায়। ঘরের ভেতর জিমি সাহেব তখন বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢালছিল। পর্দা সরিয়ে মেমসাহেব তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে, ঘরে বসে বসে মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছো, আর বাইরে যে তোমার কুলিরা···

জিমি সাহেব আর কোন কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে হাতের বোতলটা সোজা বাইরে মুন্নুর দিকে সজোরে ছুড়ে মারে। মেমসাহেবের কথায় সে ধরে নিয়েছিল যে, কুলিরা তার ওপর চটে গিয়ে বাংলোয় ধাওয়া করেছে···নিশ্চই তাকে খুন করবে···

জিমি সাহেবের বোতল সৌভাগ্যবশত মুন্নুর গায়ে না লেগে, থামে সশব্দে ফেটে যায়।

মেমসাহেব কি হচ্ছে, না হচ্ছে, বুঝতে না পেরে তারস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে, খুন! খুন! পুলিশ!

জিমি সাহেব যখন বুঝলো, মাঝখান থেকে তার বোতলটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার সব রাগ গিয়ে পড়লো মেমসাহেবের ওপর। রাগে অন্ধ হয়ে মেমসাহেবকে শিক্ষা দেবার জন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে জিমি সাহেব অগ্রসর হয় ···আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় মেমসাহেব সামনের একটা চায়ের কেটলী তুলে নিয়ে সজোরে স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে ছোড়ে···

অবস্থা দেখে মুন্নু নিঃশব্দে সরে পড়ে।

[বারো]

সেদিন বিকেল বেলা স্যার জর্জ হোয়াইট মিলের কুলিরা মিলের সামনের মাঠ দিয়ে ভূতের মতন যে-যার গর্তে ফিরে এলো।

হঠাৎ সেই নোটিশের ধাক্কায় তারা একদম অসাড় হয়ে গিয়েছিল। জীবনে তাদের একটি মাত্র সৌভাগ্য আছে, সে-সৌভাগ্য হলো, কাজ করা···হাঁ,

কাজ করা…কাজ ক'রলে, তবে তারা মাইনে পাবে…কাজ না ক'রলে, উপবাসে শুকিয়ে মরতে হবে। তাই সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে, তাদের জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই কাজ ক'রতে তাদের এতটুকু অলসতা নেই। গুদাম-ভর্তি তুলোর আঁস ছাড়াতে, পরিষ্কার করতে তুলোর আঁসে যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাতেও তারা কিছু মনে করে না। সেই তুলো থেকে স্থতো তৈরী করতে, মেসিনের সঙ্গে মেসিন হয়ে যেতে, যদি তাদের জীবন থেকে সব সূর্যের আলো মুছে যায়, তাতেও তাদের কোন আপত্তি নেই,! যতক্ষণ তারা হাত পাতলে মাইনে পাবে, যা দিয়ে তারা ছু'বেলা ছু'মুঠো ডাল-ভাত খেতে পায়, ততক্ষণ তারা সব কিছুই ক'রতে পারে। কিন্তু সেই কাজ যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়…!

সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জীবনের যেটুকু আঁচ তখনও পর্যন্ত বেঁচে ছিল, হঠাৎ যেন তা নিভে গেল। সেই মুহূর্তে তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা মানুষের জাত। তারা যেন অন্য কোন স্বতন্ত্র জীব-জগতের বাসিন্দা…ম্লান চোখের দৃষ্টি…সে-চোখ কোটরে কোথায় ঢুকে গিয়েছে… ছু'ধারে গাল তুবড়ে গর্ত হয়ে গিয়েছে…বুকের পাজরা চামড়া ফুড়ে বেরিয়ে আসছে…শুকনো…ম্লান…শূন্য। বেদনারও সীমা ছাড়িয়ে তারা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, উদাসীন…কোন কিছু ভাববার শক্তিও তাদের আর নেই।

মুন্নু ফিরে গিয়ে রতনকে বলে, চিমটা সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম…তোমার হয়ে বলবো বলে…রেগে আমাকে বোতল ছুঁড়েই মেরে দিল…তোমার ওপর এত রেগে গিয়েছে যে আমাদের সকলের কমতি-রোজ ক'রে দিল!

রতন তাকে বুঝিয়ে বলে, বোকা…আমার ওপর রাগের জন্যে নয়… আর হুকুম দেবার সেই বা কে? আমাদের কমতি-রোজ হয়েছে… বড় সাহেবের হুকুমে…জালার মত পেটে খিদের অন্ত নেই যার! আমার সঙ্গে মিটিং-এ চল্…সেখানে সব কুলিরা যাবে…সেখানে গেলে সব বুঝতে পারবি… ট্রেড-য়ুনিয়ন থেকে ধর্মঘটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে!

মুন্নু বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে, তা' হলে তো আমার অন্যায় হয়েছে··· চিমটা সাহেবকে মিছামিছি আমি দোষী···

রতন বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, মিছামিছি নয়—সে আসল বদমায়েস···দেখবি কি ক'রে তার মাথা আমি গুঁড়িয়ে ফেলি···শুধু তার নয় ···ঐ বড় সাহেবেরও···মোটর গাড়ী ক'রে এসে আমাদের মাইনে কেটে নেওয়া···আমি দেখে নেবো !

[তেরো]

বাংলো-বাড়ীর পেছনে মস্ত বড় যে মাঠটা পড়েছিল, সেইখানে দলে দলে কুলিরা এসে জড় হতে লাগলো।

সেই বিরাট জনতার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে ফরিয়াদ জেগে ওঠে—দূর করো য়ুনিয়ন জ্যাক···উড়াও লাল-ঝাণ্ডা ! আবার তৎক্ষণাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় ঘন-বনে হঠাৎ যেমন ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠে থেমে যায়।

বহুদিন ধরে তিল তিল ক'রে তাদের অন্তরে যে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার বাসনা নিষ্ক্রিয়ভাবে জমা হয়েছিল, সেই উন্মাদ চীৎকারে তাকে মুক্তি দিয়ে তারা যেন তার লাঘব করে···নিরুদ্ধ জ্বালার উত্তাপে তাদের চোখ মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে···

—এ যুগের বাতাসে আছে পাপ !—দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক বৃদ্ধ কারিকর বলে, যেন তার বুকের পাঁজরার ভেতর থেকে সেই কথাগুলো বেরিয়ে এলো !

একজন আধাবয়সী কুলি বৃদ্ধকে সমর্থন করে, সত্যিই কত্তা ! এর মধ্যে আমরা বাঁচি কি ক'রে ?

ছোকরা-মতন একজন উত্তর দেয়, বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, প্রতিবাদ করা···

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলে, আজকালকার ছেলে কাউকে মানতে চায় না !

প্রত্যুত্তরে যুবক বৃদ্ধকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ঠাকুরদা, রোজ সকাল বেলা আমি তোমাকে পেন্নাম করি কিনা বল? কিন্তু তা বলে মোটর-ওয়ালা বড় সাহেবের সামনে আমি ভূমিষ্ট হতে পারবো না। তিনি তো মজায় মোটর গাড়ীতে চড়ে কারখানা বেড়াতে আসেন…আমাকে রোদে পুড়ে ধূলো মেখে পায়ে হেঁটে আসতে হয়…তার ওপর তিনি কাজের মধ্যে করলেন কি? না, আমাদের রোজ কেটে নিলেন!

প্রৌঢ় লোকটী সায় দিয়ে ওঠে, তা যা বলেছ ভায়া…মুনিব সুবিধের নয়। আমার বাচ্ছাগুলোর কারুর পায়ে জুতো বলতে কিছু নেই…সেদিন ছোট ছেলেটার পা কেটে গেল…ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলুম…বলে কি না কেটে ফেলতে হবে!

তার শোকাচ্ছাসে বাধা দিয়ে যুবকটি বিদ্রূপ ক'রে ওঠে, সাহেবদের ধারণা আমাদের কোনমতে এক মুঠো জুটলেই হয়ে গেল…আর ওরা গ্যাট্ মিট গ্যাট্ মিট করতে করতে লেডীদের নিয়ে মোটর চড়বেন।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে জোড় গলায় চীৎকার ক'রে বলে ওঠে, কিন্তু আমরা য়ুনিয়নের লোক…আমরা জানতে চাই, আমাদের জন্যে য়ুনিয়ন কি করছে?

দেখতে দেখতে তার প্রশ্ন এককণ্ঠ থেকে আর এককণ্ঠে ঘুরতে থাকে।

—আমরা জানতে চাই…য়ুনিয়ন কি করেছে? সমবেতকণ্ঠে য়ুনিয়নের একদল পুরানো সভ্য চীৎকার ক'রে উঠলো।

হঠাৎ রতন একটা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ায়, চুপ করো! ভাই সব চুপ করো! আমাদের প্রেসিডেন্ট ওংকারনাথ এইবার কথা বলছেন…তারপর লালঝাণ্ডাদলের সউদা সাহেব, মিষ্টার মুজাফর আর জ্যাকসন সাহেব বলবেন… আসুন প্রেসিডেন্ট সাহেব…আসুন—নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত বিস্তার ক'রে দীপ্ত মুখে সে ওংকারনাথকে আহ্বান করে।

মুন্নু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে সে-ও বলে ওঠে, আসুন প্রেসিডেন্ট সাহেব…আসুন…

জনতা একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো, প্রেসিডেণ্ট সাহেব, বলুন!

লালা ওংকারনাথ, ধীর মন্থর গতিতে বেদীর দিকে অগ্রসর হলেন। খোপদোস্ত চেহারা, আপাদমস্তক দেশী সিল্কে সুসজ্জিত। বয়স চল্লিশের বেশী হবে না কিন্তু ইতিমধ্যেই কানের ওপরে মাথার দু'পাশে দু'একটি ক'রে শ্বেত পতাকা দেখা দিয়েছে। অধর-ওষ্ঠটী সর্বদাই কোণের দিকে এক অপরূপ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বেঁকে আছে···যেন সেই নীরব ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান, জগতে একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবাই করুণার পাত্র। ক্ষুর-চাঁচা পরিষ্কার মুখে বিলেত যাওয়ার আভিজাত্যের ছাপ এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই হতভাগ্য দেশের মাটিতে পা-দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে একজন ঘোরতর সোসালিষ্ট বলে জাহির করেন··· আশা ছিল, হয়ত গান্ধীজী তাঁকে হাত ক'রবেন বা গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই মনে মনে বুঝলেন, তীরটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগে নি। তাই তিনি পরমারাধ্যা সুপ্রাচীনা এই ভারতমাতার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন···উদ্দেশ্য, পশ্চিমের নবলব্ধ শ্রমবাদের মন্ত্রে পূর্বদেশের জনতার জড়দেহে প্রাণ-সঞ্চার করা।

—ভ্রাতৃবৃন্দ!

বিপুল গাম্ভীর্যে লালা ওংকারনাথ জনতাকে আহ্বান করেন কিন্তু জনতার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, তাঁর গাম্ভীর্য নিতান্তই মাঠে মারা গেল!

অধীর ভাবে রতন বলে উঠলো, ধর্মঘটের কি হলো, তাই বলো প্রেসিডেণ্ট সাহেব!

রতনের জামার খুট টেনে ধরে মুন্নু জিজ্ঞাসা করে, আরে ঐ লোকটাই না সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় নি?

—হাঁ,—রতন সংক্ষেপে মুন্নুর উত্তর দেয়, তারপর বক্তার দিকে চেয়ে আবার বলে ওঠে, ধর্মঘটের কি হলো, তাই বল লালাজী!

বেদীর ওপর থেকে মুজাফর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বসো, বসো রতন ভাই সবাই চুপ ক'রে শোন···প্রেসিডেণ্ট কি বলেন! তাঁকে বলতে দাও!

—আচ্ছা···বলে রতন বসে পড়ে।

ওংকারনাথ নতুন ক'রে সুরু করেন, ভাই সব, প্রত্যেক যুগে ধন-উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, কারিকর···তৈরী পাকা কারিকর এবং আনাড়ী কারিকর···তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করুক আর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই কাজ করুক। প্রাচীন ভারতবর্ষে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের একটা সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল···এবং শ্রম-পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে একটা দায়িত্বের সম্পর্ক ছিল, তা' এই প্রাচীন উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রমিকের পক্ষে উদার বিচক্ষণ প্রভু যমন বিরল, তেমনি বুদ্ধিমান, অনুগত এবং সত্যবাদী শ্রমিকও সকলের ভাগ্যে জোটে না! মিঃ রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর বিখ্যাত—

লালাজীর কাছ থেকে সেদিন রতন মুখ বুঁজে যে প্রত্যাখ্যানের অপমান নিয়ে চলে এসেছিল, সে-কথা সে ভোলে নি। তাই তার জ্বালায় সে স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারছিল না। বিরক্ত হয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ও সব কথা শুনে কি হবে? আমাদের মাইনে কাটার সম্বন্ধে কি হ'লো তাই বল লালাজী!

সে-কথা যেন তাঁর কর্ণগোচর হয় না, ওংকারনাথ পরম-উৎসাহে কেতাবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেন, একমাত্র অসাধু মনিবই তার নিযুক্ত শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নেয়, আশা দেয়, কিন্তু পরিপূরণ করে না, পরিশ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না···অন্যদিকে, যে শ্রমিক কাজ করতে করতে কেবল পারিশ্রমিকের জন্য উত্যক্ত করে, সে নিন্দনীয়। যে মনিব পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দেয় না, সে-ও ঠিক তদ্রূপ নিন্দনীয়!

রতন বসে বসে গজরাতে থাকে, নিন্দনীয়!

হঠাৎ কে একজন বলে ওঠে, আমাদের যে রোজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে য়ুনিয়ন তার কি ক'রছে?

প্রেসিডেন্ট তাঁর বাঁকা ঠোঁঠ আর একটু বেঁকিয়ে উত্তর দিলেন, অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন যথাযোগ্য স্থানে কথা-বার্তা চালাবেন।

ভিড়ের ওপরে মাথা তুলি রতন বলে ওঠে, গত বছর জামশেদপুরে টাটার কারখানাতেও তুমি ঠিক একই কথা বলেছিলে···কিন্তু তা'তে তো কিছুই হলো না!

বিরক্ত হয়ে তিনি আদেশ করেন, বসো! বক্তৃতার সময় বাধা দিও না। বোম্বের মিলের মালিকরা অবুঝ নন্···তাড়াহুড়া ক'রে একটা গোলমাল বাড়িয়ে তো লাভ কিছু হবে না! আমার কথা হলো, গণ্ডগোল হয়েছে, বেশ, কথাবার্তা বলে মিটমাট ক'রে ফেল। ইতিমধ্যেই বোম্বের রাস্তায় হাজারে হাজারে বেকার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না! আর তা ছাড়া ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া আমি কোন ধর্মঘটকেই প্রশ্রয় দিতে পারি না!

অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠলো, কংগ্রেসের দোহাই দিলে কি হবে? আমরা কমতি-রোজে কিছুতেই কাজ করবো না।

প্রেসিডেন্ট গর্জন ক'রে উঠলেন, চুপ করো! বিলেতে শ্রমিকরা কি করে, আমি তা ভাল ক'রে দেখে এসেছি। সেখানকার শ্রমিকরা যে এত বলশালী তার কারণ কি? তার কারণ হলো, সঙ্ঘবদ্ধতা। আমি যখন বিলেত থেকে এসে এই দেশের মাটিতে পা দিই, তখন আমাদের এখানে একটাও ট্রেড য়ুনিয়ন ছিল না—কেউ তার নাম পর্যন্ত এখানে শোনে নি। আমি এই ব্যাপার নিয়ে এতদিন ধ'রে পরিশ্রম ক'রে এসেছি···আমি চাই, তোমরা আমার কথা মত ঠিক পথে এগিয়ে চল। মিলের মালিকরা তোমাদের কাজ দেন, তাঁরা তোমাদের শত্রু নন্। তাঁরা যদি বুঝে থাকেন যে এখন কমতি-রোজে মিল চালাতে হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের ভেবে চিন্তে মতলব ক'রে একটা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলতে হবে। তোমাদের ভালমন্দ দেখবার জন্যেই য়ুনিয়নের আর একটা কর্তব্য আছে, মালিক আর শ্রমিক দু'পক্ষেরই যাতে ক্ষতি না হয়, তা দেখা। মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে য়ুনিয়ন যেভাবে আপোষ নিষ্পত্তি করে তাতে তোমাদের আস্থা থাকা চাই। য়ুনিয়নের কমিটির ওপর এবং প্রেসিডেন্টরূপে আমার ওপরও তোমরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রে থাকতে পারো।

হঠাৎ ওংকারনাথকে একরকম হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সউদা উঠে দাঁড়ায়, ভাই সব, ওংকারনাথজী যে কমিটির কথা বল্লেন, সে কমিটির সভ্যরা এখানেই উপস্থিত আছেন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা এখুনি এখানেই এর একটা ফয়শালা ক'রে ফেলতে চাই! লালা ওংকারনাথের মিলের মালিকদের ওপর অগাধ বিশ্বাস! এইমাত্র তিনি তোমাদের বলেছেন, মালিকরা তোমাদের শত্রু নন্। তবে একথা তোমরা প্রত্যেকেই ভালভাবে জানো যে, তাঁরা তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুও নন্। তোমাদের আর মিলের মালিকদের মধ্যে আকাশ-জমিন ফরাক্…তোমরা হলে উৎপীড়িত, তাঁরা হলেন উৎপীড়নকারী…

সমস্বরে জনতা বলে উঠলো, ঠিক বলেছ ভাই!

উত্তেজিত হয়ে সউদা বলে চলে, তাঁরা হলেন ডাকাত, লুঠেল, চোর, খুনে—হাঁ, খুনে হয়েও তারা মালাবার হিলের ওপর সুরম্য প্রাসাদে থাকে… তোমরা পরিশ্রম ক'রে যে অর্থ উৎপাদন কর, তাই দিয়েই তারা সে প্রাসাদ গড়ে। দিনের মধ্যে পাঁচবার ক'রে তারা খানা খায়—মালাবার হিলে বাস ক'রেও হাওয়া খেতে তারা রোলস্রইস্ নিয়ে বেরোয়। আর তোমরা, তোমাদের মাথার ওপর নেই ছাদ, পেটে নেই ভাত, পরণে নেই কাপড়… অথচ তোমরাই করছো তুলোর চাষ, তৈরী করছো সুতো…চলছে বড় বড় মিল। ওরা খেয়ে যে উচ্ছিষ্ট ফেলে, তোমরা আছো তা পরিষ্কার করবার জন্যে, মেথর মুদ্দাফরাস। ওরা ভোগ করবে, আর তোমরা করবে কাজ— জগতের নামহীন পরিচয়হীন মজুর দল। হাঁ…তোমাদের ডাক নাম হলো কুলি…তোমাদের পরিচয়, ডার্টি নিগার…তোমরা অসভ্য বর্বর। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে মাটির মেঝেতে একঘরে বুনোজন্তুদের মত একসঙ্গে কুড়িজন তাল পাকিয়ে জড়পিণ্ডের মত তোমাদের বাস ক'রতে হয়…দুর্গন্ধ আবর্জনা তোমাদের শয্যা…আঁস্তাকুঁড় তোমাদের উপাধান। তোমাদের দেহ আছে, কিন্তু দেহবোধ নেই…হাড় আছে, মাংস নেই…সেই হাড়কে ঢাকবার জন্যে আছে শুধু ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া! অথচ আমার বন্ধু লালা ওংকারনাথ বলেন, তোমাদের আর মালিকদের স্বার্থ নাকি একই!

রতন আনন্দে ফেটে পড়ে, সাবাস! সাবাস! সউদা সাহেব!

সউদার কথা শুনতে শুনতে, দেহের মধ্যে শিরায় উপশিরায় যে-রক্ত চলাচল হচ্ছে তা যেন মুন্নু স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে।

সউদা থামে না···

—লালা ওংকারনাথ ধনী ব্যক্তি, প্রভূত ধনী। জীবনে তিনি কোনদিন দেখেননি, দারিদ্র্য-রাক্ষুসী কি ক'রে মানুষকে টেনে নিয়ে ফেলে বুক-সমান নরক-কুণ্ডের পাঁকে···সে-পাঁকে সাপের মত ফনা তুলে আছে ক্ষিদে···জোঁকের মত রক্ত চুষে খাচ্ছে অভাব···কুমীরের মত হাঁ ক'রে জ্যান্ত মানুষকে গিলে খেয়ে নেবার জন্যে রয়েছে লোভ! আমার কথা সত্যি না মিথ্যে তোমরা তোমাদের নিজের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তোমাদের কারখানার ফোরম্যানের কুস্তী পাকে জড়িয়ে পড়েনি? মালিকদের ভাড়াটে দালালের আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরনি! সামনেই তোমাদের রয়েছে রতন ভাই···সে আর তার মতন অনেকেই বিনা কারণে আজ চাকরী থেকে বিতাড়িত হ'য়েছে। তাদের অপরাধ? তারা ফোরম্যানকে তাদের রক্তজল-করা মাইনে থেকে কমিশন দিতে চায় নি। মাইনের দিন কারখানার দরজায়, দরজার বাইরে কাবুলী মহাজনেরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সেই লাঠি পিঠে পড়েনি, এমন একজনও কেউ আছে তোমাদের মধ্যে? তোমাদের কাছ থেকেই শুনেছি, ঐ সব কাবুলী মহাজনেরা আসল টাকা ফেরৎ নিতে কিছুতেই চায় না—তাদের অসীম দয়া, মাসের পর মাস তাদের সুদটা শুধু তোমরা দিয়ে যাও। এইভাবে সামান্য ঋণের বদলে তোমাদের উপার্জনের যথাসর্বস্বই তারা গ্রাস ক'রে নেয়। তারপর একদিন আসে, যখন কারখানার মাইনে আর পাওয়া যায় না, সুতরাং সুদ বা আসল কিছুই শোধ দেওয়া যায় না···তখন গর্তে ফিরে গিয়ে উপোস দিয়ে মরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। হায়, কবে তোমরা বুঝতে পারবে, তিল তিল ক'রে যুগ যুগ ধরে তোমাদের কি ভাবে দোহন ক'রে মেরে ফেলা হচ্ছে!

মুন্নু উৎকর্ণ হয়ে সউদার দিকে চেয়ে থাকে…একটা কথাও যেন শুনতে ভুল না হয়ে যায়।

সউদা বলে চলে, সারা জগতে মানুষের মধ্যে মাত্র দুটো জাত আছে, একটা জাত হলো গরীব, আর একটা জাত হলো বড়লোক। এই দু'জাতের মধ্যে কোন মিল, কোন আত্মীয়তা নেই। যারা ধনী এবং সেই জন্যেই বলশালী, তারাই পৃথিবীর সব সুখ-সাধ-ঐশ্বর্য-ভোগের মালিক, যদিও তাদের সেই ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছে ডাকাতি, চুরি এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগে। পৃথিবী তাদেরই শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়…তারাও পরস্পর পরস্পরকে পিঠ চাপড়ে বাহাদুরী নেয়! আর তোমরা, যারা দরিদ্র এবং দরিদ্র বলেই দুর্বল এবং অসহায় এবং শান্ত… যেন পৃথিবীর অভিশপ্ত জীব… তোমাদের কোন দাবী নেই, কোন অধিকার নেই, দেহ ও মন পঙ্গু, জগতের কেউ তোমাদের দিকে একটা আঙুল তুলেও সম্মান দেখায় না… তোমরা যে আছ, তা স্বীকার পর্যন্ত করতে চায় না।

মুন্নুর মনে পড়ে, শ্যামনগরে থাকবার সময়, তারও মনে, ধনী ও দরিদ্র সম্বন্ধে ঠিক এই রকম সব ধারণা অস্পষ্ট ঘুরে বেড়াতো কিন্তু এমন ক'রে গুছিয়ে সাজিয়ে বলবার ক্ষমতা তো তার নেই।

—তাই, শোষিত সর্বহারার দল, মাথা তুলে উঠে দাঁড়াও…বল, আমার অধিকার আমি ছাড়বো না…উঠে দাঁড়াও, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে, বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে বল, এই আমি, এমনি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াবার তাগদ আমার আছে · অমনি কেঁচোর মত বুকে হেঁটে দু'বেলা কারখানার দরজা দিয়ে ঢোকবার আর বেরুবার জন্যেই শুধু নই!…জীবনের যেটুকু এখনো বাকি আছে তারি জোরে উঠে দাঁড়াও…নইলে পায়ের তলায় নিঃশেষে ঐ শয়তান শোষক ব্যাটারা তোমাদের টিপে মেরে ফেলবে! উঠে দাঁড়াও… এগিয়ে এস। কাল থেকে সুরু হোক ধর্মঘট…ভাই সব, সকলে মিলে এক সঙ্গে এসো, একসঙ্গে আওয়াজ তোলো, আমরা সকলকে শুনিয়ে দিই আমাদের দাবীর কথা।

কয়েক মিনিটের জন্যে সউদা নীরব হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার

সামনে সেই বিরাট জনতা বিদ্যুৎ-আহতের মত নড়ে ওঠে···উত্তেজিত কিন্তু যেন আবিষ্ট। সউদা ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করে, আমরা মানুষ··· নিষ্প্রাণ-যন্ত্র নই।

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা মিলিত-কণ্ঠে বলে ওঠে, আমরা মানুষ··· নিষ্প্রাণ-যন্ত্র নই।

সউদা বলে, আমাদের দাবী :—ঘুষ না দিয়ে কাজ করবার সহজ অধিকার!

—বাস করবার মত ঘর···

—উপযুক্ত পারিশ্রমিক ··কম্‌তি-রোজের ভুখ নয়···

—আমরা চাই, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল···

—আমরা চাই, লিখতে, জানতে, বুঝতে···

—আমরা চাই, জমিদার-মহাজনের গ্রাস থেকে বাঁচতে ···

—আমরা চাই আশ্বাস···যে কোন ফোরম্যান যখন খুশী আমাদের বরখাস্ত করতে পারবে না। আমরা চাই, আমাদের এই য়ুনিয়নকে মেনে নেওয়ার আইন।

উত্তেজিত জনতার সমবেত-কণ্ঠে সেই তুমুল-ধ্বনি প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অস্পষ্ট শোনা গেল,—ছেলে চুরি···ছেলে চুরি—

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে দেখা গেল, ভিড়ের পেছনে এক বৃদ্ধ কুলি আর্তস্বরে কাঁদছে, ওগো আমি কি করবো? আমার ছেলেকে না-কি চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে! এই লোকটা আমাকে খবর দিল এই মাত্তর!

জনতার ভেতর থেকে চাপা স্রোতের মত চাপা আওয়াজ উঠলো, ছেলে চুরি! সর্বনাশ! নিশ্চয়ই পাঠানদের কাজ! ব্যাটাদের পেশাই হয়েছে হিন্দুদের ছেলে-মেয়ে চুরি করা!

সউদা নেমে আসে জনতার মধ্যে···

—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

ভিড়ে স্পষ্ট কোন শব্দ কানে আসবার উপায় নেই, শুধু তার মধ্যে থেকে একটা ভাঙ্গা চাপা গলায় কান্নার বিচিত্র আওয়াজ আসে, মধ্য-রাত্রিতে অপহৃত-

শাবক-হায়নার আর্তনাদের মত।

সউদার প্রশ্নের উত্তরে একজন কুলি বলে ওঠে ছেলে-চুরি গিয়েছে! মুসলমানেরা একটা হিন্দু ছেলেকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।

জনতার ভেতর থেকে ভয় আর ঘৃণার একটা অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা জেগে ওঠে।

সউদা তীব্রকণ্ঠে ভর্ৎসনা ক'রে ওঠে, বাড়ী যাও! যে-যার বাড়ী যাও! এ-সব হ'লো—আমাদের শত্রুদের কারসাজি, হীন গুজব! কাল আর কেউ কাজে বেরিয়ো না···আমাদের য়ুনিয়ন থেকে ধর্মঘটের সময় তোমাদের কিছু পেট-ভাতা দেওয়া হবে···আর হাঁ, কাল এইখানেই আবার সবাই জড় হবে···এখান থেকেই শোভাযাত্রা বেরুবে!

সউদার কথা শেষ হ'তে না হ'তে ভিড়ের ভেতর থেকে আর একজন কে বলে উঠলো, সত্যি সাহেব, একটা হিন্দু-ছেলে চুরি গিয়েছে, হিন্দু-ছেলে!

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠলো, একজন নয়, অনেকগুলো হিন্দু ছেলে চুরি গিয়েছে সাহেব।

ক্রমশঃ সংবাদটা পাকাপাকিভাবে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনায় তারা উপস্থিত সমস্যার কথা ভুলে যায়। চারিদিক থেকে ক্রুদ্ধ আক্রোশের বাণী জেগে ওঠে।

—এর সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে! ব্যাটারা আস্পর্ধায় মাথায় উঠেছে। হারামজাদা!

সউদা চীৎকার ক'রে ওঠে, বাড়ী যাও, বাড়ী যাও,—আমরা দেখছি কি হয়েছে, না হয়েছে!

কিন্তু তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ক্ষিপ্ত জনতা প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে।

—আমরা প্রতিশোধ নেবো! কিছুতেই ছাড়বো না! আমাদের টাকা-পয়সাও কেড়ে নেবে, ছেলেদেরও চুরি করবে! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই!

রতন টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়,—চুপ কর্ বোকার দল! কারুর যদি ছেলে চুরি যায়, আমি আছি···আমি লড়বো তার হয়ে! কিন্তু আগে বাড়ী গিয়ে দেখ্, সত্যি সত্যি চুরি গিয়েছে কি-না!

কিন্তু মাঠের এক কোণে দেখা গেল, ইতিমধ্যেই একদল হাতাহাতি স্থরু ক'রে দিয়েছে। কতকগুলি মুসলমান-কুলি গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে, তারে রেখে দে শাক-চচ্চড়ী-খানেওয়ালা! হিঁদুয়ানী বাড়ী গিয়ে করিস্! আমাদের ধর্ম নিয়ে কিছু বলবি তো মাথা গুঁড়িয়ে দেবো!

[পনের]

মুন্নু ছুটে গিয়ে রতনের জামা টেনে ধরে। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। পিছন ফিরে দেখে, উন্মাদ জনতা তরঙ্গের মত এগিয়ে আসছে, পিছু হটছে, পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে…চার দিকে শুধু ক্রুদ্ধ মুখ… অগ্নি-উদ্গারী জ্বলন্ত দৃষ্টি। প্রত্যেক লোকই ক্ষিপ্ত হ'য়ে চীৎকার করছে… সেই সমবেত চীৎকারের মধ্যে একটিও কথা শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত আগে সউদার মুখে তাদের নব-অধিকারের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে তার মনে যে প্রাণদায়ী মহা-উল্লাস জেগে উঠেছিল, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা কোথায় উবে গেল? তার জায়গায় একি অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট মরণ-অন্ধকার? চারিদিকে রক্তচক্ষু, ক্রুদ্ধ-বিকৃত মুখ…উন্মাদ গালাগাল!

এমন সময় সে দেখে, জনতার সামনে, একটু দূরেই অতি পরিচিত নীলকোর্তা-পরিহিত পুলিসের লোক, লাঠী ঘোরাতে ঘোরাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে স্থরু ক'রে দিয়েছে।

মুন্নুর হাতের মুঠো থেকে জোর ক'রে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে রতন বলে, তুই বাড়ী ফিরে যা মুন্নু!

সঙ্গে সঙ্গে সে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে।

রতন! রতন!—মুন্নু আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু উন্মাদ কলরবের মধ্যে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবে যায়!

টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সে আর্ত দৃষ্টিতে খোঁজে, হরি কোথায়!

এমন সময় পেছন থেকে লাঠী হাতে এক ভীমকায় পাঠান হেঁকে উঠলো, তুই হিন্দু না মুসলমান?

মুন্নু এক নিমেষের মধ্যে কাঠের পুতুলের মত স্থির আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার মনে হয় যেন স্বয়ং যমরাজ তাকে নিয়ে যাবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। একবার মনে হলো চীৎকার ক'রে সে ডাকে···ডাকবার জন্যে হাঁ করলো বটে কিন্তু গলা থেকে কোন শব্দ বেরুলো না। আপনা থেকে চোখ বন্ধ হ'য়ে যায়, আবার আপনা থেকে খোলে। সেইটুকু সময়ের মধ্যে সে ঠিক ক'রে নেয়—টেবিলের ওপর থেকে ডান দিকে লাফিয়ে পড়ে···পাঠানটা তখন লাঠি তুলেছে। লাফিয়ে পড়েই মুন্নু শোনে, তার বরাদ্দ লাঠী টেবিলের ঘাড়েই পড়লো। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কোন রকমে ভিড় ফুঁড়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে···তখন দলে দলে প্রাণভয়ে যে-যার ঘরের দিকে ছুটেছে। মুন্নু তাদের দলে মিশে যায়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠলো, মাসের পর মাস এই পাঠানগুলো ছেলে চুরি ক'রে বেড়াচ্ছে···

কে যেন সে-কথা সমর্থন করলো, মনে করেছো মিলের মালিকরা জানে না? সব জানে তারা। তারাই তো ওদের আস্কারা দেয়··আর সরকার তলে তলে যোগ সাজস্ করে।

—নিশ্চয়ই! পাঠানরা হামেশা চোখের সামনে মোটরে ছেলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর সরকার তা বন্ধ করবার কোন ফিকিরই করে না। ছেলে-পুলে ঘরে রেখে কাজ করতে আসা দায় হ'য়ে উঠেছে!

ট্রেড য়ুনিয়নের একজন কর্মী বলে ওঠে, পাঠানরাই তো আমাদের শত্রু। গত বছর তেল-কলের ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্যে মিলের মালিকরা দুশো পাঠান আনিয়েছিল—তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার!

মুন্নু তাদেরও ঠেলে এগিয়ে চলে। তাদের গলির মুখে এসে দেখে, সেখানেও মারামারি সুরু হ'য়ে গিয়েছে।

নিরুপায় হ'য়ে সে ফিরে সহরের রাস্তা ধরে। এ-গলি সে-গলি দিয়ে ভেণ্ডিবাজারে এসে দেখে, একটা ছোট্ট মাঠে বহু লোক জড় হয়েছে।

মাঝখানে একটা কাঠের চৌকির ওপর একজন বেঁটে মোটা মতন লোক বক্তৃতা দিচ্ছে, হিন্দু ভাই সব ! যদি নিজেদের মা-বোনের ওপর কোন দরদ থাকে আপনাদের, তাহলে আর ঘুমিয়ে থাকবেন না ! উঠুন ! জাগুন ! আমাদের ঘর থেকে আমাদের বউ-ঝিদের ধরে নিয়ে গিয়ে খুন-জখম করছে, অপমান করছে. অথচ আমাদের মহামহিম সরকার বাহাদুর যখন সে-সব ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না, তখন হাতে লাঠী নিয়ে যে-যার বেরিয়ে পড়ুন। উলটে তাঁরা হুকুম জারী করেছেন, পাঁচজন এক জায়গায় হলেই গুলি চালাবেন। তাই আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের লাঠী-সোটা সরকার কেড়ে নেবেন, অথচ ওদের হাতে ছুরি-ছোরা তেমনিই থাকবে। এ সবের মানে কি ? এর একমাত্র সদুত্তর হলো, আমাদের মারাঠা-তেজ ভাল ক'রে আজ ওদের দেখিয়ে দিতে হবে !

একটা বন্ধ দোকানের পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মুন্নু লোকটাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে। দেখে লোকটার মাথার ওপর তখন একটা লাঠী পড়বার উপক্রম হয়েছে। সে আর চেয়ে থাকতে পারে না।

এমন সময় চীৎকার জেগে ওঠে, হেই·· হেই···খুন করলো···খুন করলো !

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত জেগে উঠলো, প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! মারো ! শালাদের খুন করো ! লুঠ করো···পুড়িয়ে দাও !

চীৎকার করতে করতে জনতা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

এমন সময় খাকি-পোষাকে একজন ইংরেজ পুলিস-অফিসার লাঠীওয়ালা বারোজন পাহারওয়ালা নিয়ে জনতার ওপর লাঠী চালাতে আরম্ভ করে। বেগতিক দেখে মুন্নু উল্টো রাস্তা ধরে। তার মাথার ভেতর যেন হাজারটা ভোমরা ঢুকে ভোঁ ভোঁ করছে। স্পর্শ না করেও সে বুঝতে পারে তার কপালের দু'ধারে দুটো রগ দপ্ দপ্ করছে। এই চোখের সামনে যে লোকটা কথা বলছিল, চোখের পলক না ফেলতে আবার যখন সে চেয়ে দেখলো, তখন সে-লোকটাকে আর সেখানে সে দেখতে পেলো না। এই হঠাৎ অন্তর্ধানের মানে কি, মৃত্যু ? আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যু ? —না, আর কিছু ? তার

চারিদিকে মনে হলো যেন মৃত্যুর ছায়া অন্ধকারে ছমছম্ ক'রছে। আপনার মনে প্রলাপের মত বকতে বকতে সে এগিয়ে চলে…অর্ধ-অচেতন…অন্ধের মত। চল্‌তে চলতে নিজেই সে প্রশ্ন করে, একি হলো? নিরুত্তর প্রশ্ন বারবার তার কাছেই ফিরে ফিরে আসে। চারিদিকে তার একি মৃত্যু-ঘন নীরবতা? ভয়ে তার চৈতন্য লুপ্ত হয়ে আসে। সে তো এতো ভীতু নয়? তবে কোথা থেকে এলো এই ভয়? নিজেকে আশ্বাস দেবার জন্যে সে নিজেই জোরে জোরে বলে, গাঁয়ে সবাই জানে আমার সাহসের কথা…কতবার নিশুতি অন্ধকারে একা শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি কই, তখন তো এমন ভয় করে নি? এখনই বা এত ভয় করছে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে রতনের কথা।

—এখন সে কোথায়? সত্যি, কি ক'রছে এখন সে? আর হরি? লক্ষ্মী হয়ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরেতে ঘুমুচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধকারে তার খুব কাছে কে যেন মর্মান্তিক চীৎকার ক'রে উঠলো …সেই সঙ্গে দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে এলো উন্মাদ চীৎকারধ্বনি, আল্লা হো আকবর! ভয়ে সে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। একটা ছোট্ট বাজারের কাছাকাছি এসে দেখে, কাঠের পা নিয়ে এক বৃদ্ধখঞ্জ ভিখারী প্রাণপণে ছুটছে… বগলে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলী…আর তাকে তাড়া ক'রে আসছে একজন মুসলমান পাঠান। সমস্ত বৃত্তি সংহত ক'রে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনে দিয়ে আর দু'জন মুসলমান লাঠী আস্ফালন ক'রতে ক'রতে এগিয়ে আসছিল। বুড়ো ভিখারীটা পেছনের তাড়ায় সামনে ছুটতে গিয়ে সেই দু'জনের একেবারে সামনে গিয়ে পড়লো। লাঠী দিয়ে সামনের দু'জন বুড়োকে আটকাতেই পেছনের পাঠানটা এসে সজোরে তার পাঁজরে ছোরা বসিয়ে দিল। হায় রাম! বলে বুড়ো সেইখানেই পড়ে গেল। পাঠানটা চীৎকার ক'রে উঠলো, কাফের! ইবলিসের বাচ্ছা! মর্ শালা!

বৃদ্ধ একবার শেষ চীৎকার ক'রে নীরব হয়ে গেল। আবার সেই নীরবতা… মুন্নু পেছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করলো। সমুদ্রের দিক থেকে ঝড়ো

হাওয়া তার পেছনে তাকে যেন তাড়া ক'রে আসে। আতঙ্কিত চিত্তে মুন্নু সেই ঝড়ের শব্দে মনে করে যেন উন্মাদ জনতা খোলা ছোরা হাতে তার পেছনে ছুটে আসছে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একজায়গায় এসে দেখলো, অন্ধকার লাল হয়ে উঠছে। সামনে একটা দোকান-ঘর পুড়ছে। একজন গুজরাটী ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর একজন বন্ধুকে সেদিকে যাবার জন্যে হাতধরে নিষেধ করছিলেন, দেখছো না মুলজী মাধবজীর মিষ্টির দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে · দোহাই তোমার, যেয়ো না ··এগোলেই মেরে ফেলবে!

কথাটা মুন্নুর কানে যেতেই সে আবার থমকে দাঁড়ায়। যদি কোন দোকানের আশে-পাশে কিম্বা কারুর বাড়ীর কোথাও লুকিয়ে থাকবার মত একটু জায়গা পাওয়া যায়!

এমন সময় সেই জ্বলন্ত দোকানের দিক থেকে তুমুল চীৎকার জেগে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল—সেই দিকেই তারা এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি মুন্নু একটা ছোট্ট গলির ভিতর ঢুকে পড়ে! কিন্তু বেশীদুর যেতে না যেতেই তার কানে আসে এক মর্মন্তুদ আর্তধ্বনি। দেখে, সামনের এক বাড়ীর বারান্দায় এক মহিলা দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে···চুল ছিঁড়ছে আর কেঁদে কেঁদে উঠছে, ওরে আমার বাছারে, কোথায় গেলিরে? আর কি ফিরে আসবি না রে?

মুন্নুর মনে হলো, স্ত্রীলোকটীর কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তাকে দেখে স্ত্রীলোকটী হয়ত' মনে করতে পারে যে তাকে খুন করবার জন্যেই সে এসেছে। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে, যে-পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথে আবার ফিরে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু দেখলো, পাঠানদের ভিড়ে গলি ভরে এসেছে। তারা রাইফেলের বাঁট দিয়ে বন্ধ দোকানের দরজা ভেঙ্গে ফেলে জিনিষপত্র লুট করছে · কেউ কেউ হাতের

ছোরা শূন্যে আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ভয়ে তার সর্ব-অঙ্গ হিম হয়ে আসে…ভুলক্রমে এ কোন্ গলিতে সে ঢুকে পড়েছে? এতো গলি নয়…এ যেন মৃত্যুর-গহ্বর। এমন সময় দেখে একদল পুলিশ তাদের তাড়া করছে। দেখতে দেখতে এক নিমেষের মধ্যে এত যে লোক কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। বারান্দায় বসে যে মেয়েটা কাঁদছিল, সে-ও সরে গিয়েছে। এখন আর এক নতুন ভয় তাকে পেয়ে বসলো, পুলিসের লোকেরা তাকে যদি দেখে ফেলে! হয়ত সোজা পেটের ভেতর দিয়ে বেয়নেট চালিয়ে দেবে! দেয়াল ঘেঁষে এ-দিক ও-দিক চাইতে চাইতে সে অগ্রসর হয়।

গলির বাইরে নেমে দেখে, বড় রাস্তার ওপরে তখন তুমুল উৎসাহে লড়াই চলেছে। একটা ট্রাম অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মুন্নু ছুটে গিয়ে তার আড়ালে আশ্রয় নেয়। আড়াল থেকে উঁকি মেরে যেই দেখতে যাবে, অমনি মনে হলো, পেছন দিক থেকে একটা হাত সজোরে তার ঘাড় টিপে ধরলো… সঙ্গে সঙ্গে পিঠে ঠিক মেরুদণ্ডের ওপর, কিসের যেন একটা নিদারুণ আঘাত এসে পড়লো…মাথা ঘুরে সে রাস্তায় পড়ে গেল।

শুয়ে পড়ে একবার শুধু সে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলো, স্পষ্ট দেখতে পেলো, তার সামনে দাঁড়িয়ে যমদূতের মত একজন মুসলমান পাঠান। আর বাঁচবার কোন আশাই নেই। চোখ বুঁজে সে মড়ার মতন পড়ে রইলো। পাঠানটা সজোরে একটা লাথি মেরে দেখলো, বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে। তারপর আবার 'আল্লা হো আকবর' বলে তার দলে গিয়ে ভিড়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে সোস্যাল সার্ভিস্ লীগের দু'জন স্বেচ্ছাসেবক তাকে ষ্ট্রেচারে ক'রে তুলে নিয়ে গেল।

রাত্রিতে মুন্নুর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সে দেখে, একটা ঘরে সে শুয়ে আছে, তার চারদিকে দাঙ্গার সব আহত লোক শুয়ে। খুব কাছেই কোথা থেকে একটা উৎকট দুর্গন্ধ আসছে। সেই বন্ধ ঘরে, ক্ষতবিক্ষত বিকৃত-দেহ সেই অসাড় মানুষদের মধ্যে তার দম যেন আটকে আসতে লাগলো। যা হয় হবে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সমুদ্রের ধারে যাবো, সেখানেই

রাত কাটাবো। এই স্থির ক'রে মুন্নু উঠে দাঁড়ালো। দেখলো, কেউ তাকে বাধা দিল না। সামনের দরজা খোলাই ছিল। নিঃশব্দে সে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো।

সূর্যের আলোর আঘাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একে একে গতদিনের বিভীষিকার কথা তার মনে পড়তে লাগলো। আজও কি শহরে তেমনি মারধোর চলেছে! আস্তে আস্তে সে শহরের দিকে এগিয়ে চলে। দেখে, পথে-ঘাটে যেমন লোক-জন চলাচল করে ঠিক তেমনিই সব চলছে। কোথাও কিছু হয় নি। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল?

এমন সময় দেখে এক পার্সী ভদ্রলোকের সঙ্গে এক পাহারাওয়ালার কথা হচ্ছে।

মুন্নু তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে শোনবার জন্যে একটু এগিয়ে গেল, যেন সে অনাথ ভিখারী বালক···গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা কুড়ুচ্ছে।

পাহারাওয়ালা বলে চলেছে, পুলিসের দিক থেকে ব্যাপারটা খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল যে, ছেলে চুরি সম্বন্ধে যে গুজব রটে ছিল, সেটা সর্বৈব মিথ্যে। পুলিসের তরফ থেকে সেই মর্মে বেতারে খবর ঘোষণা করা হলো কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে-ওখানে খুন-জখম চলতে লাগলো! সরকার থেকে সৈন্যদের কোন ব্যবস্থা করা হলো না। পুলিসের লোকেরাই সব ঘাঁটি আগলে হাঙ্গামা ঠাণ্ডা ক'রে দিল। আজ সকালে শহরের অবস্থা ভালই। কুলিরা অনেকেই যে যার কাজে ফিরে গিয়েছে।

মুন্নু ভাবে, তাহ'লে তো কারখানা খুলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে কাজ চলছে। তবে সে যাবেনা কেন? কারখানার দিকেই সে এগিয়ে চলে।

কিছুদূর যেতে না যেতে দেখে দু'জন কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক সাহেবী পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। তাদের মধ্যে একজন বলে যাচ্ছে, আর সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোকটী তাড়াতাড়ি তাই কাগজে

লিখে নিচ্ছে। মুন্নু বুঝলো স্বেচ্ছাসেবক দু'জন খবরের কাগজের রিপোর্টারকে দাঙ্গার বিবরণ দিচ্ছে।

এমন সময় একটা বৃহৎ মোটর গাড়ী সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। স্বেচ্ছাসেবক দু'জন ফিরে দেখে, মোটরের ভেতর নবাবী-পোষাকে সুসজ্জিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি।

তাঁকে লক্ষ্য ক'রে তারা অভিবাদন জানায়, বন্দে মাতরম্!

গাড়ীর ভেতর লোকটী কে তা মুন্নু জানে না, কিন্তু তার চেহারা দেখে সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবে।

গাড়ীর ভেতরকার নবাব বাহাদুর মুখ বার ক'রে বলে উঠলেন, বলি তোমাদের লীডাররা কি করছেন এখন? পুলিশ আর গভর্ণমেণ্টই বা কি করছে? তোমার যুব সঙ্ঘ—তারাই বা কোথায়? সারা রাত ধরে হিন্দুরা সবাই মিলে নিরীহ পাঠানদের মেরে শেষ ক'রে ফেল্লো অথচ কংগ্রেস সে-সম্বন্ধে কোন কিছু করা প্রয়োজন বোধই করলো না? যদি মিস মেয়ো এসে লিখতো, এখানকার লোক ছেলে চুরি ক'রে যজ্ঞে বলি দেয়, তা'হলে কি তোমরা মুখ বুঁজে সহ্য করতে?

স্বেচ্ছাসেবক দু'জন চুপ করেই রইলো। কিন্তু রিপোর্টার ভদ্রলোক মোটরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, মৌওলনা হজরৎ আলী সাহেব, আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ বেঁধে যাবে?

মৌওলনা সাহেব জবাব দেন, নিশ্চয়ই। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চলেছি।

এইবার একজন স্বেচ্ছাসেবক বলে ওঠে, কিন্তু কংগ্রেস তো একটা শান্তি কমিটী গড়ে তোলবার আয়োজন করছে!

মৌওলনা বলে উঠলেন, হাঁ, হাঁ শান্তি! মুখে তোমরা শান্তি বলো আর

ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের আয়োজন করো। যাও, কিং এড্‌ওয়ার্ড হাসপাতালে গিয়ে দেখে এসো, হিন্দু-আহতদের চেয়ে মুসলমান আহতদের সংখ্যা ঢের বেশী।

খবরের কাগজের রিপোর্টার সেলাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি পিট্‌টান দেয়।

মৌওলনা সাহেব লোকটাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, ওহে, শুনছো, আমি যা বল্লাম, তা যেন খবরের কাগজে ছেপোনা কিন্তু!

লোকটা তখন বহু দূরে চলে গিয়েছে।

মুন্নু আবার হাঁটতে সুরু করে।

কিন্তু ক্ষিদেয় তার দেহের ভেতরটা জ্বলতে থাকে। চলতে চলতে অবশ-দেহে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ পেছনে একটা মোটরের হর্ণ তীব্রভাবে বেজে ওঠে, পেছন ফিরে যেই লাফিয়ে রাস্তার ওপারে যেতে যাবে, তখনই মোটরের ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে যায়।

মোটর থেমে যায়। মোটরের ভেতর মিসেস্ মেন্‌ওয়ারিঙ বসে ছিল। চীৎকার করে উঠলো, উঃ, কি দুর্যোগ! জানি না বরাতে আর কি আছে! হোম থেকে যেদিন সবে এই দেশের মাটীতে পা দিয়েছি, সেইদিনই এই সব ব্যাপার! উঃ! কিছুক্ষণ আগে গিয়েছে দাঙ্গা…তারপরই এই একসিডেণ্ট! ছোঁড়াটা মরেনি বোধহয়?

তাড়াতাড়ি মোটর থেকে নেমে মেমসাহেব মুন্নুর হাতের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখে। হোমে ফার্ষ্ট-এড্ পরীক্ষায় ডিপ্লোমা পেয়েছিল।

—না…নাড়ী ভালই আছে।

মেমসাহেবের সঙ্গে তার ছোট মেয়ে সার্সি নেমে পড়েছিল।

—কি হবে ম্যামি?

—ছোঁড়াটাকে তো এখন গাড়ীতে তুলে নিই! এই অবস্থায় কেউ যদি দেখতে পায়, তা' হলে আমাদের ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলবে! এদের অসাধ্য কিছুই নেই! শফার! ছোঁড়াটাকে গাড়ীতে তোলো। শিগ্‌গির! আমাদের সঙ্গে ওকে সিমলাতেই নিয়ে যাব! আমার তো একজন চাকরও দরকার।

মেমসাহেবের শফারটী ছিল মুসলমান।

মুন্নুর কাছে গিয়ে সে বুঝলো ছেলেটা হিন্দু। সুতরাং তাকে তুলে গাড়ীতে নিতে তার কোন ইচ্ছাই ছিল না কিন্তু মেমসাহেবের হুকুম···নিতেই হবে। তাই কাফেরের অচৈতন্য দেহটা কোন রকমে তুলে নিয়ে সে গাড়ীর ভেতর শুইয়ে দিল।

মিসেস্ মেন্ওয়ারিঙ গাড়ীতে উঠে হুকুম দিল, তাড়াতাড়ি তাজ থেকে আমাদের লাগেজটা তুলে নিয়ে, শহরের এক ধার দিয়ে বেরিয়ে পড়ো। জল্দি!

মিসেস্ মেনওয়ারিঙের মোটর গাড়ী বোম্বের সীমান্ত ছাড়িয়ে যেতে না যেতে মুন্নু সুস্থির হয়ে উঠে বসলো।

সেখান থেকে সিমলা যেতে মোটরে দু'দিন লেগে গেল। তার মধ্যে মুন্নু কতকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

কিন্তু ভেতর থেকে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। একে একে তার মনে পড়তে লাগলো, কি ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে দিনগুলো কেটেছে। সেই সঙ্গে রতন, হরি, লক্ষ্মী সকলের মুখই একে একে তার স্মৃতিপটে জেগে ওঠে। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় সে একেবারে মুষড়ে পড়ে। হঠাৎ এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় যেন সে অথর্ব বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

সে নিজেকে অথর্ব ভাবলেও তার উদ্ধার-কর্তা মিসেস্ মেন্ওয়ারিঙ কিন্তু তাকে সে-চোখে দেখে নি। তা যদি দেখতো, তা'হলে আর তাকে মোটর ক'রে এই দূর পথ টেনে নিয়ে আসতো না। তার ছিপছিপে সাবলীল দেহ সহজ সরল মুখ-চোখ মেমসাহেবের অন্তর স্পর্শ ক'রেছিল। বিশেষ ক'রে তার চোখ দুটি, তরুণ কবির ভাবে-ভরা অর্থহারা নয়নের মত,—মিসেস্ মেনওয়ারিঙের বড় ভাল লেগেছিল।

মেমসাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করে, বাচ্ছা তোর বয়স কত?

পনেরো, মুন্নু জবাব দেয়।

মুন্নুর কাজল-কালো চোখের দিকে চেয়ে, মেমসাহেব দুগ্ধশুভ্র হাত খানি দিয়ে তার কালো কপালের ওপর আদর ক'রে মৃদু করাঘাত ক'রে খিল্ খিল্ ক'রে

হেসে ওঠে। আনন্দের হাসি। সে এই বয়সেরই একজন্ "বয়" খুঁজছিল্!

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ এক প্রাচীন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ পরিবারের মেয়ে: তার পূর্ব-পুরুষেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যুদ্ধ ক'রেছিল। তার ঠাকুর-মা ছিলেন ভারতবর্ষেরই মেয়ে এবং সেই সূত্রে তার দেহে রীতিমত ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত ছিল; কিন্তু ছেলেবেলায় কন্ভেণ্টে অন্য সব য়ুরোপীয় শিশুর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে, সেই ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে পাকা বিলাতী বলে জাহির করতে হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্ভেণ্টের অন্য সব মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ তাকে করতে হয়েছে কিন্তু কেউই তার নির্জলা বিলিতীত্বতে আশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। শেষকালে অবস্থা এরকম দাঁড়ায় যে সেই কন্ভেণ্ট তাকে ছেড়ে দিতে হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে "হোমে" গিয়ে তার এই কালা রক্তের অভিশাপ সে ধুয়ে মুছে আসবে। পাকা শাদা আদমী বলে পরিগণিত হবার তার এই দুর্বার সাধনায় প্রতিবন্ধক হলো তার জন্মদাতা পিতা; কারণ কন্যাকে বিলাতে চেল্‌টেনহাম্ লেডিস্ কলেজে পড়াবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না! এই নিয়ে পিতা এবং পুত্রীর মধ্যে রীতিমত মনোমালিন্য ঘটতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তখন সে তার বাসনা চরিতার্থ করবার পথ নিজেই খুঁজে বার করে। সেই সময় উল্‌মার বলে একজন জার্মান ফটোগ্রাফার রাজা রাজড়াদের মহলে বেশ নাম ক'রেছিল। মে, কুমারী অবস্থায় এই নামেই সে পরিচিত ছিল, উল্‌মারের স্কন্ধে আরোহণ করবার চেষ্টা স্বরু ক'রে দিল এবং তাতে কৃতকার্য হলো। যথাকালে উল্‌মারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু বিয়ের দু'বৎসর পরেই মহাযুদ্ধ স্বরু হয়ে গেল। উল্‌মার কারারুদ্ধ হলো। তখন মে'র কোলে একটী মেয়ে, সাহিত্য ঘেঁটে তার নাম রেখেছিল পেনেলোপি, আর একটী সন্তান তখন গর্ভে। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র-রূপে সেই গর্ভজাত সন্তান দেখা দিল।

স্বামীর অনির্দিষ্ট কারাবাসে সে দুঃখিত হলো বটে কিন্তু কোনদিনই সে স্বামীকে ভালবেসে তার দেহ-মন সম্পূর্ণ ভাবে দান করে নি, তাই এই আঘাতের

তীব্রতা খুব বেশী হল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই, জালিমপুর ষ্টেটের শিক্ষাসচিবের ওপর সে নজর দিল এবং সেখানকার একটা ছেলেদের স্কুলে একটা কাজ যোগাড় ক'রে নিল। যেখানে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্দার আড়ালে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, সেখানে তার মত সুন্দরী স্বাধীন-নারী যে অনায়াসেই রাজ-ষ্টেটের উচ্চপদস্থ অফিসরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না।

দেখতে দেখতে তার কালো কেশের ফাঁদে সেই ষ্টেটের সৈন্য বিভাগের একজন ক্যাপ্‌টেন, আগা রাজা আলী শাহ্‌ বন্দী হয়ে পড়লো। আলী শাহ্‌-এর চেষ্টায় উল্‌মারকে যথাবিধি ডাইভোর্স ক'রে, সে ক্যাপটেন-গৃহিনী হয়ে তার ঘরে ঢুকলো! আলী শাহ্‌ সত্যই তাকে ভালবাসতো এবং হয়ত তাকে সব রকমেই সুখী করতে পারতো, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মের মনে সেই আদিম বাসনা জেগে উঠলো, তাকে পাকা শাদা-আদমী হতেই হবে...! খাঁটী ইংরেজ-রমণী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এই চিন্তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার নিদারুণ চিত্ত-বিক্ষোভ দেখা দিতে লাগলো। দেশী স্বামীর ধৈর্য পরীক্ষার জন্যে সে প্রথমে গোপনে, তারপর সদরেই ইংরেজ সৈনিকদের ব্যারাকে যাতায়াত সুরু ক'রে দিল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে আলী শাহ্‌ প্রহার ক'রে তাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিল।

মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেলেও, সে এই পরিণতিই চাইছিল! কারণ রয়েল ফুসিলিয়াস' রেজিমেন্টের একজন তরুণ অফিসরের সঙ্গে সে তখন বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিল। এই অফিসরটীর নাম গাই মেনওয়ারিঙ, তার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট...সে জানতো, একজন বুড়ো পাকা ঝুনোকে ব্ল্যাক-মেল করার চেয়ে, অল্প বয়সের ছোকরাদের ব্ল্যাক মেল করা অপেক্ষাকৃত সহজ! আলী শাহ্‌-র গৃহে থেকে বিতাড়িত হয়ে সে গাই-কে একদিন কানে কানে জানিয়েছিল, তার গর্ভে যে সন্তানটী এসেছে, নিঃসন্দেহে সে তারই বীর্যসম্ভূত! গাই মেনওয়ারিঙের বিলিতী শিভাল্‌রী তাতে বিন্দুমাত্র দমে গেল না।

বিবাহের পর স্থির হলো, হোমে তারা 'হনিমুন' উদ্‌যাপন করবে। ছ'মাসের ছুটি নিয়ে স-বৎসা নব-বধূকে সঙ্গে ক'রে গাই লণ্ডনে এলো, সেখানে মিসেস মেনওয়ারিঙ নব-তম স্বামীকে একটী কন্যা-রত্ন উপহার দিল। কন্যাটীর গায়ের রঙ গাই যতখানি শুভ্র হবে বলে আশা করেছিল, কার্যত তা হলো না। এবং মেয়েটী একটু বড় হতেই গাই দেখলো, মেয়ের মুখের গড়ন তার চেয়ে আলী শাহ্-এর মুখের সঙ্গেই বেশী মেলে। এবং একদিন যখন স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমত ঝগড়া হচ্ছিল, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ রাগের মাথায় সে-কথা নিজের মুখেই স্পষ্ট স্বীকার করলো...জানিয়ে দিল যে গাই-এর সন্দেহ অমূলক নয়। গাই-এর বাপ-মা ইংলণ্ডের উচ্চস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসল নীল-রক্ত-ওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁরা পুত্রের ভারতীয় ভ্রান্তির কথা জানতেন এবং সেইজন্যে পুত্রকে তাঁরা আর গ্রহণ করেন নি। গাই একেবারে নিঃসঙ্গ সমাজ-চ্যুত হয়ে পড়লো। অসহায় শিশু যেমন মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ধারা সকল দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় স্ত্রীর আলিঙ্গনের মধ্যেই নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা করলো। তার তাজা বিলাতী-রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সে তার জাতের যা প্রধান বিশেষত্ব তা পেয়েছিল, অসট্রিচ পাখীর মতন বালিতে মাথা গুঁজে বাস্তবতার হাত এড়ানো। নিজের কর্তব্য কর্মের মধ্যে সে ভুলে গেল অতীতের ভ্রান্তির জ্বালা।

ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাই ঠিক করলো, সে পেশোয়ারে তার রেজিমেণ্টে ফিরে যাবে। কিন্তু মিসেস্ মেনওয়ারিঙ এত কাণ্ড ক'রে যে স্বর্গ-লোকে এসে পৌঁছিয়েছে, সেখান থেকে নড়তে কিছুতেই চাইলো না। তাই সে ভারতবর্ষে ফিরে না যাবার একটা অছিলা বার করলো, পলিটেক্‌নিক কলেজে সে যখন ভর্তি হয়েছে, তখন সেখানকার পড়া শেষ ক'রে তাকে একটা ডিপ্লোমা নিতেই হবে।

গাই তাতে বিশ্বাস করলো। নিজের মাইনের অর্ধেক স্ত্রীর নামে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে সে ভারতবর্ষে ফিরে এসে উপজাতিদের সঙ্গে লড়াই-এ ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ওধারে মিসেস্ মেনওয়ারিঙ সেই-টাকায় সিনেমা, হোটেল, কক্‌টেল পার্টি এবং নৈশ-ক্লাব্ উপভোগ ক'রে বেড়াতে লাগলো! বেস্-ওয়াটারে যেখানে সে থাকতো, সেখানে ভারতবর্ষ থেকে বহু-এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বসবাস স্থাপন করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের আর কোন যোগসূত্র ছিল না এবং স্বজাতির সঙ্গেও তাদের আর কোন সম্পর্ক রাখা তারা প্রয়োজন বোধ করতো না। সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সমাজ মহাসমাদারে মিসেস্ মেনওয়ারিংকে গ্রহণ করলো। তাতেই মেমসাহেব ধরে নিল যে এতদিন পরে সে পাকা ইংরেজ রমণী হতে পেরেছে, এবং তাতে আর কোন সন্দেহ তার থাকে না। কিন্তু এই সব অন্তঃসারশূন্য লোকদের সমাজে প্রতিপত্তি জাহির ক'রে তার কোন সুখই হয় না। এই সব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তাদের না আছে কোন বিশেষ কাল্‌চার, না আছে কোন বৈশিষ্ট্য ...যা অর্জন করেছে, তা পেতে তাদের আত্মাকে পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হয়েছে। তাই মিসেস্ মেনওয়ারিঙের দুরাকাঙ্খা জেগে উঠলো, সত্যিকারের সভ্যতার মধ্যে থেকে কিছু জীবনের রসদ সংগ্রহ করা। বোহিমিয়ার এক কবির সঙ্গে এক সভায় তার আলাপ হয়। আলাপের সূত্রপাত হয় অটোগ্রাফ খাতায় কবির নাম স্বাক্ষর নিয়ে এবং রক্ষিতা হিসাবে বোহিমিয়া যাবার নিমন্ত্রণে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যে-টুকু বিদ্যা সে অর্জন করেছিল, তাতে প্রত্যেক মিল-দেওয়া ছড়াকে সে কবিতা মনে করতো এবং প্রত্যেক অটোগ্রাফের ছবিকে মনে করতো আর্টের সৃষ্টি। যে কোন কবি বা চিত্রকর তাকে শয্যা-সঙ্গিনীরূপে অনায়াসেই পেতো...শুধু তাকে একটু স্বীকার করার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু তারপর দু'দিনের অলাপেই তারা বিরক্ত হয়ে যেতো...শুধু হলিউডের ছবির কথা আর তার নায়ক-নায়িকার অসম্ভব অবাস্তব গল্প ছাড়া তার মানসিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেবার মত তার আর কিছুই ছিল না। তখন তারা তাকে দেখলে পালিয়ে বেড়াতো।

গাই নিয়মিতভাবে, আদর্শ স্বামীর কর্তব্য-অনুযায়ী তাকে চিঠি লিখতো। তার কাছে ভারতবর্ষে চলে আসবার জন্যে আবেদন জানাতো। ছেলেমেয়েদের

লেখাপড়া শেখানোর ওজুহাতে সে আবেদন এড়িয়ে চলতো, অবশেষে একদিন তার কি সুমতি হলো, সে স্বামীকে লিখে জানালো, বড় ছেলেটির বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা ক'রে ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ভারতবর্ষে যাচ্ছে··· কিন্তু মাত্র এক বৎসরের জন্যে। তবে পেশোয়ারের গরমে সে থাকতে পারবে না।

চিঠি পেয়েই গাই সিমলা প্াহাড়ে আনান্‌ডেল পাড়ায় একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে ফেল্লো। পেশোয়ারের উত্তপ্ত পথে-প্রান্তরে সে রেজিমেন্টের সঙ্গে ঘুরে বেড়াক্···তার স্ত্রী যেন ভারত-গভর্ণমেন্টের শৈল-রাজধানীর স্নিগ্ধ শৈত্যের সব সুখটুকু পায়! মাঝে মাঝে দু'এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সেই সুখ-শৈলে গিয়ে উঠলেই হবে!

এই সিমলা-যাত্রার পথেই মিসেস্ মেনওয়ারিঙের সঙ্গে মুন্নুর দেখা।

[ষোলো]

মিসেস্ মেনওয়ারিঙকে মুন্নু এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে··· কিসের এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠে। মেমসাহেব তার শুভ্র কোমল হাত দিয়ে তার হাত ধরে, তার পিঠ চাপড়ায়, তার দিকে চেয়ে কি রকম ক'রে হাসে! কোন মেমসাহেব, মেমসাহেব কেন, কোন স্ত্রীলোকই ওভাবে এত কাছে থেকে তার সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গভাবে মেশেনি। মনে পড়ে শ্যামনগরে, যখন সে আরো ছোট ছিল, ছোট্ট শীলাকে দেখে তার দেহের ভেতর যেন কি রকম অস্বস্তি হতো···মনে পড়ে প্রভুদয়ালের স্ত্রীর কোলের ওপরও সে অনেকদিন বসেছে·· লক্ষ্মীকে ভালবেসেছে···কিন্তু আজ মেমসাহেবকে দেখে এবং মেমসাহেবের সংস্পর্শে তার মধ্যে অব্যক্ত যে চেতনা জেগে উঠছে, আর কোন দিন সে তা অনুভব করে নি।

তবে একথা ঠিক যে, তার ভীরু দরিদ্র চিত্তে, সে কোন বৃহৎ সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারতো না। তাই অর্ধভীত, অর্ধ-আনন্দিত চিত্তে সে শুধু

এইটুকু চিন্তা ক'রেই সুখী ছিল যে, তার বরাতেও এই সান্নিধ্যের সৌভাগ্য জুটেছে। মেমসাহেবের এই যে অযাচিত স্নেহ, এ শুধু দয়া, না, তা ছাড়া আর কিছু, সে ভাবতে পারতো না!

তাকে যে কি-কি কাজ করতে হবে, তা সে বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে বুঝতে পারে যে, সদাসর্বদাই মেমসাহেবের কাছাকাছি থাকতে হবে, যাতে ক'রে মেমসাহেব ডাকলেই সে হাজির হতে পারে এবং মেমসাহেব যা করতে আদেশ করবেন, তখনই তাই করতে হবে।

ভোর হতেই খানসামা আলা দাদ তাকে ডেকে তুলতো। তখন উনুন ধরাতে হতো। উনুন ধরলে তাতে মেমসাহেবের চায়ের জল চড়াতে হতো। আলা দাদ তখন মৌজ ক'রে শাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্যোগে তামাক টানতো।

তাড়াতাড়ি চা তৈরী ক'রে ট্রেতে সব জিনিস-পত্র গুছিয়ে, মুন্নু একবার আলা দাদকে দেখিয়ে নেয়—সব জিনিস ঠিক মত নেওয়া হয়েছে কিনা! তারপর সেগুলো নিয়ে মেম-সাহেবের শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হতে হয়।

ততক্ষণ হয়ত সার্সি ঘুম থেকে উঠে খাবারের জন্যে বায়না ধরেছে।

রাত দুটো কি তিনটের আগে মেমসাহেব ঘুমোতে যেতে পারে না, তাই সকাল বেলা মেয়ের চেঁচামিচিতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়…তন্দ্রাজড়িত চোখে মেয়েকে গালাগাল দিয়ে ওঠে। জোর ক'রে তাকে দাঁত মাজতে পাঠাতে হয়, নইলে ছোট হাজরী খেতে পাবে না, ভয় দেখাতে হয়। মেয়েও তেমনি দুরন্ত। মার কথা সাধ্যমত কানেই তোলে না। যা বায়না ধরবে, তক্ষুনি তাই চাই। অনেকদিন রাগে গস্ গস্ করতে করতে বিছানা থেকে উঠেই মেমসাহেব বেশ দু'ঘা মেয়ের পিঠে বসিয়ে দেয়—তারপর তাকে চাকরদের কাছে পাঠিয়ে দেয়! নিজে তাড়াতাড়ি একটা ময়লা সার্ট টেনে নিয়ে পা-জামার ওপরে কোন রকমে চাপিয়ে দেয়, তারপর মাইকেল আর্লেনের 'গ্রীন্ হ্যাট্' খানা খুলে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মুন্নু তখন বসবার ঘর, বারান্দা ঝাঁট দিতে সুরু করে। সামনেই বর্ষায়-ভেজা আনানডেলের সবুজ বনানী…বাতাসে পাইনের প্রাণদায়ী সুগন্ধ…

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ নীরবে চেয়ে দেখে, আপনার মনে মুন্নু কাজ ক'রে চলেছে, মনে ভাবতে চেষ্টা করে, ছেলেটা কি ভাবছে! ওরা কি সত্যিই কিছু ভাবে! ইচ্ছা যায়, ছেলেটাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, তার সঙ্গে একটু গল্প করে। কিন্তু সে তো চাকর! চাকরের সম্পর্কে এ-সব চিন্তা তার মনে আসে কি ক'রে? মেমসাহেব নিজেই বিস্মিত হ'য়ে ভাবে! সেই সঙ্গে মনে হয়, সে যেন নিজেই মাইকেল আর্লেনের নায়িকা আইরিশ ষ্টর্ম… জগতের সবাই তাকে ভুল বুঝছে!

নিজের মনেই সে নিজে বলে উঠে, জগৎ কেন বোঝে না, নারী কি ভাবে নিত্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, কখনো প্রেমে, কখনো ঘৃণায়, কখনো করুণায়, কখনো বা শুধু খেলাচ্ছলে, শতরূপে শতভাবে? কি অধিকার আছে জগতের তাকে বিচার করবার? আজ যদি আমি এই বালকটীর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করি, ক্ষতি কি তাতে! কেনই বা আমি তা পারি না?

মুন্নুর তরুণ সজীব দেহ-রেখার দিকে চেয়ে থাকতে, তার চপল দ্রুতগতি-ভঙ্গীর সহজ অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে, মেমসাহেবের মনের গহন গভীরে কি যেন অব্যক্ত চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। কিন্তু আইরিশ ষ্টর্মের মতই তার দেহ ছিল এক রাজ্যে… মনে কিন্তু বাঁধা আর এক রাজ্যে। তাই সিমলার আবহাওয়া, যে আবহাওয়াতে স্বভাবতই মানুষের মন আনন্দ-লোভী হয়ে ওঠে, তার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে উঠে পড়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে দীর্ঘ কালো কেশ এলিয়ে দিয়ে আঁচড়াতে সুরু করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নায় লক্ষ্য করে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা ক'রে শাদা দেখা দিয়েছে।

মেমসাহেবের প্রসাধন সম্পর্কে মুন্নুর একটা বিরাট কৌতূহল ছিল। তাই সে-সময় সে কোন না কোন কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে ঘুরতো ফিরতো।

—বয়, গোল কামরা থেকে আমার কাঁচিটা নিয়ে আয়! মেমসাহেব আদেশ করে।

কাঁচি নিয়ে মুন্নু যখন দেবার জন্যে হাত বাড়ায়, ইচ্ছে ক'রেই মেমসাহেব তার হাত চেপে ধরে,...

—ইস, কি নোংরা ছেলে! হাতে কি ময়লা লেগে দেখতো? হাতের নখগুলোও কাটতে পারনা? দেখি, আমি কেটে দিচ্ছি।

মুন্নু আত্মসমর্পণ করে।

মেমসাহেব অতি সন্তর্পণে তার সুকোমল হাত দিয়ে মুন্নুর আঙুল নাড়া-চাড়া করে, মুখে অর্ধ-বিকশিত স্নিগ্ধ হাসি। অন্যমনস্কতার ছলে ডান পায়ের ওপর থেকে সুকৌশলে দেহাবরণ সরিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে ইউ-ডি-কোলন সিক্ত রুমালটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ঘোরায়।

ক্ষৌরকার্য শেষ ক'রে মেমসাহেব মুন্নুর দিকে চেয়ে হেসে বলে ওঠে,

—সুন্দর ছেলে! দেখ দেখি, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! এখন একটা বউ হলেই হয়!

মেমসাহেবের সুকোমল স্পর্শে তখন মুন্নুর শরীরের ভেতর তরঙ্গ জেগে উঠেছে...সেই উষ্ণ সুবাসের মাদকতায় তার মস্তিষ্ক যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ...সেই একান্ত মধুর অস্বস্তির লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে মাথা হেঁট ক'রে থাকে...কিন্তু রক্তে তখন তার আগুন লেগে গিয়েছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হঠাৎ মেমসাহেবের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে সেই দুটী নরম রাঙা পা জড়িয়ে ধরে...ঘন চুম্বনে আর দুর্বার অশ্রুতে ভিজে যায় রাঙা পা।

মেমসাহেব চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠে পড়ে, লাথি মেরে মুন্নুকে সরিয়ে দেয়, সরু গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে, এত বড় আস্পর্ধা! বেয়াদপ্! শিগ্গীর উঠে কাজে যা...জলদি ব্রেক-ফাষ্ট লে আও! যাও!

মহা-অপরাধীর মত মুন্নু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চাকরদের ঘরে গিয়ে ওঠে, ভাবে, এ কি ক'রে ফেল্লো সে! কি ক'রে মেমসাহেবের সামনে সে

আবার মুখ তুলে দাড়াবে? যেতেই হবে ...ব্রেক-ফাষ্ট তৈরী...মেমসাহেবের এক্ষুনি চা দরকার!

ট্রে তুলে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

ছোট্ট সার্সি তার বিপদ বাড়িয়ে তুল্লো। খাবার দেবার জন্যে নীরবে সে টেবিল সাজাচ্ছিল...হঠাৎ শিশুসুলভ কৌতূহলে ছোট্ট সার্সি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো,—কাঁদছো কেন মুন্নু? ম্যামি বকেছে বুঝি?

মুন্নু কোন উত্তর দেয় না।

মিসেস্ মেনওয়ারিঙের ব্রেক-ফাষ্ট শেষ হতে লাগে প্রায় চার ঘণ্টা। ইংলণ্ডে থাকবার সময় তার ধারণা হয় যে, তার কোন কঠিন রোগ হয়েছে। নানা ওষুধ-পত্র খেয়ে যখন কোন ফল হলো না, কারণ আসলে কোন বিশেষ রোগই তো হয় নি, তখন একজন নেচার-কিওর বিশেষজ্ঞ উপদেশ দিলেন যে ওসব ওষুধ-পত্র বাজে...রোজ ব্রেক-ফাষ্টের সময় যদি তিনি অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না ক'রে শুধু ফল খান, তাহলে তাঁর সব রোগ সেরে যাবে। সেই ব্যবস্থা মেমসাহেবের কাছে রীতিমত বিজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক বলে মনে হলো, কারণ সারা সকালটা চেয়ারে বসে একটা একটা ক'রে ফল ছাড়িয়ে খেতে খেতে দুপুর এসে যেত...আপেল, বেদানা, ন্যাসপাতি থেকে আরম্ভ ক'রে খোলা-ছাড়ানো আটটী বাদাম পর্যন্ত, মেমসাহেবের ব্রেক-ফাষ্ট-টেবিলে বাজারের সেরা সব ফলই সাজানো থাকতো। এই ওষুধের ব্যবস্থার ফলে মেমসাহেবের অসুখ ভাল হয়ে উঠছিল, তাই এ ওষুধ পরিবর্তন করা সে আর প্রয়োজন বোধ করে নি।

ব্রেক-ফাষ্ট শেষ হতে না হতেই টিফিন এসে হাজির হতো।

সেদিন টিফিন সেরেই মেমসাহেব হুকুম করলো, আলা দাদ, রিক্সা বোলাও! তিন কুলি...চৌঠা কুলি মুন্নুকো জোড় দেও!

সিমলার উঁচু-নীচু পাহাড়ে-পথে চারজন কুলিতেই একটা রিক্সা টানে। এবং ভারতের এই শীত-রাজধানীর পথে রিক্সা গাড়ীই একমাত্র যান-বাহন্ শুধু সেই শৈলবাসী তিনজন ভাগ্যবান্ মোটর বা অশ্বচালিত অন্য যান ব্যবহার

করতে পারেন। বড় লাট, কমাণ্ডার ইন্‌-চীফ এবং পাঞ্জাবের গভর্ণর। এই তিনজন ছাড়া, আর কোন ব্যক্তিই, তিনি মহারাজাই হোন্ আর পার্লামেন্টের সভ্যই হোন্, সিমলার পথে রিক্‌সা ছাড়া অন্য কোন যান ব্যবহার করতে পারেন না।

কিছুক্ষণ রিক্‌সা টানার পর মুন্নু বুঝলো, ব্যাপারটা প্রথমে সে যা আন্দাজ করেছিল, মোটেই তা নয়। মোহন রিক্‌সাওয়ালার কাছে সে শুনেছিল, রিক্‌সাটানা রীতিমত একটা আর্ট। বহুদিনের কসরতের পর এই আর্ট আয়ত্ব করা সম্ভব। বহু জিনিস অভ্যাস করতে হয়, কি ক'রে দম ধরে থাক্‌তে হয়, কি ক'রে পায়ের কায়দায় 'ব্যালান্স' ঠিক রাখতে হয়, খাড়া নীচু নামবার সময় মোটরের ব্রেকের মত কি ক'রে পা দুটীকে ব্যবহার করতে হয়···একটু অসাবধানতা, একটু অপটুতার ফলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে।

মুন্নু তখন এ-সব কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন বুঝলো তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু দমবার পাত্র সে নয়। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার অপটুত্বকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ফলে, তার শ্বাস-যন্ত্রের ওপর অত্যাধিক চাপ পড়তে থাকে। হাঁপিয়ে ওঠে, যেন দম ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তবুও সে দমে না। সহকর্মীরা তার ঐকান্তিকতা দেখে, সাবাস্ দেয়, সাবাস্ ভাই, সাবাস্!

ক্রমশ রিক্‌সা "ম্যালে" প্রবেশ করে। দু'ধারে সুসজ্জিত সব দোকান··· মুন্নু দেহের শ্রান্তির কথা ভুলে গিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অগ্রসর হয়। নানাভাবে সজ্জিত বৃহত্তর জীবনের সেই সব মহামূল্য উপকরণ তার চিত্তকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। 'হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল', 'লরেন্স এণ্ড মেয়ো', 'সাহেব সিং এণ্ড কোং'···একে একে সকলের পাশ দিয়ে সে এগিয়ে চলে। দর্শকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করবার জন্যে প্রত্যেক দোকানে কাঁচের ভেতর থরে থরে সাজানো সব বিচিত্র উপকরণ···প্রত্যেকটী জিনিস যেন মুন্নুকে নাম ধরে ডাকে···মুন্নু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে···একটা দোকান পেছনে পড়ে যায়···আর একটা আসে···

ড্যাভিকোর হোটেলের সামনে মেমসাহেবের রিক্সা এসে থামে, সেখানে মেমসাহেবের চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।

মুন্নু গলা বাড়িয়ে, হোটেলের মুক্ত দরজা দিয়ে, ভেতরে কি হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করে, ইংরেজেরা নিজেদের মধ্যে কি করে, কি ভাবে চলে ফেরে, তা' দেখবার, জানবার, কৌতূহলের তার অন্ত নেই।

রিক্সা টানার কাজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার ফলে রাত্রিতে মুন্নুর জোরে জ্বর এলো।

ফেরবার সময়ই তার মনে হচ্ছিল, তার পায়ের হাড়গুলো সব যেন ভেঙ্গে গিয়েছে। ঘরে এসে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সমস্ত দেহ ঝিমঝিম করতে লাগলো। সে শুয়ে পড়লো। কিন্তু তাতেও কোন শান্তি দেখা দিল না। মনে হলো তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। উঠে, ঢক্ ঢক্ ক'রে এক কুঁজো জল খেয়ে ফেল্লো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন গলা শুকিয়ে এলো। হাত দুটো যেন আপনা থেকে দুমড়ে যাচ্ছে···দেহ থেকে পা দুটো ছিঁড়ে পড়ছে। শরীরের ভেতর রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে।

আলা দাদ বাজারে গিয়েছিল। বাজার থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে, অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে, মুন্নুর গায়ের ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, কে? কে এখানে?

মুন্নু কোন উত্তর দিতে পারলো না। শুধু অস্ফুট কাৎরানীতে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। আলাদাদ গায়ে হাত দিয়ে বুঝলো, জ্বর হয়েছে। মেমসাহেবকে খবর দেবার জন্যে ছুটলো।

মেমসাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে আর যাই হোক, সে-ও মা। দুটী অপগণ্ড শিশুর সে জননী। তার ছোট ছেলেটীর জ্বর হ'লে, সে যে-রকম ভীত, বিব্রত হয়ে পড়ে, মুন্নুর জ্বরের কথা শুনে তেমনি বিব্রত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি মুন্নুকে তুলে নিয়ে, দোতলায় যে-ঘরে তার ছেলে থাকে, সেইখানে তাকে শুইয়ে দিল। মুন্নু নিজে প্রতিবাদ করে উঠলো···সে চাকর···দোতলার ঘরে কি ক'রে সে শোবে!

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। যা তা ডাক্তার নয়, মেজর মার্চেন্ট, সিমলার হেলথ অফিসর, তাঁকেই নিয়ে আসা হলো।

মেজর মার্চেন্ট এসে যথারীতি রোগীকে দেখলেন, টেম্পারেচর নিলেন, ওষুধের ব্যবস্থা লিখে দিলেন। যথারীতি রোগীকে উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন, ডরো মত্, আভী আচ্ছা হো যায়ে গা!

কিন্তু চলে যেতে পারলেন না। মিসেস্ মেনওয়ারিঙ সম্পর্কে তাঁর তীব্র কৌতূহল জেগে উঠলো। একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী তার কালা নেটিভ্ চাকরকে কিসের জন্যে দোতলার ঘরে, তার নিজের ছেলের শয্যার পাশে, শুতে দিতে পারে?

মার্চেন্ট একজন ভারতীয় ক্রিশ্চান। ভারতবর্ষে সাধারণত যারা খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনেকেরই মত, তিনি ছিলেন একজন দেশী মুচীর ছেলে। একজন ইংরেজ মিশনারী দয়া পরবশ হ'য়ে শিশুকালে তাঁকে মিশনের আশ্রমে নিয়ে এসে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তারপর সেই পাদ্রীদের সাহচর্যে নানারকমের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে গায়ে গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলতে থাকেন। পড়বার জন্যে ইংলণ্ডে বাস করবার সময় ইংরাজ-সমাজে মেলামেশার ফলে ক্রমশ নিজেকে একজন পাকা ইংরেজ রূপেই তিনি ভাবতে অভ্যস্ত হবে পড়েন। এই বিশ্বাসের মূলে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে তাঁকে সাহায্য করে, প্রথম, ছেলেবেলা থেকে ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর ইংরাজী উচ্চারণটা দোরস্ত হয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়, ইংলণ্ডে কোন থিয়েটারের কোরাস্-দলের একটী মেয়েকে বিবাহ করবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটে, তৃতীয়, য়ুরোপীয় হাব-ভাব আত্মস্থ করবার তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তাই জীবনের আরম্ভ-মুখে বুদ্ধিমানের মত, নিজের মুচী নাম বদলে মার্চেন্ট ক'রে নিয়েছিলেন। তাই মিসেস্ মেনওয়া-রিঙের গায়ের রঙের দিকে চেয়ে তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁদের দুজনেরই গায়ের রঙের ঈষৎ মলিনতা একই রক্ত-মূল থেকে এসেছে।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরে এসেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটা কে, মিসেস্ ম্যানিঙ ?

—আমার চাকর···বোম্বেতে পেয়েছিলাম···হাঁ·· দেখুন···আমার নাম ম্যানিঙ নয়, মেনওয়ারিঙ, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ !

মেজর তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নেবার চেষ্টায় বলেন, মাপ করবেন ! আপনার খানসামা গিয়ে বল্লো, ময়না, না, কি, ঠিক বুঝতে পারলাম না··· তাই ধরে নিয়েছিলাম বোধ হয় ময়না নয়, ম্যানিঙই হবে !

—ভুলটা শুধরে নিন্ এবার···মেনওয়ারিং ! ঠিক মত উচ্চারণ করা একটু শক্ত বোধ হয় !

মেজর সে-প্রচ্ছন্ন আঘাত বুঝতে পারেন। বুঝেই এবার আরো স্পষ্ট ক'রে তিনিও প্রতি-আঘাত করেন, যাক আপনার নামটা উচ্চারণ করা কঠিন হলেও, আপনি কিন্তু খুব কঠিন লোক নন্ ! সিমলাতে অন্য যে-সব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, তারা একেবারে, যাকে বলে যাচ্ছেতাই ! তাই না ?

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ জবাব দেন, হবে !

কথাটা একটু পালটে নেবার জন্যেই মেজর জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কত-দিন সিমলাতে আছেন ?

—আমি মাত্র এই ক'দিন হলো হোম্ থেকে এসেছি !

—তাই নাকি ?

হোমের নামে মেজরের চোখ আনন্দে যেন জ্বলে ওঠে। মিসেস্ মেন-ওয়ারিঙ সেইটুকুতেই খুশী হয়ে উঠেন, একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ? বসুন একটা পেগ্ ইচ্ছা করেন যদি···

মার্চেন্ট চেয়ার টেনে জমে বসেন।

—তাহলে বলুন, হোমের এখন খবর কি ?

হোমের গল্প করতে করতে মিসেস্ মেনওয়ারিঙের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার সময় হয়ে এলো। নীচের তলায় ষ্টুয়ার্টদের ওখানে মেমসাহেবের ডিনারের নিমন্ত্রণ ! হঠাৎ একটু কথা বলতে গিয়ে তারা দু'জনেই দেখলো,

এত কথা তাঁদের দু'জনের মধ্যে বলবার আছে যে, এক-আধ ঘন্টার মধ্যে তা শেষ করা সম্ভব নয়। তাই মেমসাহেব আগামীকাল চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে বসলো। মেজর আনন্দে তা গ্রহণ ক'রে বিদায় নিলেন।

ততক্ষণ মুন্নু দোতলার ঘরে শুতে পাওয়ার অসম্ভব সৌভাগ্যে জ্বরের নিদারুণ যন্ত্রনা চুঁপটি ক'রে সহ্য ক'রে থাকবার চেষ্টা করছিল।

জ্বর থেকে সেরে উঠে মুন্নুকে সেই পুরানো চাকরীই করতে হয়...বাড়ীতে মেমসাহেবের খাস বেয়ারা—বাইরে, মেমসাহেবের চারজন রিক্সা-কুলীর মধ্যে একজন।

মেমসাহেবকে রোজই বাইরে বেরুতে হয়, চায়ের নিমন্ত্রণ, বাজার করা কিম্বা বায়ু-সেবন...যে কোন একটা কারণেই হোক! সিমলার মধুময় অলস জীবন তাঁর বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল।

তিনি বুঝেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ রমণীর পক্ষে ভারতবর্ষ হলো স্বর্গ-ভূমি। এতদিন ইংলণ্ডে থেকে সাধ্য সাধনা ক'রে তিনি যে তাঁর গায়ের ঈষৎ মলিন রঙটুকু ধুয়ে মুছে পাকা শাদা ক'রে এনেছিলেন, এখন দেখলেন, তা প্রভূত কাজে লেগেছে।

অপচয় করবার মত এখানে অফুরন্ত সময়, সুযোগ ও সুবিধা। কারণ, আজও পর্যন্ত জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র জায়গা যেখানে চাকর সত্যি সত্যিই চাকর...তাদের উপর নির্ভর ক'রে তুমি অনায়াসে সকালে চেয়ারে হেলান দিয়ে আর সারা দুপুর, বিকেল পর্যন্ত, ঘুমিয়ে কাটাতে পার, তোমার মুখের সামনে রান্না তৈরী ক'রে তোমার বয় এবং খানসামা তুলে ধরবে। ভারতবর্ষ একমাত্র জায়গা, যেখানে বাইরে থেকে তুমি ঘুরে এসে, বাড়ীতে ঢুকেই যেখানে সেখানে তোমার পোষাক-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার, এই বিশ্বাসে যে, তোমার চাকর তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভাঁজ ক'রে, ধূলো ঝেড়ে যথাস্থানে আবার ঠিক ক'রে রেখে দেবে। যদি ছিঁড়ে যায় তারাই রাত জেগে নিখুঁত ভাবে সেলাই ক'রে রেখে দেবে—

এখানে এখনও পর্যন্ত তুমি মাত্র এক শিলিং খরচ ক'রে সারাদিন ঘুরে বেড়াবার জন্যে একটা "পনি" ঘোড়া ভাড়া পেতে পার।

ঘণ্টায় মাত্র চার পেন্স খরচ ক'রে চারজন-মানুষে রিক্সা পাবে।

এক ডজন ডিম পাবে ছ' পেন্সে।

কাপড় পিছু এক ফার্দিঙ হিসেবে এখানে ধোপা সুন্দরভাবে তোমার কাপড় কেচে দেবে।

এখানে বসে তুমি প্যারিসের "লেটেষ্ট" ফ্যাসন দেখতে পাবে।

অবসর-বিনোদনের জন্য এখানে সুন্দর সুন্দর হোটেল, বড় বড় নাচ-ঘর, নাইট ক্লাব, সবই আছে।

এখানকার সিনেমায় পাবে তুমি হোলিউডের তাজা "রিলিজ" দেখতে।

ইচ্ছে করলে এখানে তুমি তিনটে কি চারটে ক্লাবের সভ্য একসঙ্গে হতে পার এবং পরের ঘাড়ে যত খুশী তত কক্‌টেল খেয়ে যাও, ডজন ডজন সিগারেট পোড়াও, কারণ এখানে তামাকের ওপর ট্যাক্‌স নেই···এক টিন প্রেয়ারের দাম মাত্র এক টাকা।

এখানে পাশ্চাত্যজগতের সমস্ত বিলাসিতা, সমস্ত সুখভোগের উপকরণ পূর্বজগতের কড়ির দামে বিকিয়ে যায়, তাই বিলেতের এঁদো গলির চুনো-পুঁটি এখানে মে-ফেয়ার আর পিকডেলীর বড় সাহেব।

অবশ্য, মিসেস মেনওয়ারিঙ এই স্বর্গ-সুখ যোল আনাই ভোগ করতে পেতেন না। মাঝে মাঝে রূঢ়ভাবে তাঁকে নিজের দেহের আলো-আঁধারীর দ্বন্দ্বে সচেতন হয়ে উঠতে হতো! শ্বেতাঙ্গদের য়ুনিয়ন জ্যাক ক্লাবে ভর্তি হতে গিয়ে সেদিন তা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন। সে ক্লাবের সভ্য হবার অনুমতি তিনি পেলেন না। তিনি যতই চেষ্টা ক'রে নিজে আসল-রঙকে লুকোবার চেষ্টা করুন না কেন, কানা-ঘুষোর হাত এড়িয়ে যাওয়া বড়ই ভাগ্যের প্রয়োজন। তবুও, সব জড়িয়ে, তিনি আনন্দেই ছিলেন!

ইতিমধ্যে মুন্নুও সেই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

বাইরে বেড়াবার সময় রিক্‌সাতে চড়ে, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ তাঁর ছোট মেয়েকে কানে কানে যখন বলতেন, ঐ দেখ, মেজর জেনারেল ক্রড্ হ্যারিঙটন যাচ্ছেন!···ঐ উনি হলেন, স্যার জীজীভাই ইসমাইল···চেম্বার অফ

কমার্সের প্রেসিডেণ্ট···ঐ লেডী রফ্‌ফী, স্যার এম্‌ রফ্‌ফী, ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য, তাঁর স্ত্রী,···ঐ পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ, কংগ্রেস-নেতা···ঐ লামডীর মহারাণী···তখন ছোট্ট সার্সি কি বুঝতো তা সেই জানতো, কিন্তু মুন্নু কান খাড়া ক'রে শুনতো···একটি কথাও যেন হারিয়ে না যায়···সেই এক নিমিষের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মহাপুরুষের ছবিই তার মনে গাঁথা হয়ে যেতো।

কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার আনন্দ-উৎসবের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে যখন বাড়ী ফিরে আসতো, তখন সে আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়তো। মনে হ'তো, এই পৃথিবীতে সে একা···আপনার বলতে কেউ নেই তার। সারাদিনের পরিশ্রমে পিঠটা কন্‌ কন্‌ ক'রে উঠতো—এক এক দিন এমন ব্যাথা ধরতো যে উঠতে বসতে পর্যন্ত কষ্ট হতো! একদিন থুতু ফেলতে গিয়ে দেখলো, থুতুটা লাল।

তা নিয়ে বিশেষ কিছু মাথা ঘামানোর যে প্রয়োজন আছে, তা তার মনেই হলো না। রান্না ঘরে গিয়ে যথাসাধ্য আলা দাদকে সাহায্য করে। কারণ আজকাল মেজর মার্চেণ্ট প্রায় প্রতিদিনই ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন।

মাঝখানে মাত্র এক সপ্তাহের ছুটিতে মেনওয়ারিঙ বাড়ী এসেছিল। আসবার সময় সাহেব পেশোয়ার থেকে একটা মস্ত বড় খরমুজা নিয়ে এসেছিল। মুন্নুকে সাহেব নিজে তা থেকে খানিকটা খেতে দিয়েছিল। সাহেবদের সম্পর্কে মুন্নুর যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছিল, তাতে সে ধরে নিয়েছিল, সাহেবেরা বোধ হয় হাসে না। কিন্তু মেনওয়ারিঙ সাহেবকে দেখে তার সে-ভুল ভেঙ্গে গেল। সাহেব না হেসে তার সঙ্গে কথা বলতো না! মুন্নুর বড় ভাল লাগতো। সারা মন দিয়ে সাহেবের কাজ ক'রে সে বোঝাতে চেষ্টা করতো সাহেবকে তার কতখানি ভাল লেগেছে। কিন্তু সাহেব কি তা বুঝতো? মুন্নু মনে মনে ভাবে, অন্য সব সাহেবগুলো মেনওয়ারিঙ সাহেবের মত নয় কেন? তবে এই সাতদিনের মধ্যে গোড়ার দিকে সাহেবকে যতখানি হাসিখুশী দেখেছিল শেষ তিনদিন কিন্তু সাহেবকে আর সে-রকম দেখা

গল না। কেমন যেন ভার-ভার, বিমর্ষ। মুন্নু তার কারণ বোঝবার আগেই সাহেব আবার চলে গেল।

মার্চেন্ট সাহেবকে সে দুচোখে দেখতে পারতো না। মার্চেন্টও তাকে দেখলে খিঁচিয়ে উঠতো। এসে যদি দেখতো, মুন্নু মেমসাহেবের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করছে, অমনি রেগে তেড়ে উঠতো। সে এলে মুন্নুর আর গোলঘরে ঢুকবার হুকুম ছিল না। তা'ছাড়া, বেড়াবার সময়, সাহেবটা অকারণে রিক্সাওয়ালাদের, বিশেষ ক'রে তাকে খাটিয়ে মারতো। সাহেব ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যেতো। ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের রিক্সা টানতে হতো। মুন্নুর বুকে চাড় লাগতো। দম একেবারে ফুরিয়ে যেতো। সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকতো।

একদিন মেমসাহেবকে নামিয়ে তারা রিক্সার আড্ডায় বিশ্রাম করছে।

মুন্নুকে দেখেই আড্ডার একজন কুলী ঠাট্টা ক'রে বলে উঠলো, এই যে মেমসাহেবের কুলী এসেছেন!

মুন্নু তাদের সঙ্গে বচসা করতে গিয়ে থেমে যায়।

অন্য আর একজন উপদেশ দেয়, ও-মেম সাহেবের কাজ তুই ছেড়ে দে! বাড়ীতে চাকরের কাজ করিয়ে নেবে—আবার রাস্তায় রিক্সা ঠেলাবে! এক পয়সায় ডবল মজা!

মোহন তার কথায় সায় দেয়, সেই জন্যেই তো ক্ষয়কাশে মরতে বসেছে, দেখছিস্ না, এই বয়সেই ওর চোখ কি রকম গর্তে ঢুকে গিয়েছে··· ফ্যাকাসে মুখ···

—দেখি, তোর নাড়ী আছে, না নেই, একজন হেসে বলে ওঠে।

—রেখে দে তোদের ঠাট্টা, ভাল লাগে না···দেখি একটা সিগারেট! মুন্নু হাত বাড়ায়।

সেদিন রাত্রি-ভোর তার কাশির শব্দে আলা দাদ ঘুমাতে পারলো না।

মুন্নু মাফ চেয়ে বলে, সন্ধ্যাবেলায় আড্ডায় একটা সিগারেট খেয়েছিলাম··· সেইজন্যেই···

পরের দিন দাঁত মাজবার সময়, সে দেখলো কাশতে গিয়ে খানিকটা রক্ত পড়লো। আসা দাদ এবং হয়ত' তার নিজের কাছ থেকেও লুকোবার জন্যে, সে তাড়াতাড়ি এক মুঠো ছাই নিয়ে এসে তার ওপর চাপা দেয়। সারাদিন কাজের মধ্যে যতই সে ভুলতে চেষ্টা করে, ততই সেই একটুখানি রক্ত তাকে উন্মাদনা ক'রে তোলে। কল্পনায় নানারকম বিভীষিকা দেখে আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তবে কি মোহন যা বলেছিল তা সত্যি? সত্যিই কি আমি মরতে বসেছি? ক্ষয়কাশ কাকে বলে তা সে জানে না···মনে মনে ঠিক ক'রে নেয়, এই যে বুকে ব্যথা, আর এই রক্ত···হয়ত' এই হলো ক্ষয়কাশ।

একবার তার মন বলে ওঠে, হ্যাঁ, এই ক্ষয়কাশ···

আবার সেই সঙ্গে মন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, না, তা নয়···বিড়ি আর সিগারেট খেয়ে গলায় ঘা হয়েছে···এই রক্ত সেই গলার ঘা থেকে এসেছে।

গত তিন বছরের মধ্যে এমন অনেক সময় হয়েছে, যখন সে ভেবেছে, মরলেই ভালো···কিন্তু আজ যখন সর্বশেষের সুনিশ্চিত বাণী নিয়ে মৃত্যুর মহা-জিজ্ঞাসা বড় বড় অক্ষরে তার সামনে ফুটে উঠলো তখন অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে সে বলে উঠলো, না, না, আমি মরতে চাই না! মরতে চাইনা!

সত্যমিথ্যা কাকে জিজ্ঞাসা করবে? অনেক ভেবে চিন্তে তার হঠাৎ মনে পড়লো রতনের কথা···তাকে সব কথা সে নিজে জানাবে···তার উপদেশ চেয়ে পাঠাবে। সেই অসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ক্রমশ সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, একটা যা হোক কিছু করতে হবে! যে রতনের কথা, সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল, তাকেই চিঠি লিখবে সে···সে তার পুরানো বন্ধু···আর রতন যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে তারই বা মরতে আপত্তি কি থাকতে পারে? আর পালোয়ান যদি বেঁচেই থাকে, চিঠি পেলে নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করতে সে আসবে।

সেদিন সকাল থেকে মেমসাহেবকে বড়ই উতলা দেখাচ্ছিল। লাট-সাহেবের বল্-নাচে মেম-সাহেব যাবে, তারই আয়োজন চলছিল। মুন্নুকে

তাড়াতাড়ি পাঠালো দরজীর বাড়ী, চীনা-মুচী হোওয়াঙের কাছে এবং সেই সঙ্গে মার্চেন্ট সাহেবের কাছে! ফেরবার পথে পোষ্টঅফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সে রতনকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলো। চিঠির শেষে জানালো, বোম্বে ফিরে যাবার জন্যে সে সত্যিই ব্যাকুল।

মার্চেন্ট সাহেব আবার মুন্নুকে পাঠালো পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের মিঃ দাসের কাছে একটা জরুরী চিঠি দিয়ে। যেমন ক'রে হোক, বড়-লাটের নাচে প্রবেশাধিকারের জন্যে তাঁকে একটা টিকিট জোগাড় ক'রে দিতেই হবে।

মুন্নু যখন কাজ সেরে ফিরছিল তখন সিমলার পাহাড়ের মাথায় মাথায় বর্ষার কালো মেঘ থরে থরে জমে উঠছিল। বাংলো আর প্রায় একশো গজ দূরে, এমন সময় মাথার ওপর ঘন কালো মেঘে বজ্র ডেকে উঠলো। বারান্দায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত বর্ষার ধারা নেমে এলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে চল্লো বর্ষণ...মুহুর্মুহু বজ্রের নির্ঘোষে পর্বত-ভূমি অনুরণিত হয়ে ওঠে...বিদ্যুৎ ঝিলিকে সিমলার শ্যাম অরণ্যানী সেই বর্ষাঘন-অন্ধকারে বড় অপরূপ লাগে মুন্নুর চোখে।

তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিক থেকে বাতাস এসে মেঘগুলোকে প্রান্তরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে বন্যাপ্লাবিত শতদ্রু পড়ে আছে যেন গলিত রৌপ্যের সমুদ্র।

দু' তিন ঘণ্টা বিরামের পর আবার সেই বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ আর বজ্র। এমনি চলে তিন দিন ধরে। বদ্ধ ঘরে অসুস্থ দেহে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন।

আকাশ একটু পরিষ্কার হলে, মুন্নু রিক্সার আড্ডায় বেরিয়ে পড়লো, মোহনের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে। একটু সহানুভূতি, একটু স্নেহের স্পর্শের সংগোপন লোভ!

মোহন তখন তার কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প-গুজব করছিল। আরো দশ বারোজন কুলি সেখানে জমায়েত হয়েছে, কেউ কেউ খেতে বসেছে, কেউ বা শুয়ে পড়েছে।

মুন্নকে দেখে দু'জন বলে উঠলো, আরে এসো, এসো!

মোহন একটা চট পেতে দিল। মুন্নুর মনে হলো, বুড়ো কুলিরা যেন তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে।

চারদিকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে মোহনকে সে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার মোহন ভাই? এত পিঠের ছড়াছড়ি যে?

মোহনের জবাব দেবার আগেই একজন কুলী বলে উঠলো, আরে, মেম-সাহেবের চাকর হয়েছিস্ বলে কি, দেশের পাল-পার্বন ভুলে গেলি? আজ যে ঝুলন!

মোহন মুন্নুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে ওঠে, ওদের কথায় কিছু মনে করিস না! সব খুইয়ে ওরা মুখ-সর্বস্ব হয়েছে!

সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আর একজন কুলী বলে ওঠে, যে যাই হোক ভাই! আমার কথাটা ভুলো না কিন্তু! আমার বিয়ের দরুণ চৌধুরীর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার ক'রে দিতেই হবে!

মোহন বলে, মিছিমিছি আর টাকা ধার করো না! শেষকালে তো পেট-মোটা মহাজনের গোলাম হয়ে থাকতে হবে! আর তোর বিয়ে করবারই বা দরকার কি? বিয়ে করেই তো বউকে ফেলে এখানে ছুটে আসবি রিক্সা টানবার জন্যে? শরীর যা হয়েছে, তাতে যে-কোনদিন স্রেফ পড়ে মরে যাবি।

মোহনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আর একজন কুলী বলে ওঠে, যা বলেছিস্! বলি, তোর শরীরে আছে কি, যে বিয়ে করবি?

সকলে হেসে ওঠে।

যাকে নিয়ে হাসি সে মুখভার ক'রে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে করবো কি?

মোহন বলে, বাড়ী ফিরে যা! আমার কথা শোন, বাড়ী গিয়ে জমিতে চাষ করগে যা!

—জমি নেই···জমি তো আগেই বাঁধা পড়ে গিয়েছে!

—তা'হলে চল্, সবাই মিলে গিয়ে জমিদারকে সরিয়ে জমিটা আগে দখল করি! আমি তোদের বোঝাতে চাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জিনিস

তোরা তৈরী করবি, সে-জিনিসে তোদের অংশ আছে, সে অংশ তোদের দাবী ক'রে আদায় করতে হবে !

মোহনের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে অন্য আর একজন কুলী বলে ওঠে, ও-সব ধার-করা বড় বড় কথা রেখে দে তোর ! আমরা এইখানেই আসবো, কাজ করবো, হুঁকো টানবো, তাস খেলবো আর ভাড়া পেলে, মরতে মরতেও রিক্সা নিয়ে ছুটবো !

মোহন চীৎকার ক'রে ওঠে, তোরা তাহলে চাস্ যে ওরা তোদের মেরেই ফেলুক ! কে তোদের বাঁচাতে পারে বল্ ! তোদের মাথাতে পেরেক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেও তোরা বুঝবি না !

গায়ের ছেঁড়া কাঁথাটা ভাল ক'রে মাথা থেকে পা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ঘুমাবার জন্যে পাশ ফিরে একজন কুলী ঠাট্টা ক'রে বলে ওঠে, তা'হলে বাবা, আজ নয়, কাল সকাল থেকে তোর কাছ থেকে পড়া নেবো !

হঠাৎ মুন্নুকে ডেকে মোহন বলে, তুই একটু বোস্, আমি আসছি এক্ষুনি !

বলেই মোহন উঠে পড়ে। সেখানকার আবহাওয়া মুন্নুর ভাল লাগে না।

যে কুলীটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল, সে পাশ ফিরে আবার বলে ওঠে, আচ্ছা, মোহন ওস্তাদ, তুই বল তো···

মুখ খুলে যখন দেখে মোহন সেখানে নেই, সে আর কথা শেষ করে না।

—চলে গেছে তো ! আচ্ছা পাগলা ! কি যে করে কিছু বুঝে উঠতে পারি না ! বলে বিলেত গিয়েছিল···বিদ্বান···তবে আমাদের সঙ্গে মিশে রিক্সা টানে কেন ?

সে-কথার উত্তর একজন বুড়ো কুলী দেয়, মস্ত বড় ঘরের ছেলে...পয়লা জীবনে খুব উড়িয়েছে···তাই এখন তার প্রায়শ্চিত্তি করছে, বুঝলি ? ও আমায় একদিন বলেছিল, মানুষের সঙ্গে মিশতে ওর আর ভাল লাগে না! তাই মানুষ থেকে তফাৎ থাকে! মানুষের মধ্যে কি করে সাচ্চা মানুষ হওয়া যায়, ও তার ফিকিরে আছে।

মুন্নু অবাক হয়ে শোনে !

অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, কি আশ্চর্য !

কাঁথা-মুড়ি-দেওয়া কুলীটা কাঁথাটা টেনে নিয়ে বলে, অদ্ভুত!

—অদ্ভুত বলেই আমাদের সঙ্গে আছে···নইলে এতক্ষণ তো থাকতো সরকারের জেলে। ও যে-সব কাজ করে, সেই সব কাজের কাজীদের ধরবার জন্যেই সরকারের গোয়েন্দারা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এসব কথাও তোদের বলে নি কোনদিন?

ভয়ে ও বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে তারা জানায়, না!

—তাহলে নিশ্চয়ই বলবে একদিন—

এমন সময় একটা প্যাকেট হাতে ক'রে মোহন ফিরে আসে।

প্যাকেটটা মুন্নুর হাতে দিয়ে বলে এই ফলগুলো খাবি। এখানে তোকে খেতে দেবার মত কিছু নেই। বাজারেও যে আছে তা নয়। আমাদের জন্যে বাজারে যে-সব খাবার বিক্রী হয়, সেগুলো খাবার নয়, বিষ। রোজ কিছু কিছু ফল খাবি···আর অন্তত আধ সের দুধ। ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিস্···এখন ওঠ্···বৃষ্টি থেমেছে···এই বার বাড়ী পালা···সকাল সকাল শুয়ে পড়বি···

মুন্নু প্রতিবাদ করতে পারে না। ফলের প্যাকেটটা নিয়ে 'জয় দেব' বলে উঠে পড়ে। পথ চলতে চলতে তার মনে ঘুরতে থাকে এইমাত্র মোহন সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনে এসেছে। তার মন চলে যায়, বোম্বেতে, সেই কারখানার ধর্মঘটের দিন, মাঠে সেই তিন জন সাহেব যেদিন বক্তৃতা দিয়েছিল। মোহনও কি সেই সাহেবদের দলে? মোহনের কথা ভাবতে ভাবতে এক অপূর্ব স্নিগ্ধ উত্তাপ, শীতের দিনে উষ্ণ আবরণের মত, তাকে আবৃত ক'রে ফেলে।

[সতের]

এদিকে মেমসাহেবের বড়লাটের নাচে যাবার সময় হয়ে এলো। সেদিন সকাল থেকে মেমসাহেবের উৎসাহের উত্তেজনা মুন্নুকেও চঞ্চল ক'রে তুল্লো।

সাজসজ্জা সেরে মেমসাহেব উত্তেজনার বশে মুন্নুর সামনে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখাচ্ছে বল্‌তো?

মুন্নু নিজেকে মহা-সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে, চমৎকার, মেমসাহেব। অপূর্ব!

আজ পূর্ণ-উদ্দমে সে রিক্সা টানে। মেমসাহেবকে নামিয়ে দিয়ে ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দেখে, ঘামে গায়ের জামা ভিজে গিয়েছে।

যেখানে তারা বিশ্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিল, সেখান থেকে উৎসব-মঞ্জিলের দরজা দেখা যায়। মুন্নু বিস্ময়ে দেখে, বিচিত্র বেশে একে একে অভ্যাগতরা আসছে। কারুর কারুর সঙ্গে সুন্দর লাল ভেলভেটের পোষাকে ছোট ছোট ছেলে। মুন্নু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দুর থেকে ভেসে আসে ব্যাণ্ডের বাজনা, গড্ সেভ্ দি কিঙ্!

একজন কুলী সগর্বে বলে ওঠে, আমার সাহেব যে পোষাক পরে এসেছে, তার দাম জানিস্ কত? দু হাজার টাকা!

মুন্নুরও গর্ব করবার আছে। সে বলে, আমার মেমসাহেব যে ফ্রকটা পরে এসেছে, তারি দাম তিনশো টাকা!

মোহন চুপটী ক'রে এতক্ষণ বসেছিল। সে এবার বলে উঠলো, তার ওপর একটা টিকিট জোগাড় করতে…

মোহনকে শেষ করতে না দিয়ে প্রথম কুলিটা বলে ওঠে, তোর এসব ভাল লাগে না, না?

মোহন বলে, ওদের দেখে-শুনে ভাল লাগবার কিছুই পাই না। আমি ভেবে পাই না, যারা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে চায় না, তারাই আবার শুধু একদিন একবেলা শুধু একটুখানি মুখোমুখি হবার জন্যে কি ক'রে এত টাকা খরচ করে! আমাদের চেয়েও ওদের মধ্যে জাতিভেদের বেড়া ঢের কড়া ক'রে বাঁধা। যে মেম-সাহেবের স্বামী মাসে বারো শো টাকা মাইনে পায়, সে কখনো নিজে যাবে না পাঁচশো টাকা মাইনের স্বামী-ওয়ালা মেমসাহেবের দরজায়! আবার যার স্বামীর মাইনে পাঁচশো টাকা, সে ঘেন্নায় কথা বলতে চাইবে না অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যার স্বামীর মাইনে হয়তো দুশো টাকা। বড়লোকদের সমাজে ভালবাসা, বা প্রীতির কোন জায়গা নেই! তারা সত্যি

সত্যি কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে চায় না। এই যে দেখছো বছরে বছরে নাচের উৎসব বড়লাটকে করতে হয়, এ শুধু আংরেজ সরকারের ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি দেখাবার জন্যে। স্বামীদের প্রাণপণ পয়সা খরচ করিয়ে মেয়েরা যে-সব পোষাক দেহের সঙ্গে এঁটে পরে আসে, তার জ্বালায় তারা ঘেমে নেয়ে ওঠে। আঁট ট্রাউসারে আড়ষ্ট হয়ে পুরুষরাও পর-স্ত্রীর সঙ্গে যখন রসালাপ ক'রে বেড়ায় তখন পোষাকের পেছনেই সারাটা মন পড়ে থাকে। তারপর ঘণ্টা খানেকের উৎসব শেষ হয়ে গেলে ডেভিকোর হোটেলে চায়ের টেবিলে গর্ব ভরে তারা গল্প করে, ওঃ, কি অপূর্ব সাজ-সজ্জা…তখন তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, যদু পেটে কিল মেরে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকি…

প্রথম কুলিটা প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, এ সব কথা বল্লেই হলো? সাহেবদের জীবনের কথা তুই জানবি কি ক'রে রে?

—জানবো কি ক'রে? শোন্…একটা ব্যাপার বলি। আমার সঙ্গে এক মেমসাহেবের বেয়ারার আলাপ ছিল। মেমসাহেবের স্বামী সরকারের ফৌজে মস্ত বড় কর্ণেল ছিল…থাকতো জাম্বু হিলে। মেমসাহেবটা দেখতে ছিল খুব সুন্দরী, বয়স পঁচিশের কাছাকাছি…কর্ণেলের বয়স তখন পন্চান্নো—দেখতে যেমন কদাকার, তেমনি বিশাল…হাঁড়ির মতন একটা মুখ, দেখলেই ভয় করে। শুধু সমাজে মানসম্ভ্রম পাবে বলে মেমটা কর্ণেলকে বিয়ে করেছিল। বহুবার গোলাম, যে-বেয়ারাটার কথা বলছি, সে দেখেছে, কর্ণেল সাহেব যখন তার বিরাট বপু নিয়ে মেমসাহেবকে আদর করতে গিয়েছে, মেমসাহেব তখন মুখ ব্যাজার ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

…সকাল বেলা কর্ণেল অফিসে বেরিয়ে গেলেই মেমসাহেব মদ খেতে সুরু করতো। তারপর মাতাল অবস্থায়, গোলাম যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করতো, সেখানে এসে একদৃষ্টিতে তাকে দেখতো…গোলামের রীতিমত অস্বস্তি হতো, কারণ মেমসাহেবের গায়ে একটা আলগা পাতলা ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। কোন কোন দিন গোলামকে বিপজ্জনক সব প্রশ্ন করতো, বিয়ে হয়েছে কি না…মেমসাহেবদের তার কি রকম লাগে… এই সব…

তার উত্তরে একদিন সে বলেছিল, তাদের গাঁয়ে একটা মেয়েকে সে ভালবাসে কিন্তু তার মা-বাপ সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায় না। তবে একদিন সে নিজে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সেই মেয়েটাকেই সে বিয়ে করবে।

…একদিন গোল-কামরার ভেতরে গোলাম কাজ করছে…এমন সময় মাতাল অবস্থায় মেমসাহেব সেখানে ঢুকে পড়েই গোলামকে প্রায় জড়িয়ে ধরে। বলে, তুই যে মেয়েটাকে ভালবাসিস্, তার চেয়ে আমি হাজার গুণ ভাল! চেয়ে দেখ, আমার গায়ের রঙ…আমার স্বামী একজন কর্ণেল…যৌবনে আমিও একজন কবিকে ভালবাসতাম…তবে তার সঙ্গে বিয়ে হলো না…সে গরীব…কিন্তু তোকে আমি চাই।

…গোলাম জোর ক'রে মেমসাহেবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলে ওঠে, হুজুর, আমি জানতে চাই না, আপনি কর্ণেলের বউ কি, কার বউ… কবিকে ভালবাসতেন কি অন্য কাউকে ভালবাসতেন…তবে আমি আপনাকে ভালবাসি না!

…গোলাম বুঝেছিল, মেমসাহেবের কাছে ধরা না দিলে, মেমসাহেব নিশ্চয়ই একটা মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তাই গোলাম তক্ষুনি সেখান থেকে পালিয়ে আসে। মেমসাহেব তার পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে হামকো ছোড়্কে মত্ যাও…মত্ যাও গোলাম…

…সেইদিন থেকে গোলাম বুঝেছিল, ওদের বাইরের চটকের আড়ালে ভেতরে-ভেতরে ওরা কত অসুখী। আমিও সারা য়ুরোপ ঘুরে বেড়িয়েছি— সেখানে দেখেছি, বড় লোকদের জীবনে কিছু নেই…তারা শুধু চায় একটার পর একটা উত্তেজনা…উত্তেজনার ফেনায় ভেসে ভেসে তারা বেঁচে থাকে।

মোহনের কথা শুনে প্রথম কুলিটা এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে। বলে, সত্যি, ওদের এই নাচের মানেও বুঝতে পারি না! আরে, খালি একটা আওরৎকে ঠেলে ঠেলে এখানে ওখানে নিয়ে ঘুরে বেড়াও…আরে বাবা, একি নাচ?

মোহন বল্লে, এই নাচ, এ-হলো ওদের ভালবাসা-বাসি খেলা···তবে এখন আর ভালবাসা নেই···আছে শুধু খেলা। ভালবাসার মধ্যে আছে শুধু পরস্পরের গা ঘসাঘসি ক'রে শরীরকে একটু গরম ক'রে নেওয়া···যার ফলে বিছানার গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা হলাম নোংরা ময়লা লোক ···আমাদের বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে শুতে গেলে, একঘণ্টা ধরে পরের বউ-এর সঙ্গে গা গরম ক'রে নিতে হয় না। এই সব কর্ণেল, জেনারেল, রাজা-মহা-রাজাদের চেয়ে আমরা ঢের ভাল, ঢের বড়! তবুও আমরাই ওদের রিক্সা টেনে বেড়াই!

অন্য আর একজন কুলি বলে ওঠে, কিন্তু তুইও তো ওদের রিক্সা টানিস্?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই টানি! নইলে তোদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতাম কি ক'রে?

হঠাৎ বাগানের ভেতর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মুন্নু বলে ওঠে, দেখ, দেখ, কেমন জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মোহন বলে ওঠে, বেশী দেখো না···যা দেখতে চাও না, এমন অনেক কিছু দেখতে পাবে হয়ত তা'হলে।

মুন্নু উদাসভাবে বলে ওঠে, তাতে আর আমার কি! আমি তো চাকর! মেমসাহেব যা খুসী তাই করুক না কেন?

ক্লান্তিতে মুন্নু হাই তোলে।

মোহন তার নিজের গা থেকে চাদরটা খুলে মুন্নুর গায়ে জড়িয়ে দেয়—তোর অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না·· তোর এখন শুয়ে থাকা উচিত!

—না, না, আমি ঠিক আছি। বলে মুন্নু নিজেকে ঠিক ক'রে নেয় কিন্তু হঠাৎ গলাটা খুস খুস ক'রে ওঠায় কাসতে সুরু করে। কাসতে কাসতে হঠাৎ এক মুখ লোনা রক্ত থুতুর সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

মোহন চীৎকার ক'রে উঠলো, আমি কতদিন থেকে বলছি···সাবধান করছি···ছি···ছি···এই কি প্রথম উঠলো?

মুন্নু শুধু ঘাড় নেড়ে জানায়, না!

—কেন মেমসাহেবকে বলিস্ নি যে তুই আর রিক্সা টানতে পারবি না, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে ?

মুন্নু চুপ ক'রে থাকে। দেখতে দেখতে কুলীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে।

বড়লাটের প্রাসাদের দরজায়সশস্ত্র গার্ড সেই গোলমাল শুনে সজাগ হয়ে ওঠে ! হাঁকে, হু গোস্ দেয়ার ? একজন কুলী জবাব দেয়, হঠাৎ একটা ছেলের অসুখ হয়েছে সরকার।

গার্ড হুকুম দেয়, আইডিকং আসবার আগে, এখান থেকে তাকে সরিয়ে ফেল। মোহন মুন্নুকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলে.

...আমরা দুজনে চলে গেলাম...এখনই নীচে নামতে হবে, আমাদের আর তেমন দরকার নেই। তোরাই পারবি।

[আঠার]

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ উৎসব-শেষে রিক্সাতে এসে মুন্নুর খবর শুনে বিশেষ দুঃখিত হলেন। বল্ নাচে তিনি যা আশা ক'রে এসেছিলেন, তা হয় নি। লোকের গা ঘেঁষে উঁচুতে ওঠার ব্যাপারে মহাবিঘ্ন ঘটায় ভারতীয় দল...তারা তাকে একরকম কোণঠাসা ক'রে রাখে। মাত্র একজন ইংরেজ অশ্বারোহী অফিসার তার সঙ্গে নেচেছিল। ভেবেছিলেন ফেরবার মুখে মেজরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন। ব্রাণ্ডির বোতলে ডুবে উৎসবের ব্যর্থতার শোক ভুলবেন। কিন্তু মুন্নুর খবর শুনে তাঁর আর কিছুই ভাল লাগলো না।

মেজর এসে মুন্নুকে পরীক্ষা ক'রে যখন জানিয়ে গেলেন যে অবস্থা শোচনীয়, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ কেঁদে ফেল্লেন।

হেল্‌থ অফিসারের আদেশ ক্রমে মুন্নুকে ছোট সিমলার হাসপাতালে আলাদা ক'রে রাখা হলো। পাশাপাশি তিনটে ছোট কুঁড়ে ঘরে, তখন আর দু'জন কুলিও সেখানে চিকিৎসার জন্যে মজুত ছিল।

মোহন এসে তাকে দেখেশুনে যেতো।

সেখানে এসে আর একবার তার রক্ত উঠেছিল। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন কষ্ট তার ছিল না। তবে এত দুর্বল বোধ হতো যে উঠতে হাঁটতে পারতো না। সারাদিন বারান্দায় একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে চুপটী ক'রে শুয়ে থাকতো।

প্রথম প্রথম মিসেস্ মেনওয়ারিঙ ফল ও ফুল নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর পাশে বসে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। নানা রকম স্তোকবাক্যে তাকে উৎসাহিত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন, শিগ্ গির ভাল হয়ে উঠবে...অসুখ এমন কিছুই নয়...শরীরটা শুধু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে...ইত্যাদি

কিন্তু মনে মনে তিনি অনুভব করতেন, হয়ত, তাঁরই অমনোযোগিতার ফলে বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে...তাই যতদূর সম্ভব সদয় ব্যবহারে তিনি তাঁর ত্রুটী শোধবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সদয় হওয়ার পথেও প্রতিবন্ধক ঘটলো!

মেজর সাহব স্পষ্ট বারণ ক'রে দিলেন যে, এ-ভাবে রোগীর কাছে যাওয়া-আসা করা চলবে না...যদি তা সত্বেও তিনি যান তা হলে বাধ্য হয়ে তাঁকেও আলাদা বাস করতে হবে...ছোঁয়াছে রোগ সম্বন্ধে আইন মানতে সবাই বাধ্য।

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ চেষ্টা ক'রে মুন্নুর কথা মন থেকে মুছে ফেলেন... তাঁর মনের বেদনা নীরবে মনেই থেকে যায়।

মুন্নু ইদানীং মেজর সাহেবের সঙ্গে মিসেস মেনওয়ারিঙ-এর ঘনিষ্টতায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো। যখন তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো, বুঝলো মৃত্যু তাকে ডাক দিয়েছে, তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়লো মিসেস্ মেনওয়ারিঙের ওপর। মনে মনে তাঁকে ঘৃণাও করতে লাগলো। কিন্তু এখন রোগশয্যায় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জীবন ও মৃত্যুর সংশয়ের দোলায়, তার মনে হঠাৎ কি যেন ঘটে গেলো। সে যে একদিন মিসেস্ মেনওয়ারিঙকে ঘৃণা করেছে, সে-ধারণা টুকু তাকে পীড়া দিতে লাগলো। আজ সে চায় সকলকে ভালবাসতে, সকলকে ভাল দেখতে, সকলের কাছে

ভাল হতে। একদিন যখন দেহ সুস্থ, সবল ও সক্ষম ছিল, তখন তার তেজে যাকে সে ছোট দেখেছে, আঘাত করতে চেয়েছে বা করেছে, আজ স্তিমিত-তেজ দেহের ম্লান শক্তিতে তাদের সকলের কাছে আপনা থেকে তার মাথা নত হয়ে পড়লো···সকলকেই সে আজ সমান ভাবে স্বীকার ক'রে নিতে চায়।

এক অপূর্ব স্নিগ্ধ কোমলতায় তার মন আজ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে মুখ শুকিয়ে আসছে, চোখ যেন ক্রমশ কোটরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে···দৃষ্টি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে স্থধু চেয়ে থাকে···নিঃশব্দে অনুভব করে একটু একটু ক'রে যেন বাতিতে তেল কমে আসছে···শিখার আলো তাই ক্রমশ ম্লানতর হয়ে যাচ্ছে।

আর একবার খুব বেশী রক্তপাত হলো। সে ভীত হয়ে উঠলো কিন্তু ভোর বেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখলো, নিশ্বাস নিতে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

সে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। ক্রমশ তার নিশ্বাস আরো সরল ভাবে পড়তে লাগলো। তার বদ্ধমূল ধারণা হলো সে সেরে উঠছে।

মনে মনে সে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা চিত্র আঁকতে থাকে। বোম্বে থেকে রতন তার চিঠির উত্তর দিয়েছে। সেখানকার ট্রেড য়ুনিয়ানের জন্মে তার একটা চাকরী হতে পারে। চাকরী করার সঙ্গে সঙ্গে সে সেইসব নিষ্ঠুর মহাজন আর নির্মম পাঠানদের বিরুদ্ধে লড়বে। ক্রমশ শীত কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশা আর মাছির উৎপাতও কমে এলো···তার শরীরও যেন একটু একটু ক'রে সবল হয়ে উঠেছে। হয়ত শিগ্‌গীর সে উঠে দাঁড়াতে পারবে···বোম্বে যাবার জন্মে তৈরী হতে হবে!

হঠাৎ এই সময় আর একদিন আবার হলো রক্তপাত, সে ভেঙ্গে পড়লো··· বুঝি আর সে সেরে উঠবে না। একটু কাসি হলেই সে ভীত হয়ে পড়ে, প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে কাসি না আসে।

মোহন তেমনি আসা-যাওয়া করে। তার শয্যার পাশে বসে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সেইটুকু সম্বল্‌ আবার যেন আশা জেগে ওঠে।

মাঝখানে কয়েকদিন এলো বর্ষা। চারদিক ভিজে, অন্ধকার। সে ভিজে অন্ধকারে মন শুধু চলে যায় নিজের ভেতরে। টুকরো স্মৃতির ছবি…এলোমেলো…

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার বর্ষা চলে গেল, সূর্যালোকে হেসে উঠলো পাহাড়।

মুন্নুর শরীরও যেন সে-ক'দিনে অনেকখানি সেরে উঠলো। আশ্বস্ত হয়ে সে ভাবে, তাহলে, সত্যি সত্যি মরছি না…ভাল হয়ে উঠবো তাহলে!

এমন সময় আবার এলো বর্ষা! সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলো ভিজে বাতাসে মৃত্যুর আশঙ্কা।

ম্লান অবসন্ন দেহে, নিষ্প্রভ উদাস দৃষ্টিতে মোহনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে মুন্নু…অসহায় ভাবে তার কোল ঘেঁষে গিয়ে শোয়…যেন ওর স্পর্শে আছে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ।

মোহন আশ্বাস দেয়, ভয় কি ভাই মুন্নু…তুইতো ভীরু নোস্! আমরা সবাই লড়নেওয়ালা।

মুন্নু জোর ক'রে মোহনের হাত আঁকড়ে ধরে…যেন তার দেহ ভেদ ক'রে তার শিরায় প্রবহমান উষ্ণ রক্ত ধারার স্পর্শ সে পেতে চায়…দূর-সমুদ্রে অপসৃয়মান তরঙ্গ-ধারার দিকে ব্যাকুল আগ্রহে সে হাত বাড়ায়…

তারপর একদিন, শ্বেতাবগুণ্ঠনে আবৃত এক মায়ারাত্রির শেষে, প্রভাতের প্রথম আলোকে সে শুরু করলো তার শেষ-যাত্রা…

জীবনের ক্লান্ত তরঙ্গ ক্ষণকালের জন্যে তটভূমিতে আছড়ে প'ড়ে ফিরে গেল আবার মহাসমুদ্রের অতল নীলে।

রিজেন্ট স্কোয়ার, ডবলু, সি,
মে-সেপ্টেম্বর—১৯৩৫

—:×:—